লিপ্ত হইলে সে'কি বর্জ্জনীয় হয় ? তাহাকে প্রক্ষালিত করিয়াই লালন করিতে হয়।

আশা মমৈষা স্বয়মেব যৎ ত্বং
পীযূষবর্ষেণ পদে স্থিতং তে।
ভরিষ্যসীদং পরিশুষ্ক-ভাণ্ডং
বিচারপূর্ব্বা ন কৃপাপ্রবৃত্তিঃ ॥ ৬ ॥

আমার আশা এই যে, তুমি নিজ হইতে অমৃতবর্ষণ করিয়া তোমার চরণপ্রান্তে স্থিত এই নিতান্ত শুষ্ক ভাণ্ডটাকে ভরিয়া দিবে। (কেন না) কৃপা ত অগ্রে যোগ্যতার বিচার করিয়া প্রবৃত্ত হয় না।

জ্ঞানগঞ্জ

(৩)

রায় সাহেব শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, কবিরত্ন, এম-এ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীশ্রীবাবা বিশুদ্ধানন্দের গুরুধাম বা তাহার অংশবিশেষ (কেন না জ্ঞানগঞ্জ, মনোহর তীর্থ ইত্যাদি লইয়া একটি ধামই মনে করা সঙ্গত) জ্ঞানগঞ্জের স্থূল পরিচয় যতটুকু জানি এবং তাহারই আলোকে আরও যতটুকু অনুমান করিতে পারি এই প্রবন্ধের পূর্ব্ব দুই খণ্ডে তাহা বলিয়াছি। স্থূলের পশ্চাতে একটা সূক্ষ্ম দশাও যে আছে তাহাতে সন্দেহ নাই; দেশকালে ব্যাপ্ত সকল পদার্থেরই স্থূল সূক্ষ্ম দুই রূপই আছে। কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থানের সূক্ষ্ম পরিচয় শাস্ত্রে পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন সৃষ্টি কর্ত্তার মূল অভিপ্রায়ের বিষয় বিবেচনা করিলে এবং তন্ত্রাদি শাস্ত্রেও ব্রহ্মাণ্ড ও ভাণ্ডের মৌলিক ঐক্য বা সাদৃশ্য সম্বন্ধে যাহা শুনা যায় তাহা হইতে সকল পদার্থেরই এক একটা আধ্যাত্মিক রূপও আছে ইহা মনে করা যায়। স্থূল রূপকে যদি ইংরাজীতে material aspect বলা যায়, তাহা হইলে সূক্ষ্মরূপকে (থিয়োসফির পরিভাষায়) astral এবং আধ্যাত্মিক রূপকে spiritual aspect বলিলে বিভেদ রক্ষিত হয়। কাশী ও কুরুক্ষেত্রের আধ্যাত্মিক পরিচয় সম্বন্ধে আভাসে কিঞ্চিৎ উল্লেখ

এই প্রবন্ধের প্রথম খণ্ডে করিয়াছি। জ্ঞানগঞ্জের আধ্যাত্মিক পরিচয় আমাদের মধ্যে বোধ করি এক শ্রীযুক্ত গোপীনাথই দিতে পারিবেন। অন্ততঃ উহা আমার অধিকারের বাহিরে।

জ্ঞানগঞ্জের সূক্ষ্মরূপ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ জানা গিয়াছে এবং তদনুসারে যতটুকু অনুমানও করা যায় তাহাই এস্থলে নিবেদন করিতে চাই।

শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা ইদানীং স্থূল দেহ মুক্ত কুঞ্জ ঘোষ মহাশয়ের পত্নীবিয়োগের পরে একদা তিনি শ্রীশ্রীবাবাকে প্রশ্ন করেন, তিনি (অর্থাৎ তাঁহার পত্নী) তখন কোথায় কি ভাবে আছেন। তদুত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলেন, "সে এখন তোমাদের মাতার (অর্থাৎ গুরুদেবের পত্নী পরলোকগতা পূজনীয়া কৃষ্ণভামিনী দেবীর) সঙ্গে জ্ঞানগঞ্জে আছে।" ঐরূপে শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজের মাতৃ-বিয়োগের পর বাবা বলিয়াছিলেন তিনিও জ্ঞানগঞ্জে আছেন।

এই যে জ্ঞানগঞ্জ ইহা অবশ্যই রেলপথে জলন্ধর পর্য্যন্ত গিয়া তৎপর গোগা হইয়া হিমালয় অতিক্রমপূর্ব্বক গন্তব্য জ্ঞানগঞ্জ হইতে পারে না। এ জ্ঞানগঞ্জে যাইতে হইলে মৃত্যুর দ্বার দিয়া যাত্রা করিতে হয় এবং বৈতরণী পার হইয়া যাইতে হয়। বৈতরণী বলিতেছি এইজন্য যে, শাস্ত্রমতে উহা নাকি সকলকেই পার হইতে হয়। স্পিরিচুয়ালিষ্ট (আত্মিক গবেষণায় রত ব্যক্তি) গণও পরলোকগত কোনও কোনও আত্মার উক্তির প্রামাণ্য বলিয়া থাকেন। স্থূলদেহ হইতে বাহির হইয়া চলিতে চলিতে আত্মাকে একটা অন্ধতমসাচ্ছন্ন ক্লান্তিকর দেশভাগের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। তাহারা কেহ কেহ উহাকেই বৈতরণী বলিয়াছেন।

আমরা শাস্ত্রের প্রামাণ্যে উহাকে নদীই বলি ; তবে বাবার শিষ্যগণকে বোধ করি উহা গো-লাঙ্গুল ধরিয়া উত্তীর্ণ হইতে হয় না। গুরু-কৃপাই সুগম সেতু গড়িয়া দেয়। প্রসঙ্গক্রমে ইহাও বলা যায় যে, জ্ঞানগঞ্জ যাত্রার দিন ক্ষণও কালের শক্তি বা কোষ্ঠীর গ্রহ-সংস্থান দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় না। শ্রীশ্রীবাবার ইচ্ছাই উহার নিয়ামক। পূর্ব্বোক্ত কুঞ্জদাদার মুখেই শুনিয়াছি তাঁহার কোষ্ঠীতে মাত্র ৪১ বৎসর পরমায়ু নির্দ্দিষ্ট ছিল, গণক উহার অবশ্যম্ভাবিতা সম্বন্ধে এরূপ নিঃসন্দেহ ছিল যে, উহার পরের দশাভেদ আর গণনাই করে নাই। বাবা হইতে দীক্ষালাভের পর কুঞ্জদাদা যথেষ্ট নিষ্ঠা ও উৎসাহ-সহকারে ক্রিয়া করিতে থাকেন। তাঁহার বয়স ৪১ বর্ষের কাছাকাছি পৌঁছিলে একদিন বাবা নিজ হইতেই বলেন, "কুঞ্জ, সেখান (অর্থাৎ জ্ঞানগঞ্জ) হইতে তোমার পরমায়ু আপাততঃ কুড়ি বৎসর বাড়াইয়া দেওয়া হইল।" (বাবা সকল কথাতেই জ্ঞানগঞ্জের ওজর দিতেন, নিজের হাত কিছু আছে তাহা বলিতে চাহিতেন না। আর দেখাও যায় জ্যেঠা গুরুদেব শ্রীশ্রীভৃগুরাম পরমহংস একাধিক পত্রে বাবাকে বলিতেছেন, তুমি তোমার শিষ্যগণ সম্বন্ধে কিছু দেখিবে না, আমিই দেখি।) দেখা গিয়াছে কুঞ্জদাদা যখন দেহ রাখেন তখন তাঁহার বয়স ৬১ বৎসরের কম নিশ্চয়ই ছিল না, অল্প কিছু বেশী হওয়াও সম্ভব। যদি তাহা হইয়া থাকে তবে আয়ুর তদনুরূপ পরিবর্দ্ধন "সেখান হইতেই" করা হইয়াছিল মনে করিতে হইবে। বাবার আরও এক শিষ্যের কথা জানি ভৃগু-কোষ্ঠীতে তাহার বয়স নির্দ্ধারিত ছিল ৬৮ বৎসর। যখন তাহা

উত্তীর্ণ হইল তখন এক অভিজ্ঞ জ্যোতিষী তাহার ঠিকুজী দেখিয়া বলেন, "৬৮ নয়, আপনার পরমায়ুর পরিমাণ ৭২ বৎসর।" বর্ত্তমানে তাহার পরমায়ু ঐ সীমাও লঙ্ঘন করিয়াছে। এখানে কোষ্ঠীর বল ক্ষুণ্ণ এবং কালের শক্তি প্রতিহত। শ্রীশ্রীবাবার শিষ্যদের উপর (সম্ভবতঃ সকল সদ্‌গুরুর শিষ্যদের সম্বন্ধেই এ কথা বলা চলে) যে যমের অধিকার নাই তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। একটি গুরু-ভগিনীর কলেরা রোগে "মৃত্যু" বা তত্তুল্য অবস্থার এবং তাহা হইতে নিষ্কৃতির যে বিবরণ "বিশুদ্ধবাণী" দ্বিতীয় ভাগে প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে জানা যায় এই সকল ব্যাপার সূক্ষ্মলোকেই হইয়া যায়। সূক্ষ্মেই গুরুশক্তি রক্ষা করেন, আবার গুরুর নিজ বিচার মতে সময় হইলে সেই শক্তিই নিয়াও যান।

এ ত গেল অবান্তর কথা। প্রবন্ধের মূল বিষয় সম্পর্কে একটা প্রশ্ন কাহারও কাহারও মনে উঠা সম্ভব। সেটি হইতেছে এইরূপ : শুনা গিয়াছে—শ্রীশ্রীবাবাই বলিয়াছেন—তাঁহার শিষ্যদের পারলৌকিক ব্যবস্থারূপে অমিত ঐশ্বর্য্যশালী জেঠা গুরুদেব শ্রীশ্রীভৃগুরাম পরমহংস একটি ধাম নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন ; মৃত্যুর পর সকলে সেই ধামে যাইবে এবং তথায় অবস্থিতি করিয়া অপূর্ণ কর্ম্ম পূর্ণ করিবে। তাহাদিগকে আর মর্ত্ত্যলোকে ফিরিয়া আসিতে হইবে না। সে ধামের কোনও নাম বাবা প্রকাশ করেন নাই, আমরাও জিজ্ঞাসা করি নাই। অন্যদিকে আবার বলা হইয়াছে কুঞ্জদিদি ও শ্রীযুক্ত গোপীনাথের জননী জ্ঞানগঞ্জে আছেন। এই দুই উক্তি পরস্পর বিরোধী নয়

কি ? তাহা অবশ্য হইতেই পারে না। এ ক্ষেত্রে বুঝিতে হইবে ভার্গবী (অর্থাৎ ভৃগুরাম প্রণীতা) পুরী সূক্ষ্ম জ্ঞানগঞ্জেরই অংশবিশেষ।

পুনরায় প্রশ্ন হইতে পারে—গুরুদেবের শিষ্যগণের মধ্যে কেহ অধিক মাত্রায় কর্ম্মী, কেহ অল্প মাত্রায়ই কর্ম্ম করিয়া থাকেন। সকলের মনও সমান শুদ্ধ নয়, রুচি, আচার-আচরণেও প্রভেদ সুপ্রচুর। সকলেই যদি মৃত্যুর পর একই ধামে স্থান পায়, তাহা হইলে মুড়ি মিছরি যে তুল্য মূল্য হইয়া গেল! ইহার উত্তর বাবার মুখেই পাওয়া গিয়াছে। তিনি এ বিষয়ে জানকী (বন্দ্যো) দাদাকে বলিয়াছিলেন, এই যেমন বায়স্কোপ দেখিতে গিয়া লোকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বসে, সেইরূপ সেখানেও ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে। এই প্রসঙ্গে পুনরায় কুঞ্জদাদার কথা বলিতে হইতেছে। কুঞ্জদাদার তিরোধানের পর শ্রীযুক্ত গোপীনাথ শ্রীশ্রীবাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কুঞ্জদাদার কেমন গতি হইল ?

বাবা। কুঞ্জকে কিছুদিন একটু নিম্নস্তরে থাকিতে হইবে।

গোপীনাথ। কেন ? তিনি ত খুব কর্ম্মী ছিলেন।

বাবা। কুঞ্জর মনে আমার উপর একটা অবিশ্বাস ছিল।

গোপীনাথ। কত দিন নিম্নস্তরে থাকিতে হইবে ?

বাবা। বেশী দিন নয়, ধর এই নয় মাসের মতন।

উক্ত আলাপের কিছুদিন পরে একদিন বাবা নিজ হইতেই গোপীনাথকে বলেন, আজ কুঞ্জ উঠিয়া গেল গো।

এই সূক্ষ্ম জ্ঞানগঞ্জের মধ্যে জ্ঞানের রাজ্য, গুরুর রাজ্য ইত্যাদি রূপ বিভাগের কথা একজনের মুখে শুনিয়াছি। তাহা ঠিক

আপ্ত বাক্যরূপে গ্রহণ করা যায় না বলিয়া সে বিষয়ে কিছু বলিব না।

ভার্গবীপুরী ভোগধাম নয়। স্বর্গাদি লোক ভোগধাম। ইহলোকে যে সকল পুণ্যকর্ম্ম করা হয় তাহাদের সুফল স্বরূপ নানা সুখ সেখানে ভোগ্য হয়। পার্থিব সুখ হইতে স্বর্গীয় সুখের বিশেষত্ব এই যে উহা দুঃখ-মিশ্রিত নয়, ভোগের অন্তে অবসাদ আনয়ন করে না; অভিলাষের উদয় মাত্রই তৎতৎ সুখের সকল উপকরণ আপনা হইতেই উপস্থিত হয়। কিন্তু যে যে পুণ্যের ফলে ঐরূপ অলৌকিক-সুখ লভ্য হয়, ভোগ দ্বারা সে সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়া পুনরায় এই দুঃখবহুল ভূতলে জন্মগ্রহণ করিতে হয়—"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।" সূক্ষ্ম জ্ঞানগঞ্জ বা ভার্গবীপুরী হইতে সেরূপ চ্যুতির কোনও সম্ভাবনা নাই। সেইজন্য স্বর্গ লাভ অপেক্ষা জ্ঞানগঞ্জ গমনের অধিকার লাভ শ্লাঘ্যতর। শ্রীশ্রীবাবা হইতে তাঁহার মহীয়সী কৃপার চিহ্ন মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া আমরা সকলেই অযাচিত সেই অধিকার লাভ করিয়াছি। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, ভার্গবীপুরী হইতেছে কর্ম্মধাম। মঙ্গলময় শ্রীগুরু এখানে আমাদিগকে মন্ত্র দান করিয়া তাহার সিদ্ধির জন্য উপযুক্ত ক্রিয়াযোগ দিয়াছেন। তদনুসারে সাধন করিলে উচ্চতম গতি অর্থাৎ নিঃশ্রেয়স অনিবার্য্য। কিন্তু আমাদের অনেকেরই এমনই দুর্ভাগ্য যে, আমরা উপযুক্তরূপে মন্ত্র সাধন করিতে পারিতেছি না। কর্ম্ম করিবার জন্য কাহারও কাহারও আয়ুও শ্রীগুরু বাড়াইয়া দিয়াছেন ও দিতেছেন, সে অনুগ্রহের মর্য্যাদাও সম্যক্ রক্ষিত

হয় নাই বা হইতেছে না। সেইজন্য শ্রীগুরুই তাঁহার নিজের বিচার মতে শিষ্য-শিষ্যাদিগকে উপযুক্ত কালে এখান হইতে লইয়া গিয়া ভার্গবীপুরীর যথাধিকার স্তরে সাংসারিক বাধা বিঘ্ন হইতে নির্মুক্ত ভাবে কর্ম্মে বসাইয়া দিতেছেন এবং দিবেন। ইহাই ঐ পুরী নির্ম্মাণের সার্থকতা। পুনর্জন্ম হইলে আবার কতকগুলি অপকর্ম্ম সঞ্চিত হইত। সে আশঙ্কা যে নাই ইহাই একটা পরম লাভ।

শ্রীযুক্ত গোপীনাথের জননী সুখদা দেবী বাবার মন্ত্র-শিষ্যা ছিলেন না, বাবা হইতে মন্ত্র গ্রহণের আকাঙ্ক্ষাও তাঁহার ছিল না। তাঁহাকে আমি আমার বাল্যাবধি বিশেষ প্রকারেই জানিতাম। তিনি অতি সরল-চিত্তা ও মধুর-স্বভাবা মহিলা ছিলেন; কুলগুরু হইতে তাঁহার দীক্ষা হইয়াছিল। তাঁহার সদ্‌গতি অনিবার্য্য ছিল। অন্য উচ্চ ধামে গেলে, অবশ্যই কালে তাঁহাকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হইত। জ্ঞানগঞ্জে স্থান প্রাপ্ত হওয়ায় সে আশঙ্কা রহিত হইয়াছে। এই শ্লাঘ্যতরা গতি অবশ্যই তাঁহার তনয়ের গুরু-ভাগ্যের ফল বলিতে হইবে। শাস্ত্রে আছে বিধিমত সন্ন্যাস গ্রহণকারীর ঊর্দ্ধতন এবং অধস্তন কয়েক পুরুষ উদ্ধার প্রাপ্ত হন। সদ্‌গুরুর কৃপাও মহাফলা। তাঁহার কৃপাবৃষ্টি ছিটা ফোঁটায় শেষ হয় না; শিষ্যদিগের সহিত রক্তের ও প্রণয়ের বন্ধনে বদ্ধ ব্যক্তিদিগকেও অভিষিক্ত করে। আমরা কি আশা করিতে পারি না যে, আমাদের মধ্যে যাহাদের স্ত্রী বা পুত্রকন্যা বা মাতাপিতার শ্রীশ্রীবাবা হইতে দীক্ষা লাভ ঘটে নাই (শিষ্যাদিগের ক্ষেত্রে অদীক্ষিত স্বামীও এই সঙ্গে বিবেচ্য) তাহাদের তদ্রূপ স্ত্রী পুত্রাদিও বাবারই কৃপায় জ্ঞানগঞ্জে স্থান প্রাপ্ত হইবেন বা ইতিমধ্যেই হইয়াছেন?

শ্রীশ্রীগুরুস্মৃতি

শ্রীগৌরীচরণ রায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(১)

সন ১৩২৬ সালের (খৃঃ ১৯১৯) ১লা বৈশাখ ৺পুরীতে "বিশুদ্ধানন্দ ধাম" নামক আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমানে আশ্রমের দৃশ্য যে আকারে দেখিতে পাওয়া যায় তৎকালে তাহার কিছুই ছিল না। ত্রিতল গৃহটি আশ্রম-প্রতিষ্ঠার কয়েক বৎসর পরে নির্ম্মিত হয়। আর্ম্মষ্ট্রং রোডের দিকে মুখ করিয়া সাহেবী বাংলার কায়দায় একটি একতালা বাড়ী মাত্র ছিল। তাহাতে মাঝে দুইটি বড় ঘর ও তাহার উভয় পার্শ্বে ছোট আকারের বাথ রুম এবং ড্রেস রুম ছিল। বাবা দক্ষিণ দিকের ঘরটি ব্যবহার করিতেন; উত্তর দিকের ঘরটি শিষ্যদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। উত্তর দিকে একটি রান্নাঘর ও তাহার একটু দূরে একজোড়া পায়খানা ব্যতীত আর কোন ঘরই ছিল না।

চারিদিকে কোন প্রকার প্রাচীর ছিল না, সীমানা নির্দ্দেশের জন্য স্থানে স্থানে কাঁটাসীজের বেড়া দেওয়া ছিল। তখন ফল বা ফুলের গাছ কিছুই ছিল না, কেবল বালুকারাশি ধূ ধূ করিত। রৌদ্রের সময় বালুকারাশি এত উত্তপ্ত হইত যে খালি পায়ে ঘরের বাহির হওয়া যাইত না। একটু জোরে হাওয়া বহিলে ঘরের মধ্যে বালি ঢুকিত। এ অবস্থা কিন্তু বেশী দিন থাকে নাই।

সে সময়ে উড়িষ্যায় বাবার কোন শিষ্য ছিল না, কেবল ৺অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী দাদা চাকরী উপলক্ষে (তিনি পুলিশ ইন্সপেক্টর ছিলেন) এখানে বাস করিতেন এবং সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী নামক একজন গুরু-ভ্রাতাও এখানে ছিলেন। তিনি স্বল্প বেতনের কোন সরকারী চাকরী করিতেন। এই দুইজন ব্যতীত অন্য কোন গুরু-ভ্রাতা সেই সময় পুরীতে ছিলেন বলিয়া আমার জ্ঞানা নাই। বাবা এবার পুরীতে কিছু দীর্ঘকাল বাস করায় তাঁহার মহিমার কথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, এবং একে একে উড়িষ্যাবাসী বাঙ্গালী ও উড়িয়া আসিয়া বাবার শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। স্থানীয় গুরু-ভ্রাতাদের পরিশ্রম এবং শিষ্য-মণ্ডলীর সমবেত চেষ্টায় দুই তিন বৎসরের মধ্যে আশ্রমটি ফুলের বাগানে পরিবেষ্টিত হইল এবং ক্রমে ক্রমে আম প্রভৃতি ফলের গাছও রোপিত হইতে লাগিল।

এই বাগান প্রস্তুত করিতে অর্থব্যয় ও পরিশ্রম বড় কম হয় নাই। প্রথমতঃ কাঁটাগাছগুলি তুলিয়া ফেলিয়া ইটের প্রাচীর দিয়া ঘেরা করা হইল। বালির উপর বাগান হয় না, সেই জন্য বহু দূর হইতে গো-গাড়ী করিয়া মাটি আনিয়া বালির উপর বিছাইয়া দেওয়া হইল এবং সার মিশাইয়া উর্ব্বরা করা হইতে লাগিল। দুই দিকের বড় রাস্তা পর্য্যন্ত খোয়া বিছাইয়া রাস্তা প্রস্তুত হইল। বাগানের মাঝে মাঝে অপ্রশস্ত রাস্তা করিয়া তাহার মাঝে কেয়ারী করিয়া গাছ লাগান হইতে লাগিল। দুই জন মালী স্থায়ীভাবে কাজ করিত এবং আবশ্যক মত দুই চারিজন মজুরও লাগান হইত। এইভাবে দুই বৎসরে বাগান প্রস্তুত হইল।

আশ্রম প্রতিষ্ঠার তৃতীয় বৎসরে রথযাত্রার কয়েকদিন পূর্ব্বেই পুরী গিয়াছিলাম। একদিন সকালবেলায় সম্মুখের বারাণ্ডায় অনেক লোক বাবার নিকট বসিয়াছিলেন, আমি একটু দূরে অন্যমনস্কভাবে বসিয়াছিলাম। এমন সময় কে একজন বাবার হাতে একটি ফুল দিয়া বলিলেন—"বাবা, নূতন গাছে একটি কাঞ্চন ফুল ফুটিয়াছে দেখুন।" আমি কাঞ্চন ফুলের নাম শুনিয়া তাড়াতাড়ি বাবার কাছে আসিলাম।

আমার জন্মভূমি হুনীগ্রামে আমাদের চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে একটি অতি প্রাচীন কাঞ্চন ফুলের গাছ ছিল। ফুলগুলি ছিল গাঢ় গোলাপী রঙ্গের; ফুলগুলির একটি মনোহর সুগন্ধ ছিল। এই গন্ধ আমাকে খুব ভাল লাগিত; সেইজন্য আমি খুব ভোরে উঠিয়া সকলের আগে ইহার ফুল পাড়িয়া আনিয়া ঠাকুর পুজার জন্য দিতাম এবং প্রসাদী ফুলগুলি নিজের কাছে রাখিতাম। গাছটি গুঁড়ি পোকায় জর্জ্জরিত করিয়া দিয়াছিল, আমার বার তের বৎসর বয়সের সময় গাছটি ঝড়ে পড়িয়া গিয়াছিল। তদবধি কোন বাগানে বা কোন গ্রামে আর কাঞ্চন ফুল দেখি নাই।

অনেক হাত ফিরিয়া ফুলটি যখন আমার হাতে আসিল তখন আমার আনন্দ অপেক্ষা নিরানন্দই বেশী হইল। ফুলের আকার আমার পূর্ব্বদৃষ্ট ফুলের মত হইলেও রং মিলিল না; এই ফুলটির রং সাদা। সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের কথা এই, ফুলটির কোন গন্ধই নাই। আমি সন্দিগ্ধভাবে বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"বাবা, এটি কি কাঞ্চন ফুল?" বাবা বলিলেন—"হাঁগো, কেন

বল দেখি ?" আমি তখন বাবাকে নুনীগ্রামের সুগন্ধি কাঞ্চন ফুলের কথা বলিলাম। বাবা আমার সমস্ত কথা শুনিয়া আমার হাত হইতে ফুলটি লইয়া স্পর্শ করিলেন মাত্র, "এইবার দেখ দেখি" বলিয়া তৎক্ষণাৎ ফেরত দিলেন। কি আশ্চর্য্য! ফুলটি হাতে লইবা মাত্র আমার পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের সুগন্ধের স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। কাঞ্চন ফুলের অপুর্ব্ব গন্ধে স্থানটি ভরিয়া গেল; আমি কয়েক সেকেণ্ডের জন্য আহ্লাদে আত্মহারা হইয়া গেলাম। আমার দীক্ষার পর হইতে লেন্সের সাহায্যে, হস্তের দ্বারা, এমন কি নখের দ্বারা, ফোকাস করিয়া বাবাকে কত প্রকার গন্ধ আনয়ন করিতে দেখিয়াছি, বাবার শ্রী-অঙ্গ হইতে কত ভিন্ন প্রকার গন্ধ পাইয়াছি; কিন্তু এমন আনন্দ লাভ কখনও করি নাই।

ফুলটি আমার হাত হইতে লইয়া সকলেই দেখিতে লাগিলেন। হাতে-হাতে ঘুরিয়া ফুলটি যে কাহার নিকট রহিয়া গেল, আমি বহু অনুসন্ধানেও তাহা বাহির করিতে পারিলাম না। সেই গাছ হইতে আরও অনেক কাঞ্চন ফুল ফুটিতে লাগিল, কিন্তু সেগুলি গন্ধ হীন। বাবা কেবল সেই ফুলটিতেই গন্ধ আনিয়া দিয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে আমি আবু পাহাড়ে গিয়া ঐরূপ সদ্গন্ধ যুক্ত গাঢ় গোলাপী রঙ্গের অনেকগুলি কাঞ্চন ফুলের গাছ দেখিয়াছিলাম। আমি আমার বাগানেও কাঞ্চন ফুলের গাছ করিয়াছিলাম, তাহার রঙ্গ ও গন্ধ ঠিক হইয়াছিল, কিন্তু দুই বৎসর ফুল হওয়ার পর ফুল ফোটা বন্ধ হইয়া গেল। দশ পনর বৎসরে গাছ খুব বড় হইয়া উঠিল, কিন্তু পোকা লাগিয়া গাছটি মরিয়া গেল।

(২)

১৩২৫ সালে (খৃঃ ১৯১৮) কাশীর পুরাতন আশ্রমে আমার দীক্ষা হয়। মাননীয় ৺হর গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় দাদা মহাশয় (পেন্সন প্রাপ্ত সব জজ) বাবার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন দেখিয়াছি, কিন্তু এবার পুরী গিয়া আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। শুনিলাম কাশীতে গঙ্গাতীরে ভ্রমণ কালে একটা ষাঁড় তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দেয়, তাহাতে তাঁহার চলৎশক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। এরূপ অবস্থায় তাঁহার পক্ষে আশ্রমে থাকা অসম্ভব হওয়ায় তিনি এখন নিজ বাটীতে থাকেন। এক্ষণে ৺দুর্গাকান্ত রায় (পেন্সন-প্রাপ্ত সব জজ) দাদা মহাশয় আশ্রমে থাকিয়া বাবার সেবা ও আশ্রম পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আমি আশ্রমে উপস্থিত থাকিলে আমাকেও তাঁহার কিছু কিছু সাহায্য করিতে হইত।

একদিন চল্লিশ পয়তাল্লিশ জন কুমারী মাতার সেবা* এবং গুরুভ্রাতা ও ভক্তগণ লইয়া প্রায় ষাট জন লোকের খাওয়ার

---

* আশ্রম-প্রতিষ্ঠার পর কুমারী ভোজনের আবশ্যক হইলে বাবার পাণ্ডা চৈতন্য শৃঙ্গারীকে জানান হইত। তিনি আবশ্যক মত কুমারী পাঠাইয়া দিতেন। অল্প দিন মধ্যে কালুরাম নামক একজন সূপকার পাণ্ডা বাবার খুব ভক্ত হইয়া পড়িলেন, বাবাও তাঁহাকে খুব ভালবাসিতেন, ঔষধ প্রস্তুতাদির জন্য কোন জিনিষের প্রয়োজন হইলে তাঁহাকে বরাত করিতেন। ক্রমে কুমারী আনয়নের ভার তাঁহার উপর পড়িল। তিনি আবশ্যক মত পঞ্চাশ জন পর্য্যন্ত কুমারী আনিয়া দিতেন। ইহার মধ্যে অধিকাংশ কুমারী পাণ্ডাদের বাড়ী হইতেই আনীত হইত। এ বিষয়ে অনন্তদাস দাদা প্রভৃতি উড়িষ্যার

আয়োজন হইল। দুর্গাকান্ত দাদা বাজারের সাহায্যের জন্য আমাকে সঙ্গে লইলেন। ফর্দ্দ মত সমস্ত দ্রব্য কিনিয়া কুলীর

ব্রাহ্মণ-শিষ্যগণ আপত্তি উঠাইতে লাগিলেন। তাঁহারা বলেন—"জগন্নাথের পাণ্ডাগণ কেহই ব্রাহ্মণ নহেন। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্যাধগণের গৃহেই প্রথমে 'নীল মাধব' দর্শন করেন। তিনি যখন জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন, সেই সময় জগন্নাথ দেবের নির্দ্দেশ মত ব্যাধগণকেই তাঁহার সেবক নিযুক্ত করেন। বর্ত্তমান পাণ্ডাগণ সকলেই সেই ব্যাধগণের বংশধর। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন সাধারণের মনস্তুষ্টির জন্য তাহাদের গলায় উপবীত পরাইয়া দিয়াছিলেন। উড়িষ্যাবাসী সদ্ব্রাহ্মণগণ জগন্নাথের মন্দিরে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু পাণ্ডাদের বাড়ীতে অন্নগ্রহণ দূরে থাকুক তাঁহাদের স্পৃষ্ট জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন না।" এ কথা কিন্তু সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। অনেকে বলেন,—"কেবল 'দয়িতা' পাণ্ডাগণ উক্ত ব্যাধবংশসম্ভূত, শৃঙ্গারী, পূজারী, সূপকার প্রভৃতি পাণ্ডাগণ সকলেই ব্রাহ্মণ।" এ কথা বিশ্বাস করিবার সন্তোষজনক প্রমাণও আছে। স্নানযাত্রা ও রথযাত্রার সময় দেখিয়াছি যেন দয়িতা পাণ্ডাগণই কর্ত্তা, ইঁহারাই বিগ্রহগুলিকে স্নানমঞ্চে ও রথের উপর আনয়ন করেন, ইঁহারাই রথের উপর নৃত্য করেন। স্নানের পর ইঁহারা দ্বার বন্ধ করিয়া বিগ্রহগুলির অঙ্গরাগ করেন। নব কলেবরের সময় ইঁহারা নূতন বিগ্রহ নির্ম্মাণ করেন, পুরাতন বিগ্রহগুলিকে সমাধিস্থ করেন। তাহার পর দশ রাত্র অশৌচ গ্রহণ করিয়া অশৌচান্ত দিনে মস্তক মুণ্ডন ও ক্ষৌরকর্ম্ম করেন। একাদশাহে শ্রাদ্ধাদির ন্যায় কিছু ক্রিয়া করিয়া ব্রাহ্মণ-ভোজন করান। ইহার অনেক ঘটনা আমি নিজ চক্ষে দেখিয়াছি।

এইরূপ প্রতিবাদ বাবার কাণে পঁহুচিলে তিনি (যে কোন কারণেই হউক) পাণ্ডাদের বাড়ী হইতে কুমারী গ্রহণ করা বন্ধ করিয়া দেন। ইহার পর একবার কুমারী ভোজনের আবশ্যক হইলে বহু চেষ্টা করিয়াও চৌদ্দ পনর জনের বেশী কুমারী পাওয়া যায় নাই।

মাথায় দিয়া মিষ্টান্নের দোকানে গেলাম। কুমারী-ভোজনের রসগোল্লা কেনা হইলে তুর্গাকান্ত দাদা বলিলেন, "আশ্রমে কোন লোক আসিলে বাবা তাঁহাদিগকে জল খাইতে দিবার আদেশ করেন, তজ্জন্যে আরও কিছু মিষ্টি পৃথক্ করিয়া কেনা ভাল।" পৃথক্ করিয়া কেনা হইল বটে, কিন্তু মুটিয়ার অসুবিধার জন্য সেই হাড়িতেই মিষ্টিগুলি রাখা হইল, কথা হইল আশ্রমে গিয়া এগুলি পৃথক করিয়া লওয়া হইবে।

আশ্রমে আসিয়া দেখিলাম, কয়েকজন ভদ্রলোক বাবার নিকট বসিয়া আছেন। কি একট সৎ-প্রসঙ্গ চলিতেছিল, আমি গিয়া বাবার কাছে বসিলাম, তুর্গাকান্ত দাদা জিনিষগুলি গুছাইয়া রাখিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরেই ভদ্রলোকগুলি বাবাকে প্রণাম করিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলেন। বাবা তাঁহার পূর্ব্ব প্রথামত জল খাওয়াইয়া দিতে আদেশ দিলেন। তখনও মিষ্টিগুলি পৃথক্ করিয়া রাখা হয় নাই. সেই হাড়ি হইতেই রসগোল্লা লইয়া তাঁহাদিগকে জল খাওয়ান হইল। ব্যাপারটি সর্ব্বদর্শী বাবার চক্ষু এড়াইল না। লোকগুলি চলিয়া যাওয়ার অল্পক্ষণ পরেই বাবা তুর্গাকান্ত দাদাকে ডাকাইলেন এবং ভদ্রলোকদিগকে কি জল খাওয়ান হইল তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। তুর্গাকান্ত দাদা বলিলেন,—"বাবা, ভদ্রলোকদের জল খাওয়ার জন্য পৃথক্ করিয়া রসগোল্লা কেনা হইয়াছিল।" বাবা বলিলেন, —"কেনা হইয়াছিল বটে, কিন্তু পৃথক্ রাখা হইয়াছিল কি ?" তুর্গাকান্ত দাদা বলিলেন,—না বাবা, পৃথক্ করিয়া রাখার ব্যবস্থা হইয়াছিল, কিন্তু রাখা হয় নাই। আপনার আদেশ পাইয়া ঐ হাড়ি হইতে

তুলিয়া তাহাদিগকে খাইতে দেওয়া হইয়াছিল।” বাবা বলিলেন,—“ওগুলি সব উচ্ছিষ্ট হইয়া গিয়াছে, ওগুলি দিয়া আর কুমারী-ভোজন হইবে না।” দুর্গাকান্ত দাদা, অনেক অনুনয় করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। পরদিন সকালে আবার মিষ্টি আনিয়া কুমারী ভোজন করান হইল। রসগোল্লাগুলি বাবার ভোগেও লাগিল না, সুতরাং শিষ্যদেরও খাওয়া হইল না। শেষে পথের ভিখারী ও কাঙ্গালী ডাকিয়া মিষ্টান্নগুলি বিতরণ করিয়া দেওয়া হইল।

আমাকে এখনও অনেকবার কুমারী-ভোজন ও ঠাকুরদের ভোগের জন্য ফল মিষ্টি প্রভৃতি ক্রয় করিতে হয়। দোকানদারগণ আমাকে খাইয়া পরীক্ষা করিয়া লইতে বলে; কিন্তু খাইবার কথা উঠিলেই আমি যেন শুনিতে পাই, বাবা বলিতেছেন,—সাবধান, খাইলে উচ্ছিষ্ট হইয়া যাইবে, ভোগে লাগিবে না। পরীক্ষা করিয়া না লওয়ার জন্য অনেক সময়ে ঠকিতে হয়, কিন্তু খাইয়া পরীক্ষা করিয়া লইতে পারি না।

(৩)

এই ঘটনার আরও কয়েক বৎসর পরের কথা। তখন পুরীর আশ্রমে তেতালাবাড়ী নির্ম্মিত হইয়া গিয়াছে। নীচের তালায় ও দোতালায় দুইখানি করিয়া ঘর, দক্ষিণ দিকে বারাণ্ডা। ত্রিতলে বাবার জন্য একখানি ঘর, পূজার ঘর ও বাথ-রুম। বাবা উপরের ঘরে থাকেন এবং বিকাল বেলায় শিষ্যগণকে লইয়া দোতালা বারান্দায় বসেন। শিষ্যগণ কেহ দোতালায়, কেহবা নীচের তালায় আসিয়া থাকেন। বাবা তাঁহার নিয়ম মত দু-বেলা পায়ে

হাঁটিয়া কখনও মন্দিরের দিকে, কখনও সমুদ্র-তীরে, বেড়াইতে যান। তাঁহার জন্য নীচের তালার বারাণ্ডায় একটি ইজি-চেয়ার পাতা থাকে। বাবা বেড়াইয়া আসিয়া ইজি-চেয়ারে বসিয়া বিশ্রাম করেন, তাহার পর উপরে উঠিয়া যান। বাহিরের কোন লোক আসিলে ঐখানে বসিয়াই তাঁহাদের সঙ্গে আবশ্যকীয় কথোপকথন করেন।

বাবা একদিন বেড়াইয়া আসিয়া ইজি-চেয়ারে বসিয়া আছেন, আমি নিকটেই দাঁড়াইয়া আছি। এমন সময় একটা মাছি উড়িয়া আসিয়া বাবার বাম বাহুতে বসিল। বাবা সেইদিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"এই বেটা মলো গো।" বাবার কথা শুনিয়া আমি সেই দিকে তাকাইয়া দেখিলাম—মাছিটির পা এবং পালক পুড়িয়া গিয়াছে, ধরটা কাল হইয়া গিয়াছে। পা নাই, তথাপি হাত নড়াইলেও পড়িয়া যাইতেছে না, যেন আটা দিয়া জড়ান আছে। বাবা ডাইন হাত দিয়া মাছিটাকে তুলিয়া লইলেন এবং হাতের তালুর উপর রাখিয়া হাতটি আস্তে আস্তে দোলাইতে লাগিলেন, মাছির ধরটা হাতের তালুর উপর গড়াইতে লাগিল। আমি –'দেখি বাবা' বলিয়া ঐটি লইবার জন্য হাত বাড়াইলাম, বাবা তাড়াতাড়ি মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বলিলেন—'ছুঁইও না।' তাহার পর পূর্ব্বের ন্যায় ঐটিকে হাতের তালুর উপর গড়াইতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে মাছির পা গজাইল এবং সে পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইল। অল্পক্ষণ পরেই দেখি পালকও বাহির হইয়াছে। মাছিটা তাহার পেছনের পা দিয়া কয়েকবার পালকগুলি মুছিয়া লইয়া উড়িয়া গেল।

বাবার শ্রীঅঙ্গ-স্পর্শে অসংখ্য মশা, মাছি, ছারপোকার মরার কথা বহুবার শুনিয়াছি এবং ইন্দুর, চামচিকা স্থষ্টির কথাও শুনিয়াছি, কিন্তু চক্ষে দেখি নাই। মৃত জীবের প্রাণদান দেওয়া কোনদিন শুনিও নাই। তাই একটি মাছির প্রাণদান দিতে দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলাম। বাবাকে শ্রীমুখে বলিতে

বিশেষ দ্রষ্টব্য—বহুদিন পূর্ব্বের ঘটনা, কেবল স্মরণ-শক্তির সাহায্যে লিখিত হইল। যে সকল ঘটনার বিবরণ লিখিলাম তাহা অনেক গুরুভ্রাতা স্ব-চক্ষে দেখিয়াছেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে অনেকে জীবিতও আছেন। তাঁহারা যদি কোন ভুল ভ্রান্তি দেখিতে পান তজ্জন্ত লেখককে ক্ষমা করিবেন। বিশেষ কিছু ত্রুটি বা ওলট-পালট দেখিলে অনুগ্রহপূর্ব্বক পত্রের দ্বারা জানাইবেন। পরের "বিশুদ্ধবাণী"তে তাহা সংশোধন করিয়া প্রকাশ করিব। তজ্জন্ত কেহ লজ্জা বা আলস্য করিবেন না। এমন একদিন আসিতেছে যেদিন বাবার মহৎ জীবনের যোগৈশ্বর্য্য ও লীলার কথা বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়া পৃথিবীময় প্রচারিত হইবে। আমরা তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাদান সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া যাইতেছি। সেগুলি যেন মিথ্যার আবরণে আবৃত না হয়।

আর একটি নিবেদন—বাবার সকল শিষ্য, শিষ্যা ও ভক্তের নিকট বাবা কিছু না কিছু লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। এই সময়ে সেই লীলা-কথাগুলি "বিশুদ্ধবাণী" সম্পাদক মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া জগন্মাঝারে বাবার মহা-মহিমা প্রকাশের সহায়তা করুন। আপনি ভাল লিখিতে পারেন না বলিয়া সঙ্কোচ প্রকাশ করিবেন না। আপনি যেমন করিয়া হোক্ ঘটনাগুলি প্রকাশ করিয়া সম্পাদক মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিলে তিনি শুদ্ধ ভাষায় লিখিয়া তাহা "বিশুদ্ধবাণী"তে প্রকাশ করিবেন। লজ্জা বা সঙ্কীর্ণতার জন্য যেন অমূল্য রত্নরাজি মৃত্তিকা-গর্ভে চির-প্রোথিত না থাকিয়া যায়। "আমার

শুনিয়াছি, "তাঁহারা (গুরুবর্গ) অনুমতি করিলে এইরূপ আর একটা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া দিতে পারি।" সেই সর্ব্বশক্তিমান্ বাবার পক্ষে একটা ক্ষুদ্র মক্ষিকার প্রাণদান দেওয়া অতি নগণ্য ব্যাপার। আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা তাঁহার শক্তির পরিমাণ করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র।

জয় গুরু !

ঘটনাটি অতি ক্ষুদ্র" ভাবিয়া প্রবন্ধ পাঠাইতে বিরত থাকিবেন না। বাবার কথা যত কম হউক না কেন তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। "বুন্দে বুন্দে (ফোঁটা ফোঁটা জলে) তালা ভরে" এবং "কাঠ বেড়ালের সাগর বাঁধার" কথা স্মরণ করিয়া সকলেই সোৎসাহে সৎকার্য্যের সহায়ক হউন।

দেহ ও কর্ম্ম

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট্

তৃতীয় প্রস্তাব

জ্ঞানগঞ্জ রহস্য

(১)

দেহ ও কর্ম্ম সম্বন্ধে পূর্ব্বের দুইটি প্রস্তাবে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। এই সম্বন্ধে আরও বহু কথা আলোচনা করা আবশ্যক। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে জ্ঞানগঞ্জের তত্ত্ব সম্বন্ধে যথাজ্ঞান কিঞ্চিৎ আলোক প্রক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিব। কারণ দেহ ও কর্ম্ম তত্ত্বের সহিত জ্ঞানগঞ্জের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। জ্ঞানগঞ্জের রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে না পারিলে এই বিষয়ের প্রকৃত সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই।

সিদ্ধভূমি অনেক আছে—শাস্ত্র পাঠে তাহাদের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং কোন কোন শক্তিশালী মহাত্মা নিজের জীবনে ঐ সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রত্যক্ষ অনুভবও প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কথিত আছে যে, জ্ঞানগঞ্জ আমাদের এই পরিচিত পৃথিবীর একটি গুপ্ত স্থান বিশেষ—কিন্তু উহা এমন গুপ্ত যে, বিশিষ্ট শক্তির বিকাশ না হইলে এবং ঐ স্থানের অধিষ্ঠাতার অনুজ্ঞা না হইলে এই মর্ত্ত্য জীবের দৃষ্টিগোচর হয় না। সিদ্ধভূমি মাত্রেরই ইহাই বৈশিষ্ট্য। ।সিদ্ধভূমি স্বয়ংপ্রকাশ হইলেও যে সকল জীব ঐ স্থান হইতে কোন প্রকার শক্তির আনুকূল্য প্রাপ্ত না হয় তাহাদের

পক্ষে উহার দুর্ভেদ্য রহস্য ভেদ করা অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিভিন্ন সিদ্ধভূমির স্বরূপ, পরিস্থিতি ও ক্রিয়া বিভিন্ন প্রকার। বিভিন্ন প্রয়োজন সাধনের জন্য বিভিন্ন ভূমি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে সিদ্ধভূমি, দিব্য ভূমি প্রভৃতি অলৌকিক জীব-নিবাস-স্থান সকলকে এক বর্গেরই অন্তর্গত বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইল। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে উহাদের পরস্পর ভেদ ও প্রত্যেকটির নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান আছে। গোলোক ধাম, নিত্য বৃন্দাবন, কৈলাস, নিত্য সাকেত প্রভৃতি স্থানের মহত্ত্ব বিভিন্ন প্রকার। এই জাতীয় বিশিষ্ট স্থান মায়িক জগতে বিভিন্ন স্তরে বহু আছে, মায়ার ঊর্দ্ধেও আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, কেদারেশ্বর, জল্পেশ্বর, মহাকাল এবং শ্রীশৈল—এই সকল ভুবন তেজঃ তত্ত্বে বিদ্যমান আছে। উহারই অংশ অবলম্বন করিয়া যোগিগণ পৃথিবীতে অর্থাৎ ভারতবর্ষে ঐ সকল নাম দিয়া তীর্থ স্থাপন করিয়াছেন। তদ্রূপ অট্টহাস, কনখল, কুরুক্ষেত্র ও গয়া—এইগুলি বায়ু তত্ত্বের ভুবন। অবিমুক্ত, গোকর্ণ, স্থাণু—আকাশ তত্ত্বের ভুবন। এইরূপ সর্ব্বত্রই বুঝিতে হইবে। মলিন মায়ার ঊর্দ্ধে বিশুদ্ধ মায়া-রাজ্যেও অনেক ভুবন আছে, যাহাদের প্রতিরূপক পৃথিবীতে স্থাপিত হইয়াছে। বৌদ্ধ শাস্ত্র অনুসারে অনাস্রব ধাতুতেও বিভিন্ন বুদ্ধ-ক্ষেত্র ও দিব্য ধাম বর্ত্তমান রহিয়াছে। পৃথিবীতে ঊর্দ্ধলোকের প্রায় সমস্ত স্থানই আংশিক ভাবে অবতীর্ণ ও প্রকট রহিয়াছে—এই সকল অংশকে অবলম্বন করিয়া অল্প আয়াসেই মূল স্থানকে প্রকাশ করা যায়। এই জন্য আমাদের এই সুপরিচিত বৃন্দাবন হইতেও নিত্য বৃন্দাবনের সন্ধান

প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং এই জাগতিক দৃষ্টি গোচর কাশী হইতেও সুবর্ণময় শঙ্করের ত্রিশূলে প্রতিষ্ঠিত নিত্য কাশীর দর্শন লাভ করা যায়। সর্ব্বত্রই অচ্ছিন্ন যোগসূত্র রহিয়াছে।

জ্ঞানগঞ্জের আলোচনা কালে স্মরণ রাখা উচিত যে, এই স্থান সাধারণ ভৌগোলিক স্থানের ন্যায় নহে। ইহা যদিও গুপ্ত ভাবে ভূ-পৃষ্ঠে বিদ্যমান আছে তথাপি ইহার প্রকৃত স্বরূপ বহুদূরে। প্রকৃত যোগী ভিন্ন এই স্থানের সন্ধান কেহ পাইতে পারে না, ইহাতে প্রবেশ-লাভ করা ত দূরের কথা। তবে অধিকারিগণের অনুগ্রহ হইলে এই জগতের সাধারণ মানুষও সেখানে যাইতে সমর্থ হয়। ভৌম জ্ঞানগঞ্জ কৈলাসের পরে এবং উর্দ্ধে অবস্থিত। কিন্তু তাহা হইলেও উহা সাধারণ পর্য্যটকের গতিবিধির অতীত। জ্ঞানগঞ্জ, রাজরাজেশ্বরী মঠ, এবং পরম গুরুদেবের শ্রীমন্দির স্তর-বিন্যাসের দৃষ্টিতে বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত। জ্ঞানগঞ্জই সকলের নিম্ন স্তর, রাজরাজেশ্বরী মঠ মধ্য স্তর এবং পরম গুরু মহাতপার স্থান সর্ব্বোচ্চ। এই স্থানটি যোগি-নির্ম্মিত। ইহা সৃষ্টির আদিতে লোকস্রষ্টার সৃষ্টিরূপে প্রকট হয় নাই। ধ্রুব-লোক যেমন সাধক-বিশেষের তপস্যার ফলে কাল-বিশেষে প্রকট হইয়াছে, গোলোক যেমন শ্রীকৃষ্ণের ভূ-পৃষ্ঠে অবতরণের সঙ্গে সংসৃষ্ট উচ্চতম নিত্য ধাম, সুখাবতী যেমন অনাস্রব ধাতুতে অমিতাভ বুদ্ধের বিশুদ্ধ শক্তির প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত, জ্ঞানগঞ্জও তেমনি যোগি-বিশেষের তীব্রতম যোগসাধনার প্রভাবে বিশ্ব-কল্যাণের মহালক্ষ্য পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে। বস্তুতঃ নিত্য হইয়াও উহা নিমিত্ত যোগে প্রকট হইয়াছে।

ব্রাহ্মী সৃষ্টির সহিত উহার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধটি কি তাহার আলোচনাই দেহ ও কর্ম্মের তত্ত্ব-আলোচনা। এইবার সেই কথাই সংক্ষেপে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি।

(২)

কর্ম্মের অসংখ্য প্রকার ভেদ আছে, তাহা এখানে আলোচ্য নহে। আমরা এখানে শুধু সাধক ও যোগীর কর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিব। যাহারা সাধক নয়, যোগীও নয়, তাহাদের কর্ম্মের আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। জন্ম-মৃত্যুর অতীত হওয়া সাধকের একমাত্র লক্ষ্য। প্রাচীন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে শ্রাবকদের যে স্থান আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রে সাধকদিগের স্থানও কতকটা তাহারই অনুরূপ। সাধক জ্ঞান প্রাপ্ত হয় এবং সেই জ্ঞানের অনলে অশুদ্ধ বাসনা দগ্ধ করিয়া মায়িক উৎপত্তির মূল-বীজ দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়। ফলে সে জন্ম-মরণের অতীত কৈবল্য-স্থিতির মতন স্থিতি প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তাহার পতন হয় না ইহা ঠিক, কিন্তু সে আর উর্দ্ধেও উঠিতে পারে না এবং পূর্ণ ভগবত্তার পথে অগ্রসর হইতে পারে না। সাধকের লক্ষ্যও যেমন ক্ষুদ্র, তাহার আধারও তেমনি ক্ষুদ্র। সে গুরুর তীব্র শক্তি ধারণ করিতে পারে না, তাই গুরু তাহাকে তাহার সামর্থ্যের অনুরূপ জ্ঞানই প্রদান করেন।

এই যে জ্ঞান প্রদানের কথা বলা হইল ইহার সহিত কুণ্ডলিনী শক্তির প্রবোধনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। সদ্‌গুরু সাধককে শক্তি-পাত কালে ঠিক সেই পরিমাণ শক্তি সঞ্চার করেন

যাহাতে তাহার কুণ্ডলিনী শক্তি উদ্‌বুদ্ধ হইয়া উর্দ্ধগতি অবলম্বন পূর্ব্বক অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়। যে সকল অশুদ্ধ বাসনা সাধকের অন্তর্নিহিত জ্ঞান-শক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে সেইগুলি গুরু-কৃপাতে কুণ্ডলিনী-জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে দগ্ধ হইয়া যায়। ইহার ফলে সাধকের অন্তরাত্মা শুদ্ধ হইয়া গুরুদত্ত চিন্ময়ী শক্তি-স্বরূপ ইষ্টের আকার ধারণ করে। ইহা ক্রমশঃ ঘটিয়া থাকে। এই জন্য সাধকের দীক্ষার পর তাহার যথাবিধি নিজ কর্ম্ম-প্রভাবে প্রবুদ্ধ কুণ্ডলিনী শক্তি বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমশঃ চৈতন্যরূপে আত্মবিস্তার করে এবং ধীরে ধীরে সমস্ত দেহ ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতিকে চিন্ময়ত্ব দান করে। অশুদ্ধ বাসনা দূর করাই চিৎশক্তির কার্য্য। এই কার্য্য সম্পন্ন হইতে হইতে নিজের সঙ্গে অভিন্নভাবে ইষ্ট-স্বরূপ ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইতে থাকে, কিন্তু উহা সাধকের দর্শনগোচর হয় না। কারণ অশুদ্ধ বাসনার কিঞ্চিৎ অবশেষ বিদ্যমান থাকা পর্য্যন্ত শুদ্ধ বস্তুর সাক্ষাৎকার সম্ভবপর নহে। পক্ষান্তরে ইহাও সত্য যে অশুদ্ধ সত্তা কিঞ্চিৎ পরিমাণে না থাকিলে দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতির আত্মসত্তা রক্ষা করা অসম্ভব। এই শোধন-কার্য্য সম্পূর্ণ হইলে মলিন বাসনা ক্ষীণ হইয়া যায়। পরে উহা একেবারেই থাকে না। তখনই নির্ব্বিকল্প জ্ঞানের উদয় হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দেহপাত হয়। নির্ব্বিকল্প জ্ঞানের উদয় মানে এই যে সাধক তখন বাসনামুক্ত হইয়া নিজকে ইষ্টের সহিত অভিন্নরূপে দর্শন করে। ইহাই এক হিসাবে তাহার ইষ্ট-দর্শন এবং অন্য দিক্‌ দিয়া দেখিলে ইহাই তাহার আত্মদর্শন।

গুরু-কৃপাকে সহায় করিয়া সাধক নিজ শক্তির প্রভাবে

সম্যক্ জ্ঞান লাভ করে এবং সিদ্ধাবস্থায় চিদাকাশে স্থিতি প্রাপ্ত হয়। তখন সে বাসনা-মুক্ত চৈতন্যময় আত্মা মাত্র—তাহাতে কোন শক্তির বিকাশ থাকে না এবং তাহার কোন প্রয়োজনও নাই। কিন্তু যে সাধক এই প্রকার দেহাবস্থায় থাকিতে থাকিতে সাধন-কৰ্ম্ম সম্পূর্ণ করিতে না পারে তাহার পক্ষে এই প্রকার মরণান্তে চিদাকাশে স্থিতি ঘটে না। সেই সাধক অপূর্ণ নিজের কৰ্ম্মকে পূর্ণ করিবার অবসর আর পায় না, কারণ সাধকের তো আসন নাই। বৰ্ত্তমান দেহ ত্যাগের পর আসন-প্রাপ্তির অভাবে সাধক নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। তাহার অগ্রগতি একেবারে রুদ্ধ হয়। এই দেহে থাকিতে থাকিতে যাহার যতটা বিকাশ হইয়াছিল সে সেইখানেই নিশ্চল ভাবে অবস্থিত থাকে। প্রকৃতির স্রোতে তাহাকে অর্থাৎ তাহার তত্ত্বকে চিদাকাশের দিকে টানিয়া লইয়া যায় ইহা সত্য, কিন্তু সাধক নিজে উহা বুঝিতে পারে না।

যোগীর আধ্যাত্মিক গতি ঠিক এই প্রকার নহে। জন্ম-কাল হইতেই যোগীর আধার অধিকতর শুদ্ধ। এইজন্য সদ্গুরু তাহাকে যোগ-দীক্ষা প্রদান করেন। ইহার ফলে সঞ্চারিত শক্তির মাত্রা তীব্র হয় এবং অগ্রগতির পদ্ধতিও ভিন্ন হয়। আধার পরিপক্ক না হইলে তীব্রশক্তি ধারণ করা যায় না এবং তীব্রশক্তির ক্রিয়া ভিন্ন পূর্ণ অদ্বৈত তত্ত্বে প্রতিষ্ঠা লাভও হয় না। যোগীর উপলব্ধ শক্তি শুধু যে পরিমাণে তীব্র তাহা নহে, তাহার প্রকৃতিও ভিন্ন। এই শক্তির প্রভাবে শুধু যে মলিন বাসনাদি-সংস্কার দগ্ধ হয় তাহা নহে, উহা শোধিত হইয়া যোগীর সহায়করূপে

তাহার নিত্য সাথী হয়। সাধকের ক্ষেত্রে ভগবদনুগ্রহে প্রতিকূল শক্তি প্রতিকূল ভাব পরিত্যাগ করিয়া তটস্থ রূপ ধারণ করে, কিন্তু যোগীর ক্ষেত্রে শুধু যে শক্তির প্রতিকূলতা নিবৃত্ত হয় তাহা নহে, উহা অনুকূল শক্তিরূপে পরিণত হয়। এই অনুকূল শক্তি তখন যোগীর আত্মশক্তিরূপে প্রকাশ পায়। সাধক সাধনার পরিসমাপ্তিতে নিরাকার চিৎস্বরূপে স্থিতি লাভ করে, কিন্তু যোগী যোগক্রিয়ার মহিমায় বিশুদ্ধ সাকার রূপে বিরাজ করে। যোগী কখনই নিরাকার অথবা কায়হীন থাকে না। সাধকের কুণ্ডলিনী জাগরণ হইতে যোগীর কুণ্ডলিনী জাগরণও অনেকাংশে পৃথক্। সাধক গুরুদত্ত শক্তি মূলধন রূপে গ্রহণ করিয়া উহাকে নিজ কর্ম্মদ্বারা সংবর্দ্ধিত করে—তাহার ফলে উক্ত শক্তিরূপ চিদগ্নি দ্বারা তাহার মলিন বাসনাদি ক্রমশঃ দগ্ধ হইয়া যায় এবং চরমাবস্থায় বাসনাদির পূর্ণ নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই সাধন-কর্ম্ম পরিসমাপ্ত হয় এবং সাধক ইষ্ট-স্বরূপে নিজকে প্রাপ্ত হয়। ইহাই তাহার সিদ্ধি —ইহা বিদেহ অবস্থা। বাসনা-নিবৃত্তির আনুষঙ্গিক ফল দেহপাত। পক্ষান্তরে যোগীকে কর্ম্মদ্বারা চিৎশক্তি হইতে চিন্ময় আকার গঠন করিতে হয় না। যোগী উচ্চ অধিকার সম্পন্ন বলিয়া দীক্ষাকালেই গুরুদত্ত চিদাকার প্রাপ্ত হয়। যোগীর কর্ত্তব্য চিৎ-শক্তিদ্বারা আকার রচনা নহে, কিন্তু কর্ম্মবলে গুরুদত্ত চিদাকারের সহিত সংঘর্ষ করিয়া মলিন বাসনাকে শোধনপূর্ব্বক উহাকে অনুকূল শক্তিরূপে পরিণত করা। সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন এই চিন্ময় আকারকে যোগী নিজের সহিত অভিন্নরূপে বোধ করে, কিন্তু যোগী ইহাকেও অতিক্রম করিয়া উত্থিত হয়। অর্থাৎ যোগী এই

চিন্ময় আকার প্রাপ্ত হইয়া উদ্‌বৃত্ত রূপে ইহার সাক্ষী ও নিয়ামক হয়। এই আকার বস্তুতঃ মহাশক্তি বিশ্বজননীরই আকারবিশেষ। যোগী নিজ স্বরূপে এই আকার প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ ইহার পূর্ণত্ব সাধনে তৎপর থাকে। এই পূর্ণতার প্রাপ্তিগত মাত্রার উপরেই তাহার বিশ্বকল্যাণ-সাধনের মাত্রা নির্ভর করে।

সাধক সঙ্কুচিত, কিন্তু যোগী উদার। নিজের ব্যক্তিগত দুঃখ-নিবৃত্তিই সাধকের লক্ষ্য, কিন্তু যোগীর লক্ষ্য শুধু নিজের দুঃখ-নিবৃত্তি নহে। কারণ যোগী পরার্থসেবক বলিয়া নিজের দুঃখ-নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে অন্যের দুঃখ নিবৃত্তির উপায়ও অবলম্বন করেন। তাই যোগী ভিন্ন অন্য কেহ যথার্থ গুরু হইতে পারে না।

(৩)

সাধক ও যোগীর স্বরূপ ও ক্রিয়া ভেদ সংক্ষেপে বলা হইল। কিন্তু সকল যোগীই এক প্রকার নহে। যোগীর সামান্য লক্ষণ প্রত্যেক যোগীতেই বিদ্যমান থাকে ইহা সত্য, কিন্তু লক্ষ্যগত তারতম্যও অবশ্যই থাকে। এই দৃষ্টি অনুসারে যোগীকে খণ্ড ও অখণ্ড দুই ভাগে বিভাগ করা যায় এবং খণ্ড যোগীকেও খণ্ড ও মহাখণ্ড এই দুই ভাগে বিভাগ করা চলে। এই বিভাগের ফলে খণ্ড, মহাখণ্ড ও অখণ্ড এই তিন প্রকার যোগীর তত্ত্ব আমাদের আলোচনার বিষয়। খণ্ড যোগী এমন একটি উচ্চ আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া যোগ-মার্গে অগ্রসর হয় যাহা চিদাকাশের ঊর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত। যে চিদাকাশ সাধকের কর্ম্ম-সমাপ্তি-স্থান বলিয়া পরম লক্ষ্য তাহাকে ভেদ করিতে না পারিলে এই যোগীর লক্ষ্য-স্থানে উপনীত হওয়া যায় না। ইহা অতি উচ্চাবস্থা এবং জাগতিক

দৃষ্টি অনুসারে পরমেশ্বরত্ব এই ভূমিতেই প্রতিষ্ঠিত। খণ্ড যোগের লক্ষ্য কর্ম্ম-প্রভাবে এই ভূমি প্রাপ্ত হওয়া। আমরা মহাখণ্ড ও অখণ্ড যোগের কথা পরে আলোচনা করিব। আপাততঃ খণ্ড যোগের রহস্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতেছি।

খণ্ড যোগের লক্ষ্য যে যোগভূমি তাহা যোগ-দীক্ষা প্রাপ্ত না হইলে প্রাপ্ত হইতে পারা যায় না। কারণ দীক্ষার পর কর্ম্মের অভিব্যক্তি আবশ্যক। দীক্ষা দ্বারা ঐ ভূমি প্রাপ্ত হইবার অধিকার-বীজ হৃদয়ে নিহিত হয়, কিন্তু ঐ বীজকে অঙ্কুরিত করিয়া, বৃক্ষ রূপে পরিণত করিয়া, পুষ্প ফল রূপে প্রকাশিত করা যোগ-কর্ম্মের অধীন। যোগী কর্ম্মহীন অথবা কর্ম্মে উদাসীন হইলে গুরু প্রদর্শিত লক্ষ্য প্রাপ্ত হইতে পারে না। দীক্ষা-কালে গুরু কৃপা অথবা অনুগ্রহ-শক্তি সঞ্চার করিয়া থাকেন। ঐ শক্তিকে পূরণ করিতে হয় নিজের পুরুষকার অথবা কর্ম্মের দ্বারা। এই কর্ম্ম কৃপা দ্বারা পরিচালিত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কর্ম্ম কর্ম্মই, কৃপা কৃপাই। কর্ম্মের প্রয়োজন কৃপা দ্বারা সিদ্ধ হয় না। যদি কোন খণ্ড যোগী গুরু অর্থাৎ সদ্গুরু কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইয়া তাঁহার কৃপা-শক্তি প্রাপ্ত হয় অথচ নিজে অনুরূপ কর্ম্ম না করে তাহা হইলে তাহাকে নিতান্তই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। কারণ গুরু যে মহালক্ষ্য তাহার সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছেন তাহাকে আয়ত্ত করিবার পূর্ণ অধিকার গুরু হইতে প্রাপ্ত হইয়াও সে কর্ম্মগত অলসত্ব বশতঃ লক্ষ্য প্রাপ্ত হইতে পারে না। জীবনের কাল পরিমিত। এই পরিমিত সময়ের মধ্যে কর্ম্ম সমাধা করা আবশ্যক। কারণ দেহত্যাগের পর বিদেহ অবস্থায় কর্ম্ম-দেহের সহিত যোগ না

থাকার দরুণ কর্ম্ম করিবার অবসর পাওয়া যাইবে না এবং যোগ-পথের অগ্রগতিও স্তম্ভিত হইয়া পড়িবে। এই রক্ত মাংসের দেহে থাকিতে থাকিতে কর্ম্ম সমাপ্ত হওয়া আবশ্যক। নতুবা লক্ষ্য-প্রাপ্তির আশা এক প্রকার সুদূর-পরাহত। মরদেহে কর্ম্ম করিতে পারিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কর্ম্ম সমাপ্ত হইয়া যায়। কর্ম্ম সমাপ্ত না করিয়া স্রোতে ভাসিয়া লক্ষ্য ভূমিতে যাইয়া পৌঁছিলেও তাহার বিশেষ মূল্য নাই। কারণ তখন কমলের বিন্দুতে স্থান লাভ হয় না, দলে আপন যোগ্যতানুসারে স্থান প্রাপ্তি হয়। কিন্তু সাধারণতঃ দলে বসিবার অধিকার হওয়াও কঠিন। দলের বাহিরে জ্যোতির মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে হয়।

কিন্তু যোগী গুরু শিষ্যকে যোগ-দীক্ষা দিবার পর তাহাকে আশ্রয় স্বরূপ আসন দান করিয়া থাকেন। এই আসন দান একটি রহস্যময় ব্যাপার। আসন দিলেই বুঝিতে হইবে তাহাকে নিরন্তর কর্ম্ম করিবার অবসর দেওয়া হইল। কিন্তু আসন বিস্তার করা হয় ভূমির উপর। তাই গুরুকে আসন দানের সঙ্গে সঙ্গে আসন বিছাইবার জন্য ভূমিও দান করিতে হয়। কিন্তু এই ভূমি কোথায়? যোগী শিষ্য যখন আসন প্রাপ্ত হইয়াছে তখন বুঝিতে হইবে যে দেহত্যাগের পরেও তাহার আত্মিক সত্তা নিরালম্ব অবস্থায় উড্ডীন ভাবে বিদ্যমান থাকিবে না। উহা ভূমিতে বসিবার অবসর প্রাপ্ত হইবে। এই ভূমিতে নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট হইয়া তাহাকে কর্ম্ম করিতে হইবে। এই কর্ম্ম অতি দীর্ঘকাল-সাধ্য, কারণ ইহা মর-দেহের কর্ম্ম নহে। কিন্তু মরদেহ না হইলেও ইহাও কর্ম্ম-দেহ যদিও এই কর্ম্ম-দেহে ক্ষিপ্রবেগে কর্ম্ম

সিদ্ধ হয় না। যোগী শিষ্য মৃত্যুর পর অবশিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদন করিবার জন্য যে বিশুদ্ধ ব্যাপক ভূ-খণ্ড প্রাপ্ত হয় তাহাকে গুরুধাম বলা হইয়া থাকে। ঐ স্থানে প্রতি যোগী আপনাপন আসনে আসীন হইয়া কর্ম্মে নিরত রহিয়াছে। সুদীর্ঘ কালে ঐ কর্ম্মের প্রভাবে যোগীর যোগ-চক্ষু উন্মীলিত হয়। বস্তুতঃ তখনই যোগীর প্রকৃত যোগ-পথ খুলিয়া যায়। ঐ পথে চলিবার সময় গুরুধামের কায়াও আর থাকে না। তখন দৃষ্টিময় দিব্য স্বরূপে মধ্য রেখা অবলম্বনপূর্ব্বক ক্রমশঃ চলিতে চলিতে চিদাকাশ ভেদ করিয়া লক্ষ্যস্থানে উপনীত হয়। লক্ষ্যস্থান বলিতে এখানে কমলের কোন না কোন একটি দল বুঝিতে হইবে—কর্ণিকা নহে। কমলের কর্ণিকাতে যাইবার অধিকার একমাত্র তাহারই আছে যে নরদেহে থাকিয়া সমস্ত কর্ম্ম সমাপ্ত করিতে সমর্থ হয়। সর্ব্বত্রই নরদেহের কর্ম্মের পূর্ণ প্রভাব না থাকিলে কমলের কর্ণিকাতে বসিবার যোগ্যতা লাভ হয় না। কর্ণিকাতে বসা মানেই অঙ্গিরূপে বা অঙ্গরূপে চক্রের অধিষ্ঠাতা হওয়া অর্থাৎ সমগ্র রাজ্যের অধিকারী হওয়া কিম্বা রাজার ন্যায় সিংহাসনে উপবেশন করা। দলে বসা মানে সাধারণ প্রজার ন্যায় বিন্দুর অধীনতা স্বীকার পূর্ব্বক প্রজা-রূপে নিজের স্থান প্রাপ্ত হওয়া। উভয়ে অনেক পার্থক্য আছে।

সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, প্রকৃত যোগ-দীক্ষা প্রাপ্ত হইলে মৃত্যুর পরে গুরুস্থানে গতি হয় এবং সেখানে পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট নিজ-স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়। সিদ্ধভূমি অধিকাংশ স্থলে এই গুরুস্থানের অন্তর্গত। অবশ্য ইহার বাহিরেও যে সিদ্ধভূমি না আছে তাহা নহে। গুরুধাম হইতে যে গতি লাভ হয়,

যাহা খণ্ড যোগীকে লক্ষ্য পর্য্যন্ত সঞ্চালন করিয়া লইয়া যায়, তাহাতে দেহভেদ সিদ্ধ হয় না এবং প্রকৃত মধ্য রেখাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কথাটি অত্যন্ত দুরূহ, কিন্তু বুঝিতে না পারিলে বক্তব্যের অভিপ্রায় পরিস্ফুট হইবে না। স্বয়ং বিশ্ব জননী কোন না কোন রূপ ধরিয়া উন্মীলিত-যোগ-চক্ষু যোগীর নিকট আত্ম-প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ সাধক ত প্রাপ্ত হয়ই না, খণ্ড যোগীও প্রাপ্ত হইতে পারে না। খণ্ড যোগী আভাস মাত্র লাভ করে। তবে এই আভাসেরও তারতম্য আছে। যোগ-চক্ষু উন্মীলনের পরেই বিশ্ব-জননীর যে রূপ ও রাজ্য প্রকাশিত হয় তাহা সর্ব্ব নিম্নস্তরের। ঐ রাজ্যে সাধকও আসিতে পারে এবং আসিয়াও থাকে, কিন্তু সে মায়ের স্বরূপ-দর্শন পায় না। দুর্ব্বল খণ্ড যোগী স্বরূপ-দর্শন পায় বটে, কিন্তু সেইখানেই বিশ্রাম লাভ করে। তাহার অগ্রগতি সেইখানেই রুদ্ধ হইয়া যায়। তাহার পরে যে রাজ্যটি আছে সেটিও বিশ্ব-জননীরই রাজ্য। সেখানেও কমলের দলে বিশ্ব-জননীরই আসন, কিন্তু ঐটি মধ্যম খণ্ড যোগীর আদর্শ। তিনি উহার দর্শন পান এবং ঐখানেই থাকিয়া যান। সাধকের উহাই চরম লক্ষ্য, কিন্তু সাধকের স্থিতি এবং যোগীর স্থিতি একই স্থানে বিভিন্ন হইয়া থাকে। খণ্ড যোগীর মধ্যে যিনি উত্তম তাঁহার আদর্শ চিদাকাশের উর্দ্ধে, যাহার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। মর-দেহে কর্ম্মের সমাপ্তি না হইলে কেন্দ্রে যাইয়া মাতৃ-অঙ্কে উপবেশন করা যায় না।

বিশ্ব-জননীর এই যে তিনটি রূপের কথা বলিলাম এই তিনটিই তাঁহার স্বরূপের ছায়া, অনুছায়া এবং প্রতিচ্ছায়া,—কোনটিই

প্রকৃত স্বরূপ নহে। কিন্তু যে খণ্ড যোগী অথচ পূর্ণ কর্ম্মী সে ছায়াটি প্রাপ্ত হয়, অবশ্য মরদেহে কর্ম্ম সমাপ্ত হইলে। কারণ রক্তহীন দেহে কর্ম্মের সেই পরিমাণ সংবেগ উৎপন্ন হয় না যাহাতে মধ্য বিন্দুতে প্রবিষ্ট হওয়া সম্ভবপর হয়। যোগীর এই যোগভূমিতে ঐশ্বর্য্য অতুলনীয় ভাবেই প্রকাশিত হয়, কিন্তু মহাজ্ঞান আসে না। কারণ খণ্ডযোগের চরম উৎকর্ষের অবস্থাতেও মহাজ্ঞান উদিত হয় না।

মহাজ্ঞান সেই রাস্তায় প্রকাশিত হয় যাহা নিজ কায়া ভেদ করার পর উন্মুক্ত শুদ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করে। এই পথের যাত্রী অত্যন্ত দুর্ল‍ভ, কারণ যে সকল যাত্রী খণ্ডযোগের পথে চলে তাহারা ঠিক ঠিক এই পথ চেনে না এবং এই পথের সন্ধান না পাওয়া পর্য্যন্ত বিশ্বজননীর স্বরূপ দর্শনের আশা অলীক কল্পনামাত্র। প্রত্যেক পথেই আদি বিন্দু হইতে অন্তিম বিন্দুটি দৃষ্টিতে ভাসিয়া উঠে! খণ্ড-যোগীর দৃষ্টির সম্মুখে অন্তিম বিন্দুরূপে চিদাকাশের উর্দ্ধস্থ মহাভূমি লক্ষিত হয়, তাহার পরে অথবা বাহিরে আর যে কিছু আছে বা থাকিতে পারে তাহা ধারণাতে আসে না। কিন্তু মহাখণ্ড-যোগীর দৃষ্টিতে যে পথটি ভাসে তাহা পূর্ব্বোক্ত পথ হইতে ভিন্ন। কারণ এই পথের অন্তিম কোটিতে বিশ্ব-জননীর প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এই দৃশ্য খণ্ড যোগীর পরম আদর্শেরও উর্দ্ধস্থিত, ও তাহার দৃষ্টির অগম্য। তাহার লক্ষ্য বিশ্ব-জননীর স্বরূপ হইলেও বস্তুতঃ উহা এই মহাস্বরূপেরই প্রথম ছায়া মাত্র। ইহার যেটি ছায়া বা অনুছায়া তাহাই সাধকের সিদ্ধ অবস্থার লক্ষ্য। দ্বিতীয় ছায়ার যেটি প্রতিচ্ছায়া

সেইটি নিম্নস্তরের খণ্ডযোগীর লক্ষ্য। তাহা হইতে যে রশ্মি নির্গত হইয়াছে তাহাই অখণ্ডভাবে প্রসারিত হইয়া সমগ্র সাধক-কুলের ধ্যেয়রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে।

অধ্যাত্ম মার্গে কৃপা ও কর্ম্মের পরস্পর সম্বন্ধ বিশেষরূপে অনুধাবনের যোগ্য। সাধকের জীবনে কৃপার স্থান প্রধান এবং কর্ম্মের স্থান গৌণ। বস্তুতঃ সাধকের প্রকৃত কর্ম্ম এক প্রকার নাই বলিলেও চলে। যাহা কর্ম্মরূপে প্রতীত হয় তাহা কর্ম্মের আভাসমাত্র। পক্ষান্তরে যোগীর যোগ-পথে কর্ম্মই প্রধান—অবশ্য কৃপা সর্ব্বত্রই আছে, কিন্তু কৃপা অপেক্ষা কর্ম্মেরই মহিমা অধিক। ইহার মধ্যেও খণ্ড ও মহাখণ্ডযোগে কর্ম্মের প্রাধান্য ও উৎকর্ষ থাকিলেও আপেক্ষিক দৃষ্টিতে কৃপাই প্রধান। কিন্তু অখণ্ডযোগে কৃপা গৌণ, এমনকি স্থূলতঃ লুপ্তপ্রায়, কিন্তু কর্ম্মই আপন প্রাধান্য লইয়া খণ্ড কৃপাকে অভিভূত রাখিয়া আত্মপ্রকাশ করে। কর্ম্ম এই ভাবে স্ব-প্রতিষ্ঠিত হইলে পূর্ণ পুরুষকার প্রকটিত হয় এবং মহাকৃপা আত্মপ্রকাশ করে। মহাকৃপা ও পরম পুরুষকার অভিন্ন রূপে একই ক্ষণে ফুটিয়া উঠে।

খণ্ড যোগী যেমন দীক্ষা-কালে আসন প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ মহাখণ্ড যোগীও আসন প্রাপ্ত হয়। তবে ইহা উচ্চতর আসন। খণ্ড যোগী স্ব-কর্ম্ম অসমাপ্ত রাখিয়া দেহত্যাগ করিলে দেহান্তে একটি ভুবন প্রাপ্ত হয় যেখানে স্থিত হইয়া নিজ নিজ আসনে কর্ম্ম করিবার অধিকার জন্মে এবং কর্ম্ম-সমাপ্তির পর নেত্র উন্মীলিত হইলে দিব্য দৃষ্টি উন্মীলিত হইয়া যায় ও উহাকে অবলম্বন করিয়া চিদাকাশের ঊর্দ্ধস্থ ভূমি পর্য্যন্ত অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হয়।

মহাখণ্ড যোগী উচ্চতর লোক হইতে সমাগত। তিনি ঊর্দ্ধতর ভূমির সন্ধান পান এবং তাহার অনুসরণ করিয়া চলিতে চলিতে যথাসময়ে উক্ত ভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। খণ্ড যোগীর লক্ষ্য হইতে মহাখণ্ড যোগীর লক্ষ্য বিশাল। খণ্ড যোগীর চরম লক্ষ্যের পর হইতে মহাখণ্ড যোগীর চরম লক্ষ্য পর্য্যন্ত যে মার্গ দৃষ্ট হয় তাহা এক প্রকার অভিনব আবিষ্কার। আপাতদৃষ্টিতে ইহাকে বিশ্বের কেন্দ্র বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। অখণ্ড যোগে এই বিশ্বের সহিত বিশ্বাতীত মহাসত্তার যোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সে প্রসঙ্গ এই স্থানে উত্থাপিত করা সঙ্গত নহে।

মহাখণ্ড যোগ-দীক্ষার পর পরম প্রকৃতির স্নেহময় উৎসঙ্গে উপবেশন করিবার অধিকার জন্মে। অবশ্য ইহা কর্ম্ম-সাপেক্ষ, কিন্তু যে যোগী নরদেহে কর্ম্ম সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে দেহ ত্যাগ করে সে খণ্ড যোগীর ন্যায় এমন একটি আসন প্রাপ্ত হয় যাহাকে আশ্রয় করিয়া সে প্রকৃতির ঊর্দ্ধদেশে একটি সিদ্ধ স্থান লাভ করে, যেখানে নিজ আসন বিছাইয়া অবশিষ্ট কর্ম্ম পূর্ণ করিতে সমর্থ হয়। এই সিদ্ধ স্থানটি তিব্বতীয় গুপ্ত যোগিগণের পরিভাষাতে 'জ্ঞানগঞ্জ' নামে প্রসিদ্ধ। এই জ্ঞানগঞ্জ সিদ্ধ ভূমি এবং পূর্ব্ব-বর্ণিত গুরুধামও সিদ্ধ ভূমি, কিন্তু উভয়ে ভেদ আছে। গুরুধামে অপূর্ণ খণ্ড যোগী কর্ম্ম পূর্ণ করিবার জন্য স্থান প্রাপ্ত হয়—এই স্থানই তাহার গুরুদত্ত আসন। তদ্রূপ জ্ঞানগঞ্জে অপূর্ণ মহাখণ্ড যোগী আরব্ধ কর্ম্ম পূর্ণ করিবার জন্য স্থান প্রাপ্ত হয়—ইহাই তাহার আসন-প্রাপ্তি। বস্তুতঃ দীক্ষাকালেই এই আসন অথবা

উপবেশন-স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়; যদিও ইহা দীক্ষাকালে দীক্ষার্থী অথবা দীক্ষিতের নেত্রগোচর হয় না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যোগীর সাধন-জীবনে কর্ম্মই প্রধান, সুতরাং এই জীবনে গুরু হইতে যে কৃপা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা সম্যক্ প্রকারে শোধ করিয়া ফেলিতে হয়। কৃপায় নিজ শক্তির বিকাশ স্থগিত থাকে, অথচ সাধনের প্রাথমিক অবস্থায় কৃপা ব্যতীত এক পদও অগ্রসর হওয়ার উপায় নাই। এই জন্য যোগীর পক্ষে নিয়ম এই যে গুরু হইতে কৃপা গ্রহণ করিয়া পরে উহা স্ব-কর্ম্ম দ্বারা গুরুকে শোধ করিতে হয়। গুরুদত্ত কৃপা ঋণ রূপে গ্রহণ করিয়া নিজের অর্জ্জিত কর্ম্ম দ্বারা উহাকে মিটাইয়া ফেলিতে হয়। তখন ভবিষ্যৎ কর্ম্মের পথ সুপ্রশস্ত হয়, তাহার পূর্ব্বে নহে। গুরুর প্রধান কাজ শিষ্যকে কালের রাজ্য হইতে উদ্ধার করা। সাধন-মার্গে ইহা সম্পন্ন হয়, যোগ-মার্গেও হয়। কিন্তু সাধন-মার্গে শুধু কালের উত্তাল তরঙ্গ হইতে শিষ্যকে উদ্ধার করিয়াই গুরুর করুণা নিবৃত্ত হয়, তাহাকে কালাতীত কোন উচ্চ-পদে অভিষিক্ত করিতে পারে না। যোগ-পথে কর্ম্মের প্রাধান্য থাকে বলিয়া কালাতীত রাজ্যে যোগী বিশিষ্ট অধিকার-সম্পন্ন স্থান প্রাপ্ত হয়। খণ্ড-যোগীর অধিকার হইতে মহাখণ্ড-যোগীর অধিকার শ্রেষ্ঠ, এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকার অখণ্ড-যোগীর—যাহা এখনও জগতে প্রকাশিত হয় নাই। অখণ্ড-যোগীর মহান্ অধিকারই সমগ্র বিশ্বকে সর্ব্বপ্রকার অভাব হইতে মুক্ত করিয়া পূর্ণ আনন্দ ও ঐশ্বর্য্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ।

সাধকের কর্ম্মের সমাপ্তি আছে, কিন্তু যোগীর কর্ম্মের সমাপ্তি

নাই। যোগী পূর্ণত্ব লাভ করিয়াও ক্রিয়াহীন হইয়া বসিয়া থাকে না। তাহার স্বভাবসিদ্ধ কর্ম্ম চিরদিনই চলিতে থাকে এবং ইহা নিবৃত্ত কখনও হয় না এবং হইতেও পারে না। তাই পূর্ণতা লাভের পরেও পূর্ণকে পূর্ণতর, পূর্ণতম প্রভৃতি ক্রমে অনন্ত অবস্থার ভিতর দিয়া উৎকর্ষণ করা, ইহাই যোগীর কর্ম্মের স্বাভাবিক পরিণতি। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার বিশ্ব-সমস্যা (The Riddle of the World) নামক গ্রন্থে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন যে, আপাতদৃষ্টিতে অজ্ঞান সম্যক্ প্রকারে নিরত না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্মের ধারা অথবা ক্রমবিকাশ অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ভগবৎ-স্বরূপে প্রবিষ্ট হইয়াও অনন্ত অগ্রগতির সম্ভাবনা রহিয়াছে। তাঁহার এই বাক্য অত্যন্ত সত্য। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সত্য যে এই অনন্ত অগ্রগতি অখণ্ড স্থিতির মধ্যেই ঘটিয়া থাকে। স্থিতি লাভ না করিলে অনন্ত কর্ম্মের কোন অর্থই হয় না,—তখন স্থিতিই হয় কর্ম্মের লক্ষ্য। কিন্তু স্থিতির পরেও যদি কর্ম্ম রাখিতে পারা যায় তবে উহাই হয় দিব্য কর্ম্ম, যাহার অন্ত কখনই হইতে পারে না।

জ্ঞানগঞ্জের যোগ-দৃষ্টি অনুসারে তিনটি যোগ-ক্ষেত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথম ক্ষেত্রটিতে মহাভাব পর্য্যন্ত লক্ষ্য রূপে পাওয়া যায়। এই ক্ষেত্রের ভূমিটি হয় গুরুধাম। খণ্ড যোগী কর্ম্ম পূর্ণ করিতে পারিলে এই লক্ষ্য প্রাপ্ত হয়, পূর্ণ না করিতে পারিলে যে অবস্থায় স্থূল দেহের ত্যাগ হয় সেই অবস্থায় অনুরূপ স্থিতি প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। স্থূল দেহ ত্যাগের পর ক্ষিপ্রগতিতে কর্ম্ম চলে না, মন্দ মন্দ ভাবে চলে। দ্বিতীয় যোগ-ক্ষেত্রটি

পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যাপক, ইহার লক্ষ্য স্থান মহাভাবের অতীত, এমন কি সূর্য্য-মণ্ডলেরও উর্দ্ধস্থ। ইহা পরমা প্রকৃতির স্বরূপ-প্রকাশ। ইহার ভূমিটিই জ্ঞানগঞ্জ। মহাখণ্ড-যোগ-ক্রিয়ার অবসানে এই লক্ষ্য খুলিয়া যায়। পূর্ব্বের ন্যায় এই স্থলেও স্থূল দেহে কৰ্ম্ম সমাপ্ত করিতে পারিলে লক্ষ্যের সন্নিহিত হওয়া সহজ সাধ্য, কিন্তু কৰ্ম্ম অসম্পূর্ণ রাখিয়া দেহ ত্যাগ করিলে জ্ঞানগঞ্জ হইতে কৰ্ম্মের গতি চলিতে থাকে। পূর্ব্বের ন্যায় এই গতিও অপেক্ষাকৃত মন্দ, স্থূল দেহের কর্ম্মের ন্যায় ক্ষিপ্র নহে।

তৃতীয় যোগ-ক্ষেত্রটি এখনও অঙ্কনের মধ্যেই পরিসমাপ্ত রহিয়াছে। ইহার ভূমি ও লক্ষ্য বিশ্ব-গুরু। কালরাজ্য বাহিরে নাই বলিয়া তখন ভূমি ও লক্ষ্যপ্রাপ্তিতে কালের কোন ব্যবধান নাই। ইহার ক্ষেত্র অখণ্ড বিশ্ব। এই স্থলেও স্থূল দেহে কর্ম্মের পূর্ণতা ব্যতীত ভূমিও লক্ষ্যপ্রাপ্তি অসম্ভব।

তিনটি ক্ষেত্রই কর্ম্মস্থান। প্রথমটির পরিধি অতি বিশাল। কালের রাজ্য এই পরিধির বাহিরে অবস্থিত। দ্বিতীয়টির পরিধি প্রথমটি অপেক্ষাও অনেক অধিক বিশাল, ইহার ফলে কালের রাজ্য অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। তৃতীয়টির পরিধি সমগ্র বিশ্ব বা সৃষ্ট জগৎ। এই স্থলে কালের রাজ্য শূন্য রূপে পরিণত হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে তিনটি যোগ-ক্ষেত্রে কর্ম্মের তীব্রতা ক্রমশঃই অধিক। সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিতে না পারিলে তৃতীয় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও প্রতীত হইবে যে গুরুর করুণা-শক্তির মাত্রা প্রথম ক্ষেত্র হইতে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রবল এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্র হইতে

তৃতীয় ক্ষেত্রে আরও অধিক প্রবল। বস্তুতঃ ইহারই নামান্তর মহা-করুণা। শুধু তাহাই নহে, কৃপার ক্ষেত্রও ক্রমশঃ অধিক প্রসারিত হইতে হইতে তৃতীয় ভূমিতে বিশ্ব-ব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে।

(৪)

কৃপা ও কর্ম্ম উভয়ই মূলতঃ একই শক্তি। একই অখণ্ড সত্তা অবিভক্ত থাকিয়াও নিজকে লীলাচ্ছলে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া থাকে। এই ভাবে একদিকে অণু এবং অপর দিকে মহান্, একদিকে বৃহৎ এবং অপর দিকে ক্ষুদ্র, এই প্রকার দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবের উদয় হইয়া থাকে। অণুকে মহানের নিকট যাইতে হইলে কর্ম্ম অবলম্বন করিতে হয়। অণুতে যে শক্তি নিহিত রহিয়াছে তাহাই কর্ম রূপে অভিব্যক্ত হইয়া অণুর অগ্রগতির সহায়তা করে। কিন্তু শুধু কর্ম্মশক্তির দ্বারা অণুর পক্ষে মহান্‌কে প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর নহে। মহানের কৃপা-শক্তিও অণুর সহকারী হওয়া আবশ্যক। অতএব মহানের কৃপা-সহকৃত অণুর কর্ম্মশক্তি একটি প্রধান উপায়। এই প্রকার কৃপা-শক্তির প্রাধান্য স্থলেও বুঝিতে হইবে। মহানের কৃপা উদ্রিক্ত হইলেই যে অণু মহান্‌কে প্রাপ্ত হইবে অথবা মহান্ অণুকে প্রাপ্ত হইবে তাহা বলা যায় না। কৃপার সহকারিরূপে অণুর কর্ম্মশক্তি অভিব্যক্ত ও প্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক। এই প্রকার উভয় শক্তির পরস্পর সংমিশ্রণে অণু ও মহানের যোগ সিদ্ধ হয়। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে কর্ম্ম-সাপেক্ষ কৃপা ও কৃপা-সাপেক্ষ কর্ম্ম উভয়ই আবশ্যক। অণুর প্রকৃতি ভেদে সাপেক্ষতার তারতম্য ঘটিয়া থাকে। মনে রাখিতে হইবে নিরপেক্ষ শক্তির ক্রিয়াও

ক্ষেত্রবিশেষে সম্ভবপর। ঐস্থলে উহা পূর্ণ শক্তিরই দ্যোতক, কারণ অপূর্ণ শক্তি নিরপেক্ষ হইতে পারে না। এই পূর্ণ শক্তি যদি কৃপা রূপে প্রকট হয় তাহা হইলে ঐ কৃপা ধারণের উপযোগী অণুনিষ্ঠ কর্ম্ম শক্তিও উহা হইতেই প্রকট হইবে। পক্ষান্তরে এই পূর্ণ শক্তি যদি অণুর কর্ম্ম-শক্তিরূপে প্রকট হয় তাহা হইলে ঐ কর্ম্ম-শক্তির সহকারিস্বরূপ কৃপা-শক্তিকে উহা স্বয়ংই মহাকৃপা-রূপে অভিব্যক্ত করিয়া তুলে। ফলে স্বরূপে অবস্থান ও আত্মৈশ্বর্য্যের বিকাশ যথাবৎ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু ইহার মধ্যে একটি গভীর সমস্যা বিচারণীয় রহিয়াছে। কৃপার প্রাধান্যে মিলন ও অদ্বৈত স্থিতি ঐশ্বরিক শক্তিকে আশ্রয় করিয়া হইয়া থাকে অর্থাৎ যেমন যেমন ঐশ্বরিক কৃপা বর্দ্ধিত হয় তেমনি তেমনি আত্মা কর্ম্মানুরূপ উর্দ্ধগতি লাভ করে ও গতির অবসানে পরমাত্ম-স্বরূপে একত্ব লাভ করে। যদি কর্ম্মের প্রাধান্য স্বীকৃত হয় তাহা হইলে ঐ কর্ম্মের প্রভাবে অনুরূপ অনুগ্রহ শক্তির বিকাশে ঈশ্বর-সত্তা ক্রমশঃ সন্নিহিত হইতে থাকে এবং অন্তিম অবস্থায় ঈশ্বরভূত যোগীর স্বরূপে আত্মসমর্পণ করেন। এই দুইটিই অদ্বৈত স্থিতি। কিন্তু উভয়ে পার্থক্য আছে। প্রথম অবস্থায় আমি তুমি রূপে পরিণত হইয়া অদ্বৈত ভাব গ্রহণ করে। তখন অবশ্য তুমি আমি একই হইয়া যায়। দ্বিতীয় পরিস্থিতিতে তুমি আমিতে পরিণত হয়, তাহার পর অবশ্য সেই মূল স্থিতিতে প্রবেশ হয়। কিন্তু আর একটি স্থিতি আছে। তখন আমিকে তুমির কাছে যাইতে হয় না এবং তুমিকেও আমির কাছে আসিতে হয় না। তখন আমি নিজের মধ্যেই তুমিকে খুঁজিয়া পায়, তুমিকে খুঁজিতে বাহিরে যাইতে

হয় না। তদ্রূপ তুমিও নিজের মধ্যে আমিকে খুঁজিয়া পায়, আমির জন্য তুমিকেও বাহিরে আসিতে হয় না। উভয়ের মধ্যেই আশ্রয়-তত্ত্ব ও বিষয়-তত্ত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে। যে আশ্রয় সেই বিষয় এবং যে বিষয় সেই আশ্রয়। সুতরাং একের অভাব অপরের অভাব এবং একের প্রাপ্তি অপরের প্রাপ্তি—উভয়ে কোন ভেদ নাই। এই দুই এর সমীকরণ হইলে পরম পরিপূর্ণ সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়। তখন আশ্রয় ও বিষয়ের সাম্য অভিব্যক্ত হয়।

(৫)

তিনটি যোগ-ক্ষেত্রই কালের অতীত। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রের বাহিরে কালের রাজ্য বিদ্যমান। তৃতীয় ক্ষেত্র অভিব্যক্ত হইলে কালের রাজ্য পৃথক্ ভাবে আর থাকিবে না। প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষেত্র কালের রাজ্যের সমসূত্রে থাকিলেও ঐ দুইটি রাজ্যের মধ্যে কালের প্রভুত্ব নাই। কিন্তু প্রভুত্ব না থাকিলেও কিঞ্চিৎ প্রভাব বিদ্যমান আছে। প্রতি ক্ষেত্রেই বিভিন্ন স্তর আছে। নিম্নবর্ত্তী স্তরে কালের কিঞ্চিৎ প্রভাব লক্ষিত হইলেও ঊর্দ্ধ স্তরে তাহা অত্যন্ত হ্রাস প্রাপ্ত হয়। অবশ্য অতি সূক্ষ্মভাবে তাহা থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই। তৃতীয় ক্ষেত্রে বাহিরে কালের রাজ্য না থাকিলেও অন্তঃপ্রবিষ্টভাবে ঐ ক্ষেত্রের মধ্যে কালের শক্তি ক্রিয়া করিয়া থাকে। পরিপূর্ণ অবস্থা প্রাপ্তির জন্য ইহা আবশ্যক। ইহা ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইবে।

কালের ধর্ম্ম জরা এবং মৃত্যু। দেহের ক্রমিক বিকার, যাহার ফলে সদ্যোজাত শিশু-দেহ বৃদ্ধ-শরীরে পরিণত হয়, উহাই জরা। কালের প্রভাব বশতঃই ইহা ঘটিয়া থাকে। কালের জগতে জরা

হইতে কেহ মুক্ত হইতে পারে না। কালের দ্বিতীয় ধর্ম্ম মৃত্যু। কালের জগতে ইহাও সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। এই জন্য কালের জগৎকে মরলোক অথবা মৃত্যুলোক বলিয়া অভিহিত করা হয়। সুতরাং কালের রাজ্যের উর্দ্ধে কোন রাজ্য স্থাপিত হইলে তাহা হইতে কালের এই দুইটি ধর্ম্ম স্বভাবতই বর্জ্জিত হইবার কথা। ইহা ছাড়া, ক্ষুধা ও পিপাসা ইহাও কাল-রাজ্যের আনুষঙ্গিক ধর্ম্ম। সুতরাং ক্রমশঃ শুদ্ধ জগতে এই দুইটি ধর্ম্ম তিরোহিত হইয়া যায়। কালের রাজ্যের আর একটি আনুষঙ্গিক ধর্ম্ম কাম-বৃত্তির প্রভুত্ব এবং তদাশ্রিত ও তন্মুল অন্যান্য মানসিক বৃত্তির ক্রিয়া। শুদ্ধ রাজ্যে এই সম্বন্ধেও বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়।

মর্ত্ত্যলোকের উর্দ্ধে নানা প্রকার স্বর্গীয় ভুবনাবলী ও তদনুরূপ ভোগপ্রধান দিব্য স্থান আছে। এই জন্য ঐ সকল স্থানে কামের অভাব নাই এবং ভোগেরও নিবৃত্তি নাই। তবে ওখানে কালের বেগ ভূলোক হইতে অন্য প্রকার বলিয়া জরার অনুভব হয় না এবং কালে দেহের পতন ঘটে। ঐ সকল স্থান কর্ম্ম-ভূমি নহে। উহারা ভোগভূমি এবং যোগীর পক্ষে সর্ব্বথা হেয়। পূর্ব্বে যে যোগ-ক্ষেত্রের বর্ণনা করা হইয়াছে উহারা অত্যন্ত বিশুদ্ধ এবং কর্ম্ম-ভূমি বলিয়া ঐ সব স্থানে ভোগের আধিপত্য নাই, যদিও কালের প্রভাব অনুভূত হয়। কিন্তু উর্দ্ধ স্তরে তাহা হয় না। কিন্তু কালের কিঞ্চিৎ প্রভাব থাকে বলিয়াই নিম্ন স্তর মৃত্যু-বর্জ্জিত হইলেও জরা-বর্জ্জিত নহে। স্বর্গাদি ভোগস্থান যেমন জরা-বর্জ্জিত হইলেও আপেক্ষিক মৃত্যু-বর্জ্জিত নহে, এইগুলি ঠিক তাহার বিপরীত— মৃত্যুবর্জ্জিত হইয়াও জরা-বর্জ্জিত নহে। উর্দ্ধ স্তরে মৃত্যুত নাই-ই,

জরাও নাই। নিম্ন স্তরে জরা থাকে বলিয়াই সেখানকার যোগী ঋষিগণ সহস্র সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন এবং জরাজীর্ণ দেহে কর্ম্ম পূর্ণ করিতে নিরন্তর উদ্যত থাকেন। এই কর্ম্মের ফলেই তাঁহারা নিম্ন স্তর হইতে উর্দ্ধ স্তরে উন্নীত হন। তখন তাঁহাদের স্থবির জীর্ণ দেহ কিশোর অথবা তরুণ দিব্য লাবণ্যময় শ্রী-বিগ্রহ রূপে পরিণত হয়। গুরুধাম এবং জ্ঞানগঞ্জ উভয় স্থানেই এই বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়।

—ক্রমশঃ

শ্রীশ্রী৺গুরুদেব স্মরণে

শ্রীমুনীন্দ্রমোহন কবিরাজ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৩)

কোন্ সালের কথা তাহা বলিতে পারিব না, তবে ইহা যে প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা তাহাতে সন্দেহ নাই। তখন একদিন বর্দ্ধমান আশ্রমে হল ঘরে শ্রীশ্রীগুরুদেব পালঙ্কের উপর নিজ আসনে বিরাজমান ছিলেন। সম্মুখে আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা ৺হরগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, ৺উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী, ৺কালাচাঁদ মজুমদার, ৺বিনোদবিহারী ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বসিয়া ছিলেন। আমরা কিছু দূরে বসিয়াছিলাম। প্রসঙ্গতঃ সৃষ্টি-রহস্য সম্বন্ধে কথা উঠিল। তখন বাবা সামান্য এক টুক্‌রা কাগজ লইয়া দুই অঙ্গুলি মধ্যে উহা ধারণ করিয়া গুলি পাকাইতে লাগিলেন, তাহার পর একটু হাওয়াতে নাড়াইয়া আমাদিগকে বলিলেন, "এই দেখ কর্পূর হইল।" তখন তাঁহার কথা শুনিয়া সভাতে উপস্থিত সকলেই উহা হইতে কিছু কিছু অংশ বাহির করিয়া মুখে দিলেন। দেখিতে পাওয়া গেল যে উৎকৃষ্ট কর্পূর রচনা হইয়াছে। বাবা ঐ কর্পূরের বাকী অংশটুকু হাতে লইয়া গুটি পাকাইতে পাকাইতে বলিলেন, "এই দেখ স্ফটিক হইল।" সকলেই উহা স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। কেহ কেহ স্ফটিকটি

দেখিয়া বলিলেন যে স্ফটিকটি ঠিকই হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে ছিদ্র নাই। ইহা শুনিয়া বাবা ঐটি পুনর্ব্বার হাতে লইয়া মুঠার মধ্যে পাকাইতে পাকাইতে উহাকে একটি বড় আমলকীতে পরিণত করিলেন। উহা সকলেই দেখিতে পাইলেন। উহা পুনর্ব্বার দুই আঙ্গুলে ধরিয়া দুই একবার বাতাসে নাড়িয়া মুঠার মধ্যে পাকাইতেই উহা একটি মধ্যমাকারের কাঁচামিঠে আম্র ফলের আকার ধারণ করিল। ঐ আমটি কাটিয়া উপস্থিত সকলকেই একটু একটু খাইতে দেওয়া হইল। বাকীটুকু তিনি মুষ্টি মধ্যে গ্রহণ করিয়া পাকাইয়া হাওয়া দিতে দিতে বলিলেন, "এই দেখ জবাফুল।" একটি রক্তবর্ণ শীষ জবা বা ওর জবা দেখিতে পাওয়া গেল। বোঁটা ধরিয়া ঐটিকে তিনি সকলকে দেখাইলেন ও বাম হস্তের তালুর বিপরীত দিকে ফুলটি নামাইয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে ক্রমশঃ ফুলটির শীষ ও পাপ্ড়ি ও সর্ব্বশেষে সবুজ বোঁটাটি হাতে ঢুকিয়া গেল। উপস্থিত আমরা সকলে দেখিয়া অবাক্ হইলাম।

পর বৎসর জন্মাষ্টমীর সময় বর্দ্ধমান গিয়াছিলাম। কথা-প্রসঙ্গে বাবা প্রকাশ করিলেন যে, কিছু পূর্ব্বেই তিনি বিজ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মার পরমাণু ধরিয়া রাখিয়াছেন। ইহা শুনিয়া কোন কোন গুরুভাই উহা দেখিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন। তখন বাবা বলিলেন যে একটি ছোট রূপার থালা এবং কিছু পরিমাণ গালা (চাঁচ্) সংগ্রহ করিয়া যেন তাঁহার নিকট উপস্থিত করা হয়। তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে রূপার থালা আনা হইল এবং গালাও আনা হইল। ইহার পর থালার উপর গালার টুকরাগুলি

রাখিয়া তাপ দ্বারা ঐগুলিকে গলাইয়া একটি গালার থালা প্রস্তুত করা হইল। ইহা সকাল বেলার কথা। বৈকালে বহু শিষ্য আসিয়া জুটিলেন। তখন বিনোদ দাদা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। বাবার আদেশ মত একটি ষ্টপার্ড শিশি যাহার মুখেও ষ্টপ্ কর্ক লাগান ছিল এবং পূর্ব্বোক্ত রূপার থালাটির উপর যুক্ত গালার থালাটি আনা হইল। সকলেই বাহিরের আলোকে নিয়া থালাটি স্পষ্টভাবে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিতে পাওয়া গেল যে, ঐ গালার থালাটি অস্বচ্ছ। সাধারণ গালার থালা যে প্রকার হওয়ার কথা উহাও ঠিক সেইরূপই ছিল। তখন তিনি রূপার থালার উপর ঐ থালাটি রাখিয়া শিশিটির কর্ক দুইটি খুলিয়া একটি ছোট কাঠি শিশির মধ্যে ডুবাইয়া থালাটিতে ফেলিয়া দিলেন ও শিশি বন্ধ করিলেন। তখন সোঁ করিয়া একটু শব্দ হইল। ঐ শব্দ শুনিয়া বাবা উপস্থিত সকলকে বলিলেন, "ঐ শব্দ শুন—পরমাণু নিজের কাজ করিতেছে।" একটু পরে যখন শব্দ বন্ধ হইল তখন গালার থালাটি হাতে তুলিয়া নিজে দেখিয়াই উহাকে আলোতে ধরিতে বলিলেন। তখন সকল শিষ্যই দেখিতে পাইলেন যে, গালার থালায় একটি উজ্জ্বল ভাবে অঙ্কিত "ওঁ"কার চক্‌চক্ করিতেছে। বিনোদ দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "শিশিটা ত ফেটে যেতেও পারে।" উত্তরে বাবা বলিলেন, "না গো, না। সেরূপ যাহাতে না হয় এমন ভাবে রাখা হইয়াছে। কিন্তু শিশিটি খুলিয়া রাখিলে দোতালা, তেতালা ছাদ ভেদ করিয়া আকাশে মিশিয়া যাইত।"

আমরা পাড়াগাঁয়ের গরীব শিষ্য। এইজন্য বাবা আসিলেই

আমরা বর্দ্ধমান আশ্রমে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতাম। ঐ বৎসর জন্মাষ্টমীর দিন সকলেই পৌঁছিয়াছিলাম। বাবা বলিলেন, "আজ তিন চার দিন আহ্নিকের সময় ঘরে ভাটা-গড়ান শব্দে ক্রিয়ার ব্যাঘাত হইতেছে। হঠাৎ চক্ষু মেলিয়া দেখিলাম একটি গোপাল আমার লক্ষ্মী-নারায়ণের সঙ্গে ভাটা খেলিতেছে। দেখিবা মাত্র শ্রীগোপাল ও শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ হাসিয়া উঠিলেন।" এই কথা-প্রসঙ্গ উপেন দাদার সঙ্গে হইয়াছিল। বোধ হয় বেলা বারটা একটার সময় পুলিশ সাহেব ৺গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় একটি নিখুঁত গোপাল মূর্ত্তি ও তাঁহার জন্য তাঁহার পুত্র ভুজঙ্গবাবু (সম্ভবতঃ আলীপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট) কাঠের একটি কার্পেট-পারা সিংহাসন লইয়া আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। বাবার আদেশে তাঁহার আহ্নিকের ঘরে সিংহাসনে শ্রীগোপালকে রাখা হইল। বৈকালে গিরীন দাদার ইচ্ছানুসারে গাড়ী করিয়া উপেন দাদা, তিনি ও আমি তিন জনে যাইয়া শ্রীগোপালের জন্য লাল পাটের ধুতি চাদর খরিদ করিয়া আনিলাম। বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি আনিলে?" গিরীন দাদা বলিলেন, "ধুতি চাদর"। বাবার হাতে দিতেই বাবা বলিলেন, "চিরকালের ন্যাংটা শিশু—এ কি কাপড় পড়তে বা রাখতে পারবে? তা হোক, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, পরাইয়া দাও।" কাপড় পরান হইল। গলায় একটি ছোট হার (সম্ভবতঃ গিরীন দাদার স্ত্রীর দেওয়া) ও উত্তরীয় কোচ করিয়া দেওয়া হইল। শ্রীশ্রীবাবা একটি বড় লম্বা সাইজ আঙ্গুর হাতটিতে দিলেন। পরদিন দেখা গেল গোপাল ঘামিয়াছে

কাপড় চাদর ভিজিয়া ঘাম গড়াইয়া সিংহাসন লাল রঙ্গে রঞ্জিত করিয়াছে। দেখিলেই মনে হয় যেন কেহ লাল কালি ঢালিয়া দিয়াছে। শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন, "ঐ দেখ বাপু, ওকে কেন কষ্ট দেওয়া ? বেশ হলো, একদিন পড়ালে, এখন খুলে দেও।" বাবা গোপালের হাতে আঙ্গুর দিলেন। একটু উপরে বসে নিজের কথা বলিতে বলিতে দেখা গেল গোপাল আঙ্গুর খেয়ে শেষ করেছেন। রসের দাগ দেখাচ্ছে। এ ছাড়া কখনও কখনও গোপালের চোখে জল গড়াইত, এরূপও দেখা গিয়াছে। শেষে শ্রীপতিচরণ দত্ত দাদার বাড়ীর মেয়েরা একদিন নিজেদের প্রস্তুত ছানা, মাখন ও নানা রকম সন্দেশ মিষ্টি দিয়া ভোগ দেওয়ার পর আর চোখের জল পড়ে নাই। এই গোপাল মূর্ত্তিটি পাওয়ার ইতিহাসও একটি আশ্চর্য্য ঘটনা।

পর বৎসর ৺জন্মাষ্টমীর সময় সর্পী ইছাপুর অঞ্চলের প্রায় সকল শিষ্যই এক সঙ্গে একই ট্রেণে বর্দ্ধমান আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হয়। আমিও সঙ্গে ছিলাম। তখন শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় দাদা আশ্রমের কাজকর্ম্ম পরিদর্শন করিতেন। জন্মাষ্টমীর কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য একটি অতিরিক্ত ব্রাহ্মণকে পূর্ব্বদিনের সন্ধ্যা ও উৎসবের দিন দুইবেলা কার্য্য করিবার জন্য ভার দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু কোন বিশেষ কারণে ব্রাহ্মণটি উপস্থিত হইতে পারে নাই। বীরেন দাদা তখন অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি আমাদিগকে দেখিবা মাত্র বলিয়া উঠিলেন, "এই যে ইছাপুরের দল আসিয়া পড়িয়াছে, আর কোন ভাবনা নাই।" ইহার তাৎপর্য্য এই, ইছাপুরের শিষ্যগণ প্রায়

সকলেই সকল কাজেই পটু এবং কাজ করিতে পাইলে নিজেকে ধন্য বোধ করে। এই কথা বাবাকে শুনাইয়া বলা হইল। যথা-সময়ে যথাবিধি কার্য্যাদি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গেল। বিদায় কালে সাড়ে তিনটার ট্রেণের সময় হইবার পূর্ব্বেই পূজনীয় ৺রাধিকাপ্রসাদ রায়চৌধুরী দাদা মহাশয় বিদায় লইয়া আসিলেন। তিনি আমার হেড্মাষ্টার ছিলেন। তাহার পর আমিও বিদায় লইলাম। দুইজনে এক সঙ্গে বাহিরে আসিয়া ষ্টেশনে যাওয়ার পথে ফুট-বলের মাঠটি পার হওয়ার সময় সঙ্কল্প করিলাম যে ঐ দিন হইতে আমরা ভোর তিনটায় আহ্নিকে বসিব এবং ছয়টায় উঠিব। আমার ভিতর ঐ সঙ্কল্প খুব প্রবল ভাবে উঠিয়াছিল এবং বাস্তবিক পক্ষে আমি ঐ দিন হইতে ভোর আড়াইটাতে উঠিয়া শৌচাদি সারিয়া ঠিক তিনটার সময় বসিতে লাগিলাম। তিন ঘণ্টা আহ্নিক করিয়া প্রতিদিন ভোর ছয়টায় উঠিতে লাগিলাম। এই প্রসঙ্গে বাবার একটি কথা মনে পরিতেছে। তিনি বলিতেন, "বাপুরে, আগুনকে বাবা বলিলেই বা কি, শালা বলিলেই বা কি, সে নিশ্চয়ই পোড়াইবে। তুমি যেমন ভাবেই জপ কর কাজ কিছু হইবেই।" সেই সময় অবশ্য শিশু শ্রেণীতে ছিলাম, তাই তখনকার কথা নাই বা বলিলাম। কিন্তু এখনও দেখি সব সময়ে মন স্থির থাকে না—জপ অবশ্যই চলে, তদনুসারে আঙ্গুলও চলিতে থাকে, কিন্তু মন অন্য কোন চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে। বিষয়ান্তর হইতে তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়া আবার যথাস্থানে লাগাইতে হয়, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আবার চলিয়া যায়। এইরূপই সাধারণতঃ হইয়া থাকে।—এই প্রকার নিজের মনের

অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া কাশীতে থাকার সময় একদিন শ্রীগুরুদেবকে বলিয়াছিলাম, "বাবা, চাকর বাউলের একটা গানের কথা সর্ব্বদাই মনে হয়। গানটি এই—

যা হবার নয় তাই মনে হয় ঘুরে ফিরে,
সে কি সাধারণ বস্তু যে মিলবে তোরে—
বনের টিয়া চন্দনা ফেলি
আন্‌লাম কোচ বগলি,
মনে করলাম রাধাকৃষ্ণ বল্‌লেও বল্‌তে পারে।
কিন্তু এমনি পাখী নষ্ট কত দেয় কষ্ট,
কয় না রাধাকৃষ্ণ শুধু কোক্ কোক্ করে।
যদি সুজাত পক্ষী হতো
শিখালেও শিখিত বলালেও বলিত 'হরে কৃষ্ণ হরে' ॥

বাবা, সুজাত পক্ষী নই, কি করে হবে? ভরসা আপনার কৃপা মাত্র।"

এইভাবে তিন দিন ঠিক তিনটায় বসিয়া সকাল ছয়টায় আহ্নিক শেষ হইল। চতুর্থ দিন ভোরে শৌচাদির জন্য মাঠে গিয়াছিলাম। একটা পাগ্‌লা শেয়াল হঠাৎ চুপি চুপি আসিয়া কামড়াইয়া দিয়া চলিয়া গেল। বাতি হাতে করিয়া পেছনের দিকে তাকাইয়া দেখি একটা শেয়াল, গায়ে একেবারে লোম নাই। দেখিয়া পুকুরে যাইয়া ক্ষত স্থান জল দিয়া ধুইলাম ও বাড়ী ফিরিয়া কার্ব্বলিক এসিড্ দিয়া পোড়াইলাম। তারপর আহ্নিক করিতে বসিলাম। আহ্নিক হইতে উঠিয়া শ্রীশ্রীগুরুদেবকে খামে সব লিখিয়া জানাইলাম। ইতিমধ্যে শুনিতে পাইলাম

কমলপুর গ্রামের অঞ্চলে পাগ্‌লা কুকুরের দংশনে দুইটি লোক মারা গিয়াছে। মনটা চঞ্চল হইল। দশ বার দিন পর সর্পীর জগদানন্দ গোস্বামী দাদাকে বাবা একটি ঔষধের গাছের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন যেন উহা তুলিয়া আমাকে দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত আমাকে কিছু বেশী পরিমাণে ঘি খাইতেও আদেশ করিলেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন, "এই গাছ যদি পাওয়া যায় তবে বিধি-লিপিরও খণ্ডন হইবে। ইহা শিখিয়া রাখ। ইহা দ্বারা সাধারণ লোকের উপকার করিতে পারিবে।" জগদানন্দ দাদা এখন পরলোকে। তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ গুরুগতি গোস্বামী বাবার দেহে অবস্থান কালেই তাঁহারই আদেশানুসারে ৺দুর্গাদাদার নিকট দীক্ষা লইয়াছিলেন। আমার পিতা ঠাকুর মহাশয় উদ্বিগ্ন হইয়া বাবার নিকট গিয়াছিলেন। বাবা তাঁহাকে বলিলেন, "আজই জগদানন্দকে ঔষধ দিয়া পাঠাইয়াছি। কোন চিন্তা নাই। ঘরে বা গ্রামে যদি কাহারও সুলতানী বনাত থাকে এক আনা ওজন ঘৃতের সঙ্গে খাওয়াইয়া দিতে পার। কিছুদিন ঘৃত খাওয়াইবে।" আমি তাহাতেই ভাল হইলাম। আবার দুই এক বৎসর পরে দুইটি কুকুর ঝগড়া করিতে করিতে আমার পায়ে কামড়াইয়া দিল, তখনও সেই ঔষধের দ্বারাই আরোগ্য লাভ করি। ইহার পর ধানবাদে যখন বাবার শ্রীচরণ দর্শন করিতে গিয়াছিলাম তখন বাবা বলিলেন, "কুকুরটা মারা যাবে।" বাড়ী ফিরিয়া সংবাদ লইলাম, জানিতে পারিলাম যে কুকুরটি রক্ত দাস্ত করিতেছে। উহার তিন চার দিন পরেই উহা মারা গেল।

সন ১৩৩০ সালে আমার বাড়ীতে আমার ও আমার স্ত্রীর

অনুপস্থিতি কালে রাত্রে চুরি হয়। তাহাতে আমার মেজ কন্যার সমস্ত অলঙ্কার, বড় ছেলে মদনের শ্বশুরের দেওয়া চেন্ এবং আমার স্ত্রী ও অন্যান্যদের যাহা কিছু ছিল সব চুরি হয়। ইহা ছাড়া একটি বাক্সে ভাল ভাল কাপড়-জামা থাকিত তাহা, ৺দুর্গাদেবীর বিজয়া দশমীর যাত্রার টাকা চব্বিশটি এবং একটি বড় ঘড়া চুরি হয়। শ্রীশ্রীবাবাকে আমি এই সংবাদ জানাইয়া প্রার্থনা করি যে, আমাদের নিজের যাহা কিছু ছিল তাহা যাওয়ার জন্য তত দুঃখ নাই, কিন্তু কন্যার অলঙ্কার চুরি হওয়াতে আমার মনে অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছে, কারণ উহা পুনর্ব্বার দিবার ক্ষমতা আমার নাই। এই অলঙ্কারের জন্য আমাকে সমস্ত জীবন গঞ্জনা লাঞ্ছনা ও অপমান ভোগ করিতে হইবে। এই পত্রের উত্তরে বাবা লিখিলেন, "চিন্তার কোন কারণ দেখি না। উপদেশ মত কর্ম্ম ঠিক ভাবে করিবার চেষ্টা করিলে সকল বিষয় আনন্দ পাইবেই পাইবে।" শ্রীশ্রীবাবার চিঠির কথা সকলেই জানিতে পারিলেন। এদিকে পুলিশেরও ফাইনেল রিপোর্ট দেওয়া হইয়া গেল। যে চুরি করিয়া ঐ সকল দ্রব্য আত্মীয়ের নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিল, দিন কয়েক পরে একদিন রাত্রি দশটার সময় সেই আত্মীয়ের একটি মাত্র পুত্রের হাতে কিসে যেন কামড়াইল বলিয়া মনে হইল। দেখিতে দেখিতে হাত প্রবল ভাবে ফুলিয়া গেল, কাঁধ পর্য্যন্ত ফুলিয়া গেল এবং ছেলেটি যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া স্বামী বলিয়া উঠিল—"পরের জন্য নিজের একটি মাত্র পুত্র হারাইলি। শুনিয়াছি মুনীন্দ্রের গুরুদেব স্বয়ং শিব মহাযোগী।" এই কথা

বলিতে বলিতেই স্ত্রী অলঙ্কারগুলি স্বামীর হাতে দিয়া কাতরভাবে বলিল "এই নাও, ফিরাইয়া দেও, যেন ছেলেটি ভাল হয় আর আমাদের কোন বিপদ না হয়।" অলঙ্কারগুলি ফিরাইবার জন্য আমার কোন আত্মীয়ের হাতে দিবার পর দেখা গেল ছেলের যন্ত্রণা নাই এবং হাতের ফুলাও ধীরে ধীরে সব নিশ্চিহ্ন হইল। ইহার পরে স্বামী বলিল "দেখলি ত কেমন তাঁর খেলা। তিনি যে ভগবান্ তা বুঝলি ত ?"

সন ১৩৩১ সালের প্রায় অধিকাংশ দিনই প্রত্যহ অণ্ডালে ফিরিয়া আসিয়া রাত্রে থাকিয়া সকাল বেলা অণ্ডালের রোগীদিগকে ঔষধাদি দিয়া বেলা দশটার সময় আহারাদি শেষে ইছাপুর সর্পী প্রভৃতি অঞ্চলের রোগীদিগকে ঔষধ দেওয়া হইত এবং সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিয়া আসা প্রায় নিত্য নিয়মিত কার্য্য ছিল। একদিন গরমের সময় বাড়ী ফিরিতে আমার একটু বিলম্ব হয়। রাস্তায় একটি পুকুরের পারের নীচের পথে দ্রুতবেগে চলিতে চলিতে মনে হইল যেন কাঁটা ফোড়া গেল ও একটি সর্প লাফাইয়া পালাইল। তখন মনে হইল সাপটা বোধ হয় পায়ের নীচে দাবা পড়িয়াছিল। বাক্স বহনকারিণী বলিল, "কাকাগো, জাত সাপ তুধে খরিস্।" জ্বালা করিতেছিল। বাক্সে আইয়োডিন্ ছিল; বেশ করিয়া লাগাইয়া দিলাম। কামিন্‌টি বলিতে লাগিল, "ফিরিয়া চলুন গোষ্ঠ কাকার কাছে।" শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্ত্তী সাং ইছাপুর আমাদের গুরুভাই, উৎকৃষ্ট সাপের ওঝা। তাহাকে বলিলাম, "না, ঘরেও বলিও না।" শ্রীশ্রীগুরুদেবের স্তোত্রপাঠ করিতে করিতে জ্বালা সত্ত্বেও দ্রুত পা উঠাইয়া বাড়ী

পৌঁছিলাম। কিন্তু মেয়েটি আমার স্ত্রীকে বলিয়া দেয়। গ্রামের দুইজন ওঝা আমার নিকট আসিতেই আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি ভাই, কি দরকার?" তাঁরা বল্‌লেন, "তুমিই ত ডেকেছ।" আমি বুঝিলাম এবং পাটি দেখাইলাম ও বলিলাম, একদিকে একটি দাঁত একটু প্রবেশ করিয়াছিল, অন্য দিকে উপরের প্রথম স্থান হইতে দ্বিতীয় স্থান পর্য্যন্ত আঁচর। চুল দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল দাঁত নাই, জ্বালা অবশ্য আছে। "ঔষধ দিব, লোক পাঠাইয়া দাও" ইহা বলায় বলিলাম, "না, ঔষধ খাইব না।" এই সময় আমার ছোট ছেলে শ্রীমান্ গুরুপদ বলিল—"শ্রীশ্রীগুরুদেবের ঔষধ একটি গাছ, পটু দাদাকে দিয়াছিলেন, একটি ঘরে রাখিয়াছেন। সেইটি বেঁটে দিই।" সেই ঔষধ 'জয়গুরু' বলিয়া খাইয়া ফেলিলাম। ওঝারা বলিয়া গিয়াছিল যেন খাইতে ও ঘুমাইতে দেওয়া না হয়। আমি চা খাইয়া আহ্নিক করিতে বসিলাম। নিয়মিত সময়ের মধ্যেই আমার জ্বালা-নিবৃত্তি হইল। ক্ষুধা পাইয়াছে, কিন্তু ওঝার উপদেশে উহারা খাইতে দিতে চায় না। শেষে দুধ, মুড়ি খাইলাম। মাটির কোঠার উপর গিয়া শুইলাম। এদিকে নীচ হইতে মা ও মেয়েরা সতর্ক করিতে লাগিলেন, বলিলেন, "ঘুমুলেন নাকি?" একটু নিস্তব্ধ ভাব হইতেই পুনর্ব্বার ঘুমের আবেশ আসিতে লাগিল। উত্তর দিকের জানালা খোলার শব্দ পাওয়া গেল। নীচ হইতে বলা হইল, "উত্তর দিকের জানালা খুলিসে কি?" ঘুম ভাঙ্গিয়া চোখ চাহিয়া দেখিতে পাইলাম যেন কত সার্চ্চ-লাইটে ভরা উজ্জ্বল আলোক, সঙ্গে সঙ্গে ভুর ভুর করিয়া শ্রীশ্রীবাবার অঙ্গ-সৌরভ। তখনই একটু স্বস্থ হইয়া

স্ত্রী ও মেয়েকে দেখিতে ডাকিলাম। তাহারা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিল, আনন্দে বলিয়া উঠিল, "এবার নিশ্চিন্তে ঘুমান, যখন শ্রীশ্রীবাবা এসেছেন তখন আর ভয় কি? ভাবনাই বা কি?" শ্রীশ্রীবাবার এই কৃপা আমরা প্রত্যেকেই অল্লাধিক জানিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি।

একবার বর্দ্ধমান আশ্রমে আমি ৺জন্মাষ্টমী উপলক্ষে এক ঝাঁকা সর্পীর কচু, কিছু ঝিঙ্গা, ধুন্দুল ও থাঁড়া লইয়া গিয়াছিলাম। বীরেন দাদা উহা যথাবিধি ভাণ্ডারে রাখিয়া দিলেন। কলিকাতা হইতে অনেক গুরুভাই কলা, কমলানেবু, আপেল, বেদানা ইত্যাদি আনিয়া বীরেন দাদাকে দেন। দেখিয়া আমার মনে একটু ক্ষোভ জন্মিল। মনে হইল সকলে ভাল ভাল ফল আনিতেছেন আর আমি আনিলাম শুধু কচু! বৈকাল বেলা পর্য্যন্ত অনেকেই অনেক কিছু আনিলেন। প্রত্যেক বারই আমার দুঃখ একটু করিয়া চাড়া দিয়া উঠিত। শ্রীশ্রীবাবা সন্ধ্যার পূর্ব্বে উপরে উঠিয়া যাওয়ার সময় হঠাৎ ভাণ্ডারের কুঠরীতে প্রবেশ করিয়া থলে ও ঝাঁকা প্রভৃতির মধ্যে কোন্‌টাতে কি আছে একটি একটি করিয়া দেখিতে লাগিলেন। অন্তর্য্যামী আমার মনের ক্ষোভ দূর করার জন্য "দেখি কি আছে" বলিয়া ঝিঙ্গে ধুন্দুল ও থাঁড়ার পরে কচু দেখিয়া বলিলেন, "মুনীন্দ্র এনেছে বুঝি? এই কচু ভাল, আমার মা খুব ভাল বাসেন। এখানকার জন্য রেখে কাল কিছু পাঠাইয়া দিও।" আমার আর বলিবার কি আছে? ক্ষোভ অবশ্য গেল। মনে মনে প্রণাম করিয়া বলিলাম, "ঠাকুর, তোমার খেলা বুঝে কে?"

সেই সময় শ্রীশ্রীবাবার নিকটেই আছি। কেহ বলিতেন চাক্‌রী করিতেছি, আবার কেহ কেহ বলিতেন খুব অভাবের জন্য চাক্‌রীর নাম করিয়া বাবা নিকটে রাখিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত কথা এই, বাবা আমার মৃত্যুযোগ লক্ষ্য করিয়া আমাকে নিজের নিকট হইতে দূরে যাইতে দিতেছিলেন না। তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমার আর ফিরে যাওয়া চল্‌বে না, তোমার মৃত্যুযোগ রয়েছে। আমি পিতা বর্ত্তমানে ছেলেকে কালের কবলে ঠেলে ফেলে দিতে পারব না। বৌমা, ছেলে প্রভৃতিকে ব'লো এইখানে তোমার চাক্‌রী হইয়াছে। পঁচিশ টাকা বেতন, দুইবেলা আশ্রমে আস্‌তে পারবে। বুঝাইয়া বলিলেই সকলে রাজী হইবে।" বাৎসরিক তিনশত টাকার অনেক অধিক বাবা দিতেন। বাড়ী পাঠাইবার টাকা বাবাই দিতেন। মদন ও আমার বড় বৌমা উভয়েই শিষ্য, তাহাদের কষ্ট বুঝিলেই বাবা চল্লিশ, পঞ্চাশ টাকা দিতেন। বলিতেন, "পাঠাইয়া দাও।" ইহা ছাড়া কাপড়, জামা, সুয়েটার, কম্বল, মশারী ইত্যাদির তো কথাই ছিল না। বিনা অনুমতিতে আশ্রমের বাহিরে যাওয়ার নিষেধ ছিল। প্রথমে রাসবিহারী দাদার সহকারী ছিলাম, পরে রাসবিহারী দাদাকে তীর্থ-ভ্রমণের জন্য দুইশত টাকা দিলেন, সেই সময়ে বাবার সেবার ভার আমারই উপর ন্যস্ত হইল। রাসবিহারী দাদা ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে বগুল আশ্রমে স্থান দিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সে সেইখানেই ছিল। শ্রীশ্রীবাবার এই সকল কৌশল পরে বুঝিয়াছিলাম। এই সময়ে নানা প্রকারে আমাকে পরীক্ষা করিয়া তাঁহার আস্‌বার পত্র টাকাকড়ি প্রভৃতি সকল বিষয়েরই ভার

আমাকে দিয়াছিলেন। শিষ্যেরা, বিশেষতঃ কটক অঞ্চলের শিষ্যেরা, গঞ্জাম সিল্কের ধুতি দিয়া প্রণাম করিলে ঐ সকল ধুতি কুমারীর জন্য পার দিয়া যোগিয়া রঙ্গে রঞ্জিত করিবার জন্য ৺রমেশ মৈত্র দাদার হাতে দিতেন। তিনি ঐগুলি রঙ্গ করাইয়া আনিয়া যথাসময়ে বাবাকে ফেরত দিতেন। আমার নিকট ঐগুলি গচ্ছিত থাকিত। এইভাবে বার খানি কাপড়ের পার ও রঙ্গ দেওয়া সম্পন্ন হইলে আমি বাবাকে ঐ বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতাম। তখন বাবা আমাকে আদেশ করিতেন, "ঐগুলি সাড়ীর বাক্সে ভাল করিয়া প্যাক কর, ডি. এম. সি. সুতা দ্বারা বাঁধ ও দুই তিনটি শীল কর।" তিনি শীল-মোহর দিতেন। আমি শীল করিয়া তাঁহার হাতে দিতাম। চারিদিকের শীলগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন ও বলিতেন—"কুমারী-মাতাদের জন্য এগুলি পাঠাইয়া দেওয়া যাক্।" এই বলিয়া বাক্স দেওয়ালের দিকে ছুড়িয়া দিতেন—সঙ্গে সঙ্গে বাক্সটি অদৃশ্য হইত। আধ ঘণ্টার মধ্যে সেই বাক্স ও সেই সুতা কেবল "জ্ঞানগঞ্জ স্বামীজীর আশ্রম" এই প্রকার শীলযুক্ত হইয়া তেতালা ও দোতালার ছাদ ভেদ করিয়া শ্রীশ্রীবাবার আহ্নিকের ঘরে সুগন্ধযুক্ত ভাবে পড়িত। এই সকল অলৌকিক ব্যাপার আমি বহু ভাগ্যবশে দেখিবার অবসর পাইয়াছি।

কাশী রামনগরের তদানীন্তন চীফ জজ সাহেবের ছেলে শ্রীযুক্ত সুরজপ্রকাশ মুশরাণী এম-এ, আমাদের গুরুভাই ছিলেন। তাঁর খুব অসুখ, তিন দিন অজ্ঞান। ডাক্তারবাবুরা আশা কম বলিয়া মত প্রকাশ করায় জজ-সাহেব বাবাকে এ সংবাদ দিয়া বলিলেন

"বাবা, আপনার শরীর ভাল নাই। তাই বলতে পারছি না। একবার চরণধূলি দিয়া আসুন।" বাবা বল্‌লেন, "আচ্ছা, দেখা যাক্।" বাবা সেই রাত্রেই সূক্ষ্ম শরীরে সেখানে যান এবং সূরজপ্রকাশ দাদা "শ্রীশ্রীগুরুদেব এসেছেন"—বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। তাহার পিতা ও অন্যান্য সকলে শ্রীগুরুদেবের গাত্র-সৌরভ অনুভব করিলেন। সূরজপ্রকাশের জ্ঞান সঞ্চার হইল এবং সে পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে পথ্য করিল। ইহার ফলে জজসাহেব তাঁহার বন্ধুসহ পাঁচশত টাকা একটি খামের মধ্যে মুড়িয়া শ্রীশ্রীবাবার হাতে দিয়া বলিলেন, "এই টাকা জ্ঞানগঞ্জের কুমারী-মা'দের ভোজনের জন্য দিলাম।" বাবা খাম খুলিয়া দেখিলেন, পাঁচখানি একশত টাকার নোট। তখন অনেক শিষ্য উপস্থিত ছিলেন। বাবা বলিলেন, "পাঁচশত টাকা?" উত্তর—"হাঁ বাবা।" ইজি চেয়ারের হাতলের উপর টাকা সহ খামটি রাখিয়া দুইটি বড় ও একটি ছোট চাপড় দিয়া বলিলেন—"পাঠাইয়া দিতেছি।" সঙ্গে সঙ্গে খাম অদৃশ্য হইয়া গেল। প্রায় পাঁচ মিনিট পরে খামটি ছাদ ভেদ করিয়া সুগন্ধ বিছাইয়া পড়িল। বাবা দেখিয়া বলিলেন, "ঐ দেখ গো তোমার সেই খামটি ফিরিয়া আসিল, এটি ঘরে লইয়া যাও।"

একবার ৺শিবরাত্রি পর রাত্রি সাড়ে দশটার সময় কাশী আশ্রমে তেতালার বারাণ্ডায় রোহিণীকুমার চেল দাদা দাঁড়াইয়া আছেন—আমি ভিতরে শুইয়া। শ্রীশ্রীবাবা নিজ ঘর হইতে আকাশ মার্গে যাইতেছেন, রোহিণী দাদা দেখিয়া সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, "শ্রীশ্রীবাবা আকাশ-মার্গে যাইতেছেন।" তাড়াতাড়ি বাহিরে

গিয়া দেখি একটি জ্যোতির্ম্ময় গোলা উর্দ্ধে উঠিয়া উঠিয়া ক্রমশঃ অদৃশ্য হইয়া গেল। রোহিণী দাদা বলিলেন "প্রথমে চিনিতে পারা গিয়াছিল।"

আমি তখন কাশী আশ্রমে শ্রীশ্রীবাবার নিকটে। একদিন কথা-প্রসঙ্গে প্রত্যেক জিনিষই যে সছিদ্র সেই কথা হইতেছিল। দশ বার জন গুরুভাইও সেখানে ছিলেন। কে একজন বলিয়া উঠিলেন, "কাঠটি ?" (শ্রীশ্রীবাবার ছপ্পর খাটের কাঠ দেখাইয়া) উত্তরে বাবা বলিলেন, "নিশ্চয়ই।" বলিয়া বিছানা সরাইয়া আঙ্গুল দ্বারা ঘসিয়া দিয়া বলিলেন, "ঐখানে একটি ধাতুর টাকা রাখ।" রাখা হইল, সেটি মিশিয়া গেল। এইভাবে এক একটি করিয়া ক্রমে দশটি টাকা রাখা হইল। দশটি টাকাই ঢুকিয়া গেল এবং উপরে কাঠের আবরণ পড়িল। এক ভাই বলিলেন,—"উহা পাওয়া যাইতে পারে ?" উত্তরে—"হাঁ নিশ্চয়ই, কুমারী-ভোজন করাও।" বলা মাত্র সকলেই চুপ। পুনঃ বাবা বলিলেন, "আমিই কুমারী-ভোজনের ব্যবস্থা করিব।" বলিয়াই সেই জায়গাটি পুনঃ আঙ্গুল দিয়া ঘসিয়া দিলেন, দেখিতে দেখিতে কাঠের উপরে টাকা দশটিই ক্রমশঃ উঠিয়া আসিল। বাবা বলিলেন, "যার যেটি তুলিয়া লও।" সকলেই তুলিয়া লইলেন।

বর্দ্ধমান আশ্রমে আছি। উখরার হেড পণ্ডিত মহাশয় শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর গোস্বামী আমার বন্ধু। তিনি শ্রীশ্রীবাবার দর্শন প্রার্থনা করিলেন। আমি বাবাকে জানাইবা মাত্র উপরে লইয়া আসিতে আদেশ দিলেন। তিনি বাবার সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তার পর বিদায় লইয়া গেলে বাবা বলিলেন,

"ছেলেটি বেশ ছেলে।" নীচে নেমে এসে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথায় যাবেন?" তিনি বলিলেন, "শ্রীগুরুদেবের নিকট।" তিনি বৰ্দ্ধমানে শ্রীযুক্তা শক্তিবিবির বাড়ীতে থাকেন। আমিও বাবার নিকট যাইবার অনুমতি চাহিলে বাবা বলিলেন, "হাঁ যাও, দেখে এসো। মেয়েটি খুব ভাল মেয়ে।" সঙ্গে যাইয়া বন্ধুর গুরুদেব শ্রীজ্ঞানানন্দ পরমহংসকে (শ্রীশ্রীমায়ীজী) দর্শন ও প্রণাম করিয়া ফিরিলাম। পরদিন সকালে পূজনীয় দুর্গাদাদার বন্ধু-ভাবাপন্ন শ্রীযুক্ত দেবীপ্রকাশ কর্পূর আমার বন্ধুটি সহ আসিয়া শ্রীযুক্ত দুর্গাদাদাকে শ্রীশ্রীবাবার দর্শন প্রার্থনা করিয়া জানাইলে বাবা উত্তরে বলিলেন, "চল, নীচে যাইতেছি।" প্রণামের পর উভয়েই বলিলেন—"সূর্য্য-বিজ্ঞানে সৃষ্টি দেখিবার জন্য এসেছি—দয়া করে দেখান।" উত্তরে—"সিল্কের রুমাল এনেছ কি?" উত্তরে—"হাঁ বাবা, নূতন একটি ও ধোয়া একটি এনেছি।" উত্তরে—"যে কোনটি হইলেই চলিবে।" বলিয়া দোক্তার কৌটাটি হইতে দোক্তা ঢালিয়া দিয়া দেবীবাবুকে উহা জলে ধুইয়া পরে গঙ্গাজলে ধুইতে বলিলেন। পূজনীয় দাদা গঙ্গাজল আনিয়া দিলেন। পরে সিল্কের রুমালটি দিয়া ঢাকনি সহ কৌটাটিকে ঢাকিয়া শ্রীশ্রীবাবা দেবীবাবুর হাতে দিয়া লেন্স দিয়া ফোকাস্ করিয়া (রশ্মিপাত) দিলেন— দুইবার দেওয়ার পর ভারী লাগে নাই। বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে—"কই বাবা বুঝছি না।" পরে বলিলেন, "হাঁ, ঠিক হয়েছে।" কৌটা খুলিয়া দেখা হইল, দেওঘরের পেড়ার পাক সন্দেশ। সকলে সামান্য সামান্য খাইলেন। দেবীবাবু বাকীটুকু বাড়ী লইয়া গেলেন।

শ্রীশ্রীগুরুদেবের পুত্র শ্রীযুক্ত দুর্গাদাদাও যে শক্তিলাভ করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ আমার নিকট তিন চারি বার প্রকাশ পাইয়াছিল। তারই মধ্যে একটি না দিয়া শান্তি পাইতেছি না।

তখন আমি ইছাপুর গ্রামে, ইহা অণ্ডাল হইতে চার পাঁচ মাইল দূর, মধ্যে একটা জোড় 'তামলার জোড়' নামে খ্যাত। শ্রাবণ মাস—একাদিক্রমে এগার দিন মুষলধারে বৃষ্টি, বিরাম নাই। আমার বড় ছেলে মদনও শ্রীশ্রীবাবার শিষ্য। নয় দিন জ্বর, ছাড়ে নাই—কোনও লোক দ্বারা সংবাদ দিতেও পারে নাই। আমার সম্পর্কীয় ভাগিনেয়ের সঙ্গে দেখা হইলে তাহাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের তামলা ব্রীজে পার হইয়া বেনাচিতি ভিড়েঙ্গী ঘুরিয়া এগার বারো মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আমার নিকট পাঠাইল। সেই সবে মাত্র চার পাঁচ মাস নিশ্চিন্ত দিন কাটাইবার পর দশ পাঁচটি ডাক পাইতেছি। এমন সময় এই সংবাদ। পরদিনের বারটা পর্য্যন্ত সব রোগীদের ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া আহারাদির পর বাহির হইলাম। উভয়ে সাঁতার দিতে জানিতাম এবং জোড়ের বানের বেশ অভিজ্ঞতা ছিল বলিয়া উভয়েই গামছা পরিয়া ইন্‌জেক্‌সনের ছোট বাক্সটি কাপড়-জামাসহ পোঁটলা করিয়া লইলাম। ভীষণ বান। "জয়গুরু" বলিয়া নামিয়া যেটুকু প্রকৃত স্রোত তাহা সাঁতার দিয়া—অবশ্য ঔষধ ইন্‌জেক্‌সনাদি মাথায় পাগড়ী দ্বারা আটকাইয়া—পার হইলাম, এবং এক মাইল এক কোমর জলে জলে আসিয়া গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে উঠিয়া কাপড় পরিয়া ভদ্রবেশে উভয়েই বাড়ী পঁহুছিলাম। বেশ ভাল ভাবে পরীক্ষার পর বুঝিলাম টাইফয়েড

ফিবার। কাহাকেও না ডাকিয়া নিজেই "জয়গুরু" বলিয়া চিকিৎসা সুরু করিয়া দিলাম। পরদিন সকালে ঔষধ দিয়া আহারাদির পর ইছাপুর ফিরিলাম। এইভাবে রোজ চলিতে লাগিল। কুড়ি দিনের রাত্রে বিশেষ চিন্তান্বিত হইয়া রাত্রি দেড়টার সময় শুইয়া ভাবিতে ভাবিতে ঘুম আসিল। রাত্রি আড়াইটার সময় শ্রীশ্রীদাদা আমার শিয়রে আহ্নিকের আসনের উপরে কাপড়টিতে বসিয়া আমার বাম বাহুতে জোরে টিপিয়া মনীদা মনীদা বলিয়া ডাকিলেন। টিপুনীর বেদনায় উঠিয়াই দেখি, দাদা বসিয়া আছেন—কামিজের উপর কোট একটি, বুক পকেটে "রাজা" কলমটি। অমনি প্রণাম করিলাম, পদস্পর্শ করিলাম। শ্রীশ্রীদাদা বলিলেন, "কি মনীদা, তুমি না ডাক্তার? এত কাতর হয়েছ?"

আমি—কি বলেন দাদা, চার পাঁচ মাস ত এক প্রকার বসেই। এই বিরাট সংসার, সবে মাত্র ডাক আরম্ভ হয়েছে, ছেলের হলো টাইফয়েড, কোন দিক্ রাখি।

শ্রীদাদা— ভাবিস্ না, আমি পশ্চিমে চিঠি লিখে দিচ্ছি।

বলিয়া পকেট হইতে কলম ও পোষ্টকার্ড বাহির করিয়া লিখিলেন এবং বলিলেন, "আমিই ডাকে ফেলিয়া দিব।"

আমি—সে ত হলো দাদা, এইভাবে আর কদিন আনাগোনা করতে পারি? তার উপর রাত্রি জাগরণ।

শ্রীদাদা—আজই জ্বর ছেড়ে যাবে। তবে দুই চার দিন যাবে আসবে। সেরে যাবে, চিন্তা করো না।

আমি—তাই হোক্—আপনার ইচ্ছায় যা মঙ্গল আছে।

শ্রীদাদা—তবে আসি, ভেবো না আজই জ্বর ছাড়বে। আমি প্রণাম করিলাম। শ্রীদাদা সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন। আমি পুনরায় নিশ্চিন্ত মনে ঘড়ি দেখিয়া ঘুমাইলাম। সকাল ছয়টায় উঠিয়াই মদনকে দেখিলাম, থার্ম্মোমিটার দিলাম। একি! দেখি একশত আড়াই, অন্য দিন থাকে একশত দেড় ডিগ্রি। পুকুরের দিকে ভাবতে ভাবতে গেলাম—একি স্বপ্ন দেখলাম? যদি তাই হয় বাহুতে টিপুনীর বেদনা এখনও কেন রয়েছে—যাক্, শৌচাদির পরে আসিয়া আহ্নিক করিতে বসিলাম, কিন্তু আহ্নিক ঠিক হইল না—স্বপ্ন না সত্য ইহাই বিচার চলিল। জপও চলে, আঙ্গুলও চলে। আন্দাজ সাতটা পনের মিনিটে উঠিয়া পুনরায় আসিয়া থার্ম্মেমিটার দিলাম, দেখিলাম সাড়ে নিরানব্বই। মদন বলিল, "বেশ ঘাম হইতেছে।" বসিয়া চা খাওয়ার পর দেখি সাড়ে সাতানব্বই। জামা, কাপড়, বিছানা নূতন দিলাম; আনন্দে মদনের কাছে রাত্রে শ্রীদাদার আগমন ও কথাবার্ত্তা প্রকাশ করিলাম। সে বলিল, "তবে আপনি ঔষধ দিয়া চলিয়া যান, দুই তিন দিন আসিবার দরকার নাই।" চব্বিশ দিনে জ্বর আর আসে নাই, অবশ্য আরও দুইদিন আসিতে হয়েছিল মনের দুর্ব্বলতায়। এরূপ দুর্দ্দিনে দাদা আমাকে মাঝে মাঝে বল দিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবা বর্দ্ধমানে থাকাকালীন আমার ছোট ছেলে দীক্ষা প্রার্থনা করায় শ্রীদাদা তাহাকে দীক্ষা দেন, অবশ্য বাবার ইচ্ছানুসারে। আমিও বাবার মুখে শুনিয়াছি দুর্গাদাদা বেশ খাটিতেন এবং দাদাও বলতেন "বাবাও আস্তে আস্তে আমাকে যা দিবার দিতেছেন।" ইহাও শ্রীগুরুস্মৃতি –"গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু"—বচন না মানিয়া পারি না।

দিব্য-পুরুষ শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ

শ্রীসুবোধচন্দ্র রক্ষিত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৩)

"* * * বাহ্যিক ভাবের ভিতরে টলিয়া না পড়িয়া সর্ব্বদাই মাকে স্পর্শ করিতে সক্ষম হও—তাহা হইলেই সব হইবে * *"

—শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ

সুখ, দুঃখ ও অভাব—ইহা লইয়াই ত' মনুষ্য-জীবন। প্রকৃত পক্ষে, মানব-জীবন দুঃখেরই সমষ্টি। "Life is a sentence of sorrow, with punctuations of happiness." কিন্তু এই মানব-জীবনে কেন এত দুঃখ? এই দুঃখকে কেমন করিয়া তিরোভূত করা যায়? এই চিরন্তনী সমস্যার মীমাংসা এখনও হয় নাই; তবে বিভিন্ন দার্শনিকগণের বিভিন্ন মতবাদ এই বিষয়ে দেখিতে পাওয়া যায়। সকলেরই একমত যে, যতক্ষণ শরীর আছে, দুঃখ অবশ্যই থাকিবে। শরীরই দুঃখের কারণ; অতএব, দুঃখের প্রকৃত অবসান সাধন করিতে হইলে, উহার কারণ শরীর-ধারণ বা পুনর্জ্জন্মের আত্যন্তিক নিবৃত্তি-সাধন অগ্রে প্রয়োজন। প্রবৃত্তিই (আসক্তি) জন্মের হেতু, সুতরাং প্রবৃত্তি নাশেই জন্ম-নিবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী। জীবের ভোগ-বাসনাই বন্ধন ও দুঃখের

কারণ, এবং উহার বিনাশ-সাধনই মোক্ষলাভের উপায় স্বরূপ। শরীর ত' একদিন নষ্ট হইয়াই যাইবে; তবে, এই বন্ধন ও মোক্ষ শরীরের না মনের? সূক্ষ্মদেহই মনের আধার, কিন্তু মনের কার্য্যের (function) প্রকাশ হয় স্থূলদেহে। দেহের সহিত তাহার ছায়া যেরূপ সদাই যুক্ত থাকে, মনের সহিত অভাব-বোধ ও বিষয়াসক্তি সেইরূপ নিয়তই বিদ্যমান। সেইজন্য মনই মানবগণের বন্ধন ও মুক্তির কারণ; মনই আমাদের পরম শত্রু বা মিত্র।

"মনঃ করোতি কর্ম্মাণি মনো লিপ্যতে পাতকৈঃ।
মনশ্চ তন্মনো ভূত্বা ন পুণ্যৈঃ ন চ পাতকৈঃ।"

জলের ন্যায় মনের স্বাভাবিক নিম্নগতির (বৃত্তি) কারণ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীবাবা বলেন—"* * * জীবের নীচ-ভাব সকল মাধ্যাকর্ষণ হইতে ফুটিয়া উঠে। স্থূল বায়ু-মণ্ডল পর্য্যন্ত, অর্থাৎ যতদূর পর্য্যন্ত মাধ্যাকর্ষণের ক্রিয়া বর্ত্তমান আছে, পার্থিব বাসনা ও কামনাদির ছায়া ঘিরিয়া-রহিয়াছে। মৃত্যুর পরেও জীব এই সকল বাসনাতে জড়িত থাকে বলিয়া, মাধ্যাকর্ষণের আকর্ষণে অধোদিকে আকৃষ্ট হইয়া বাসনানুরূপ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। স্থূল-বায়ুর সীমা লঙ্ঘন করিয়া নির্ম্মল নভোরাজ্যে বিচরণ করিবার সামর্থ্য না হইলে, মৃত্যুকে জয় করিয়া জন্মের অতীত শুদ্ধ-দশা প্রাপ্ত হইবার আশা নাই।"

বিষয়-ভোগের জন্য পুনঃ পুনঃ সুখের প্রার্থনা মানব-জীবনের দুঃখের একটি কারণ। এইজন্য সুখ-কামী ব্যক্তি চির-দুঃখী। মনের নিগ্রহ বা দমনের দ্বারাই বন্ধন-মুক্তি সম্ভব

হয়। যোগ-সাধনই ইহার একমাত্র উপায়। শ্রীশ্রীবাবার কথায় ইহা "আত্ম-শোধন বা উপাদান-শুদ্ধি। এই আত্ম-শোধনের একমাত্র উপায় 'যোগ'। যোগ ভিন্ন কোন উপায়েই চিত্ত ও দেহের বিশুদ্ধি সম্পন্ন হয় না। লিঙ্গের (মনঃ বা বাসনাযুক্ত মনঃ) সহিত শুদ্ধ-আত্মা বা সূক্ষ্ম-তত্ত্বের (চৈতন্য, আত্মা বা পরমাত্মা) সংঘর্ষই 'যোগ'। স্থূলের সহিত লিঙ্গের তীব্র সংঘর্ষ না হইলে, উহার অন্তর্নিহিত চৈতন্যরূপ অগ্নি প্রজ্বলিত হয় না, আর উহা প্রজ্বলিত না হইলে স্থূলের নিবৃত্তি হয় না।" আসক্তি নাশ না হইলে, বনে গিয়া বাস করিলেও দোষ উৎপন্ন হয়। বাবার যোগ-প্রক্রিয়ার সহিত সাধারণ প্রচলিত পন্থার বিশেষ পার্থক্য বর্ত্তমান। মনুষ্য-জীবনে সকল উপায়ের মধ্যে যোগ-মার্গকেই বাবা শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছেন। এই জগতে যে যাহা চায়, সে তাহার বেশী প্রাপ্ত হয় না; কিন্তু, যিনি কোনও বস্তুরই আকাঙ্ক্ষা করেন না (নিরাসক্ত) তিনি প্রাপ্তব্য বস্তু পাইয়াই থাকেন, এবং সর্ব্বশেষে সত্য ও পরমানন্দ স্বরূপ পরম বস্তুরও আস্বাদন লাভ করেন। ইহাই যোগি-জীবনের একটি রহস্যময় ব্যাপার!

দিব্য-পুরুষ শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দের আবির্ভাব আমাদিগকে দিব্য-জীবন ও জন্ম-নিবৃত্তির যথার্থ পথ দেখাইয়া দিবার জন্য! অতি সুস্পষ্টভাবেই তিনি ঐ মার্গ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীভৃগুরাম পরমহংসদেবও তাঁহার এক পত্রে শ্রীশ্রীবাবাকে লিখিয়াছিলেন—"* * * সংসারে সব আশ্চর্য্য। শান্তি কেউ চায় না। আমার উদ্দেশ্য মহাপাতকদিগকে উদ্ধার

করিব ; তাতেই পাপীদিগকে স্বর্গ-সুখ দিবার জন্য তোমায় শিষ্য করিতে বলা। করি এক, সবে করে এক।" আমাদের মধ্যে তিনি যে ধারা সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন উহা যেন উপযুক্ত আধারের অভাবে প্রতিহত না হয়। সাধনা ব্যতিরেকে সিদ্ধি হয় না। বাবা বলেন—"* * * তীব্র পুরুষকার দ্বারা প্রাক্তন কর্ম্মও খণ্ডন করা যায় ; বিধির বিধান উল্টান যায়। তবে, 'পুরুষকার' ও 'কৃপা' পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া থাকে। শুধু কৃপা হইলেই ত ইষ্টসিদ্ধি হয় না, যদি না তাহার সহিত পুরুষকারের যোগ থাকে। তীব্র পুরুষকার থাকিলে, আবশ্যক কৃপা আপনিই জাগে—আশ্রয় গ্রহণ আপনিই হইয়া যায়। * * জীবের প্রসুপ্ত শক্তিকে জাগাইবার জন্যই 'ক্রিয়া' বা পুরুষকারের প্রয়োজন। জড়ের অন্তরালে এই চিৎ-শক্তি রহিয়াছে। * * শক্তির আরাধনা ভিন্ন শক্তিলাভ হয় না। সেই মহাশক্তির আরাধনা কর, নিজকে শক্তিময় কর, তেজোময় কর। পরমাত্মা কৃপা করিবার জন্য গুরুশক্তি রূপে নামিয়া আসিয়া, জীবের কাছে ধরা দেন, তাহাকে আকর্ষণ করেন, উঠাইয়া লইয়া যান। তিনি যদি না নামিতেন, তাহা হইলে জীব কদাপি আত্মোদ্ধারের পথ চিনিতে পারিত না" * * * কিন্তু, "নির্ভর করিতে শিক্ষা কর ; নির্ভর ভিন্ন জীবের গতি নাই। 'ক্রিয়া' কর, 'ক্রিয়া' কর—তাহাতেই 'নির্ভর' আসিবে।" শ্রীশ্রীভৃগুরাম পরমহংসদেবও ঐ কথাই বলিয়াছেন—"* * * গুরুদেবের নামই একমাত্র আশ্রয় ; গুরুদেবকে সমস্ত নির্ভর, ইহাই কর্ম্ম।" এই নির্ভরশীলতা বা আত্ম-সমর্পণই সাধনার চরম অধ্যায়।

মহাশক্তির সাধনাকেই বাবা শ্রেষ্ঠ তপস্যা মনে করেন। সেইজন্য তিনি প্রকৃত "কর্ম্মীর" নিকট সদাই জাগরূক বা প্রকাশমান। "প্রকৃত যোগীর স্থূল শরীর, লিঙ্গ শরীর এবং কারণ-শরীর চিন্ময় সিদ্ধ-শরীর রূপে পরিণত হয়। সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার সহিত সদাই যোগ-যুক্ত থাকেন বলিয়া, ইচ্ছামাত্রই মুহূর্ত্ত মধ্যে তিনি আবির্ভূত হইতে পারেন"—এই কারণেই ঐ দিব্য-পুরুষের নিত্য-লীলা আজও আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি।

তিনি আমাদের আশ্রয় দিয়াছেন; অর্থাৎ জীবনের সমস্ত দায়িত্ব নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। একবার তিনি আমাদের বলিয়াছিলেন—"যাকে যেমন অবস্থায় ফেলিয়া তৈয়ারী করিতে হয়, তাহাকে ঠিক সেই অবস্থাতেই ফেলিতেছি। মনে রাখিও, তোমাদের কল্যাণের জন্য যতখানি দেওয়া দরকার, তাহা আমি দিতেছি ও করিতেছি।" এই প্রসঙ্গে তাঁহাকে আমরা বলিতে শুনিয়াছিলাম যে তাঁহার সাক্ষাতে এক যোগী কোনও কুষ্ঠ-ব্যাধিগ্রস্ত রোগীকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন—'আমি আশীর্ব্বাদ করি—তোমার এই দারুণ ব্যাধি আরও কিছুকাল তোমাকে আশ্রয় করিয়া থাকুক।'

অভাব বা দুঃখ-নিবৃত্তি মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য বস্তু। কিন্তু দুঃখ-বোধ না থাকিলে দুঃখের নিবৃত্তির জন্য কেহ চেষ্টা করে না; বন্ধনের জ্বালা অনুভব না করিলে, কেহ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের ইচ্ছাই করে না। তীব্র দুঃখ ও অভাবের তাড়নার মধ্য দিয়াই মনুষ্য-হৃদয়ে জন্ম-নিবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক ভাবে জাগিয়া উঠে ও পরমাত্মার প্রতি তাহার চিত্ত উন্মুখ হয় এবং

মোক্ষ বা মুক্তিলাভের জন্য মনে ব্যাকুলতা জন্মে। বাবা বলিয়াছেন—"* * * এই অশান্তির মূলে যে একটি গভীর অভাব রহিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। দীনের ঐশ্বর্য্য-লালসা, বদ্ধের মুক্তি-কামনা, রূপানুরাগীর রূপ-তৃষ্ণা, কামুকের কাম-পিপাসা, জিজ্ঞাসুর জ্ঞানলিপ্সা—যাহার যে আকাঙ্ক্ষাই থাকুক, সেই এক আকাঙ্ক্ষারই নামান্তর। * * মনুষ্য-জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য স্ব-ভাবের উপলব্ধি। জীব স্ব-ভাব হইতে চ্যুত হইয়াই দুঃখের কূপে নিপতিত হইয়াছে। পুনরায় সাধনা প্রভৃতির দ্বারা স্ব-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে, তাহার যাবতীয় অভাব মিটিয়া যাইবে। * * স্থূল ভাবের নির্মোক হইতে মুক্ত হওয়াই 'মুক্তি'। স্থূলের সঙ্গ হইতে প্রিয়াপ্রিয় বোধ জাগে, অথবা সুখ-দুঃখ রূপ দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হয়।"

(৪)

তোমায় দেখি যখন
তখন কেবল এই মনে হয়
দেখ্‌ছি যারে, সে তুমি নয়
তোমার আবরণ!

দেহের নিভা দীপে
আবার কিগো অচল শিখা
কাজল-পটে লিখবে রক্ত টিপে!

চিন্ময় রূপই ঐ দিব্য-পুরুষের যথার্থ স্ব-রূপ। তিনি এখন প্রকৃত স্বরূপেই অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার এই চৈতন্য-রূপের পূজা না করিলে, আমাদের ভিতরকার চিৎ-শক্তিকে কখনই জাগাইতে পারিব না—তাঁহাকে ধরিবার সকল প্রয়াসই ব্যর্থ হইবে। একটি জ্বলন্ত অগ্নি-শিখার স্পর্শে যেমন সহস্র প্রদীপ প্রজ্বলিত হইতে পারে, সেইরূপ আমাদেরও প্রসুপ্ত-অগ্নি তাঁহার

দিব্য-শিখার স্পর্শে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে ! মানুষ তাহার স্বাভাবিক অবস্থায় জড়-প্রকৃতি ভাবাপন্ন। স্থূলের মধ্যে তাহার চিত্ত অনুক্ষণ লিপ্ত থাকে বলিয়া, সূক্ষ্ম-সত্তা বা শুদ্ধ-চৈতন্যের আভাস মাত্রও সে সহজে লাভ করিতে সক্ষম হয় না। বাবা ত' বলিয়াছেন—"* * * সংঘর্ষ ভিন্ন এই স্থূল নাশের দ্বিতীয় কোনও উপায় নাই। * * জড়কে ধরিয়াই, জড়কে ছাড়াইয়া চৈতন্যে উপস্থিত হইতে হইবে।"

তাঁহার স্থূলদেহের বর্ত্তমান অবস্থায়, তাঁহার যে অসংখ্য লীলার দর্শন আমরা লাভ করিয়াছি, উহার অবসানাবস্থাতেও তাঁহার সেই সদা-জাগ্রত চিৎ-শক্তির লীলার প্রকাশ এখনও চলিতেছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহার দেহোত্তর কালের মাত্র কয়েকটি মুখ্য ঘটনা প্রকাশ করিয়া তাঁহার রহস্যময় লীলা-প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিব। মহাপুরুষের সম্পূর্ণ জীবন-কথা আলোচনা করা অসম্ভব, যেহেতু উহার বিরাট্ তত্ত্ব ও গুহ্য রহস্য বহির্জগতে কখনও প্রকাশ পায় না।

শ্রীশ্রীবাবার দেহ রক্ষার ঠিক তিন চারি দিন পরের কথা। আমার এক বিশেষ আত্মীয়া সুদূর নৈনিতাল জেলার একস্থানে তখন কিছুদিন যাবৎ অবস্থান করিতেছিলেন। বাবার সংস্পর্শে আসিয়া এই মহিলার তাঁহার উপর প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, কিন্তু তিনি শিষ্যা ছিলেন না। যে বাড়ীতে তিনি থাকিতেন, তথায় ভূতের অত্যন্ত উপদ্রব ছিল ; এই বাসস্থান ঠিক করিবার পূর্ব্বে ইহা জানা ছিল না। বাবার কলিকাতায় দেহরক্ষার তিন চারি দিন পরে দিনের বেলাতে স্বপ্নে তিনি বাবার দর্শন লাভ করেন। বাবা যেন সম্মুখে উপস্থিত হইয়া হাসিতে

হাসিতে বলিলেন—'আমি ত' এইবার চলিলাম ; তুমি আর কখনও আমাকে স্থূলে দেখিতে পাইবে না। *** ভূতের উপদ্রব আর থাকিবে না ; তবে তোমার বিছানার নিকট আমার ঐ ছবিখানি সর্ব্বদা রাখিয়া দিবে। ......লাউ খাওয়া তোমার পক্ষে খুব হিতকর'—এইরূপ বলিয়া তিনি ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইলেন। বিষাদপূর্ণ এই স্বপ্ন-দর্শনে অত্যন্ত ব্যথিতা হইয়া আত্মীয়াটি চারি পাঁচ দিনের মধ্যেই আমার নিকট উপরোক্ত মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিলেন । বিরহাগ্নিতে তখনও আমাদের হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল। ঐ পত্র পাইয়া আমি অভিভূত হইয়া পড়িলাম।

এই ঘটনার পাঁচ ছয় মাস পরে, আমি উপরোক্ত আত্মীয়ার সেই বাসাতেই গিয়া কিছুদিন অবস্থান করি। শুনিলাম, তিনি ভূতের উপদ্রব সেই বাড়ীতে আর দেখিতে পান নাই, যদিও পার্শ্ববর্ত্তী গৃহের লোকেরা তাহাদের বাড়ীতে উহা দেখিতে পায়।

নির্জ্জনে একাকী বেড়ান আমার অভ্যাস । দিনের বেলায় একদিন ঘুরিতে ঘুরিতে একটি জঙ্গলের ধারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। হঠাৎ দেখিতে পাই যে একটি বেশ বড় নেকড়ে-বাঘ পাহাড়ের উপর হইতে আমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। আমার নিকট একটি ছাতা ভিন্ন আত্ম-রক্ষার জন্য কিছুই ছিল না। অপ্রত্যাশিত ভাবে ঐ বাঘটিকে দেখিয়া আমি আমার অন্তিম সময়ের কথা ভাবিতে লাগিলাম—তখন শ্রীগুরুদেবের নাম স্মরণ ছাড়া অন্য কোনও উপায় ছিল না ; ভয়ে বিহ্বল হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। বাঘটি ছুটিয়া আমার নিকট হইতে পাঁচ

ছয় গজ দূরে নামিয়া গেল এবং বিকট ভঙ্গীতে গর্জ্জন করিতে করিতে পথের অপর পার্শ্বে ধীরে ধীরে জঙ্গলের মধ্যে চলিয়া গেল। বিমূঢ়চিত্তে আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম—কেনই বা প্রভু আমাকে রক্ষা করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবার দেহ-রক্ষার আট মাস পরেই আমার পিতৃ-বিয়োগ হয়। উপর্য্যুপরি এই দারুণ আঘাতে মুহ্যমান হইয়া কাশী পরিত্যাগ করাই শান্তিপ্রদ মনে হইল এবং রাঁচিতে থাকিয়া বিষয়-কর্ম্মে লিপ্ত থাকাই শ্রেয় মনে করিলাম। এইস্থানে কিছুদিন পরে একটি দোকানও খুলিয়া বসিলাম। এখানে প্রায় দুই বৎসর অবস্থান করিয়াছিলাম। কাশীর বাটী বিক্রয় করিয়া, তথায় এক-খানি বাটী নির্ম্মাণ করিবার মনস্থ করিলাম। পাঁচশত টাকা বায়না জমা দিয়া একখানি জমী কিনিবার সমস্ত ব্যবস্থা প্রায় পাকা হইয়া গিয়াছিল। বায়নার দলিল রেজিষ্ট্রি হইবার ঠিক পূর্ব্বদিন সেখানে এমন একটি পারিবারিক ঘটনা হইল যাহার ফলে কিছুদিন পরেই কাশীতে পুনরায় ফিরিয়া আসিবার সঙ্কল্প করিলাম। আমার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে এই ঘটনাটি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে, যেহেতু ইহার দ্বারা আমাদের ভবিষ্যতের জীবন-ধারা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিল। কাশী পরিত্যাগ করিয়া রাঁচিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করিলে, আমাদের দুঃখের পরিসীমা থাকিত না—ইহা পরে হৃদয়ঙ্গম হইল। "তাঁহার করুণা, কোন্ পথ দিয়া কোথা নিয়া যায় কাহারে ?"

রাঁচিতে দীর্ঘকাল অবস্থান করায়, সেখানে আমার আবশ্যকীয় পুস্তকাদি ও নিত্য-সহচর দৈনন্দিন-লিপি পুস্তকখানিও (Diary)

লইয়া গিয়াছিলাম ; উহার মধ্যে শ্রীশ্রীগুরুদেব সংক্রান্ত যে সকল কথা আমি মধ্যে মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম, উহা পাঠ করিতাম এবং সেখানে গিয়াও উহার মধ্যে অনেক কথা লিখিয়াছিলাম। উক্ত ঘটনার কয়েক মাস পরেই রাঁচির বাস উঠাইয়া দিয়া কাশীতে ফিরিয়া আসিলাম। বহু জিনিষ-পত্র ছিল, সেইজন্য মাল-গাড়ীতে অনেকগুলি পাঠাইতে হইয়াছিল। মাল-বাক্সগুলি যখন বাড়ীতে খুলিলাম, দেখি যে একটির মধ্য হইতে বহু দ্রব্য পথে চুরি হইয়া গিয়াছে। উহার মধ্যে অন্যান্য পুস্তকাদির সহিত আমার সেই ডায়েরীখানিও ছিল। কয়েকটি মূল্যবান্ দ্রব্য, কিছু পুস্তক ও এই ডায়েরীখানিও ঐ বাক্সের মধ্যে বা অন্য কোথাও পাওয়া গেল না। মাল-বাক্সের পেরেক খুলিয়া ঐগুলি পথিমধ্যে চুরি হইয়াছিল। ডায়েরীখানি চুরি হওয়াতে আমার মনে প্রচণ্ড আঘাত লাগিল ; মনে হইল যেন গুরুদেবকে এই দ্বিতীয়বার জীবনে হারাইলাম! দুঃখ ও বেদনায় কাতর হইয়া কতদিন তাঁহার চরণে অশ্রুপাত করিয়াছি ও কতই না অনুযোগ জানাইয়াছি! ঐ লিপি-পুস্তকের মধ্যে যে সকল কথা লিখা ছিল, উহা পাঠ করিলে মনে হইত—যেন তিনি আমার সম্মুখে বসিয়া কথা বলিতেছেন। এই প্রবন্ধের প্রথম স্তবকের সমস্ত বিষয়গুলি ঐ খাতায় লিপিবদ্ধ ছিল। রাঁচিতে যাইবার সময় আমি দুই তিনটি বাক্স আমার মাতাঠাকুরাণীর নিকট কাশীর বাড়ীতে রাখিয়া গিয়াছিলাম। এখানে ফিরিয়া আসিবার কিছুদিন পরে এই বাক্সগুলি খুলিবার বিশেষ প্রয়োজন হইল। ইহাদের মধ্যে একটি বাক্স খুলিবামাত্রই

স্তম্ভিত হইয়া দেখিলাম যে আমার সেই হারান-নিধি দৈনন্দিন-লিপি পুস্তকখানি ঠিক উপরের স্তরেই রহিয়াছে। বহুকাল পরে নিরুদ্দিষ্ট পুত্র যদি অপ্রত্যাশিত ভাবে জননীর সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে মাতার হৃদয়ে যে ভাবের উদয় হয়, আমারও ঠিক সেইরূপ অবস্থা হইল। পুলকে আমার চিত্ত ভরিয়া উঠিল। বাবার অসীম করুণা ও এই অসম্ভাব্য লীলা দেখিয়া আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম ও বাড়ীর সকলে এই ঘটনা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল!

রাঁচীর ব্যবসায় তুলিয়া দিয়া কাশীতে ফিরিয়া আসিবার পর, কাজ-কর্ম্মের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু কোথাও স্থিরভাবে থাকিতে পারিলাম না। অবশেষে পাঁচ হাজার টাকা জমা রাখিয়া একটি লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ব্যাঙ্কের কোষাধ্যক্ষের কার্য্য মিলিল। এই কর্ম্মে পূর্ব্বে কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না। এক বৎসর এই স্থানে থাকিবার পর, অন্য আর একটি ব্যাঙ্কে অতি অপ্রত্যাশিত ভাবেই উপরোক্ত কর্ম্মে পুনরায় বহাল হইলাম। এই অফিসে যোগ দিবার তিন মাস পরেই, প্রথম প্রতিষ্ঠানটি হঠাৎ দেউলিয়া হইল। ইহার এক মাস পূর্ব্বেই আমি আমার সমস্ত অর্থ ফেরত পাইয়াছিলাম—নচেৎ আমার সমস্ত অর্থ ডুবিয়া যাইত ও আমি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যাইতাম। পরম করুণাময় গুরুদেব ভিন্ন কে আমাকে ঐ দারুণ বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন?

প্রায় দশ বৎসর পর্য্যন্ত কোষাধ্যক্ষের কর্ম্ম করিয়াছিলাম। এই প্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত বৃহৎ হইলেও আমাকে একাকীই দৈনিক বহু সহস্র টাকার লেন-দেন করিতে হইত; সহকারী কেহই ছিল

না। প্রত্যহ কর্ম্মের চাপ এত অধিক থাকিত যে আমি অত্যন্ত বিব্রত বোধ করিতাম। মধ্যে মধ্যে গ্রাহকগণকে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান (payment) করিয়া ফেলিতাম। অত্যন্ত কাজের চাপের সময় একবার একজনকে এক হাজার টাকার অধিক দিয়া ফেলিয়াছিলাম; অল্প টাকার ত' কথাই ছিল না। গুরুদেবের অসীম কৃপাবশতঃ প্রত্যেকবারই আমি ঐ অর্থ ফেরৎ পাইতাম এবং অনুগ্রহকারিগণকে মধ্যে মধ্যে অর্থ-পুরস্কারও দিতে হইত।

একদিন কাশীর আশ্রমে গিয়া শ্রীশ্রীবাবার লীলা-প্রসঙ্গ বিষয়ক সদ্যঃ-প্রকাশিত একখানি গ্রন্থ দেখিতে পাইলাম। পুস্তকখানির মধ্যে এত সুন্দরভাবে বাস্তব ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে উহার কয়েক পৃষ্ঠা মাত্র পাঠ করিয়াই আমি মুগ্ধ হইলাম এবং উহার একখণ্ড কিনিতে অত্যন্ত আগ্রহ হইল। কিন্তু এই পুস্তকের মধ্যে যে সকল ছবি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, উহাদের মধ্যে বিশেষ করিয়া একখানির স্থান দেখিয়া আমি অন্তরে অত্যন্ত ব্যথা অনুভব করিলাম। সূর্য্যের প্রখর রশ্মির মধ্যে খদ্যোতিকার দীপ্তি প্রকাশের চেষ্টা যেরূপ অকিঞ্চিৎকর মনে হয়, ঐ ছবিখানিও সেইরূপ মনে হইতে লাগিল। একজন অলোকসামান্য মহাপুরুষের পার্শ্বে উহার স্থান আমার মনে অসহ্য জ্বালা উৎপাদন করিল। ভাবিলাম পুস্তকখানি ক্রয় করিবার পর উক্ত ছবিখানি খুলিয়া ফেলিয়া দিব, অন্য উপায় দেখিলাম না। বিক্রয়ের জন্য আশ্রমে তখন মাত্র পাঁচখানি পুস্তক রক্ষিত ছিল এবং স্বাভাবিক ভাবে প্রত্যেকখানির মধ্যেই ঐ ছবিখানি দেখিতে পাইলাম। চারি পাঁচ দিন পরে পুস্তকখানি ক্রয় করিবার জন্য আশ্রমে গিয়া

একখানি লইলাম। যেখানি সর্ব্বপ্রথমে উঠাইয়া লইলাম, উহার মধ্যে সেই বিশেষ ছবিখানি খুঁজিতে লাগিলাম—পুস্তক হইতে উহা খুলিয়া বাহির করিয়া লইবার জন্য। অত্যন্ত আশ্চর্য্যের কথা এই যে, তিন চারিবার চেষ্টা করিয়াও ঐ পুস্তক মধ্যে ছবিখানি খুঁজিয়া পাইলাম না। ইহা দেখিয়া অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল এবং অপর চারিখানির পৃষ্ঠা খুলিয়া দেখিলাম যে আমার 'অবাঞ্ছিত' ছবিখানি সবগুলির মধ্যেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। বাবার করুণার বিষয় স্মরণ করিতে করিতে পুস্তকখানি গৃহে লইয়া আসিলাম।

এই সকল ঘটনার পর বহু বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও দৈনন্দিন-জীবনে শ্রীশ্রীবাবার দিব্য-পরশ যে কত ভাবে অনুভব ও প্রত্যক্ষ করিতেছি উহাদের সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া সম্ভবপর নহে। ঐ সদা-জাগ্রৎ চিন্ময়-শক্তি আমাদিগকে চিরদিনই যেন আকর্ষণ করিয়া সত্যের পথে লইয়া যায়!—জয় শ্রীগুরু!

দুইটি গান

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১)

(২৯শে ১৩৩৫ সালে শ্রীশ্রীবাবার শুভ জন্মোৎসবে গীত)

কে বলে রে ভারত দুখিনী ?
এমন ছেলে পেয়েছে যে, সে যে সকল দেশের রাণী।
ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম হয়েছে যাঁর অধীন,
তাঁর মাকে কে বা বলিতে পারে গো কাঙ্গালিনী দীন হীন,
সেই রাজমাতা অবনী পরে, সেই বীর-প্রসবিনী।
কত নরনারী সুপথে ছুটিছে আজ গো তাঁর কৃপায়,
তাহাদের তরে কত ক্লেশ বহিছেন এ ধরায়,
মূঢ়মতি মোরা বুঝিতে পারি না তাঁর লীলা তাঁর বাণী।
এস ভাই সবে নরেন্দ্রের সনে গাও তাঁর জয় গান,
ভারত গগনে এস সবে মিলি তুলি একতার তান,
নমি ঐ পদে স্মরি ঐ পদে আর কিছু নাহি জানি॥

(২)

(১৩ই মাঘ ১৩২৭ সালে গুরুদত্ত ক্রিয়া প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে)

আকুল পরাণে, কি জানি কি টানে
ধাবিত পাগল মন।
ফিরে নাহি চায় বাধা পাছে পায়
অনিমেষ দু' নয়ন,

পলকে হারাই, খুঁজে নাহি পাই,
সে যে মম হারাধন,—
পাইলে এবার ছাড়িব না আর
রাখিব ক'রে যতন।
এই মনে করি বুঝি ধরি ধরি,
জানি না সে যে কেমন,
আঁধারে মিশায় ধরা নাহি যায়
চপলা মেঘে যেমন।
পাবে যদি তাঁরে ম'জ না সংসারে,
সে নামে থাক মগন,
ছিঁড়ে যাবে পাশ থাকিবে না আশ,
সফল হবে জীবন।
গুরুদত্ত বাণী মহাসত্য জানি
নরেন্দ্র কর সাধন,
তাতে যদি হয় এ দেহের লয়
ভাবনা নাহি তখন।

———

তিন জন্ম বিচার

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট্

(১)

সকলেই জানেন যে শ্রীশ্রীগুরুদেব দীক্ষাপ্রার্থী লোককে দীক্ষা দিবার পূর্ব্বে তাহার প্রাক্তন তিন জন্মের সংস্কার বিচার করিয়া দীক্ষা দিতেন। সাধারণতঃ সাধন-সংস্কার ও প্রকৃতিগত ইষ্ট ভাবের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করিবার জন্য তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব তিন জন্মের সাধন সংস্কার বিচার করিয়া কোন্ দিকে চিত্তের প্রবণতা অধিক তাহা দেখিতেন এবং তাহারই আনুকূল্য করিবার জন্য ইষ্ট-নির্ণয় করিয়া তদনুসারে শক্তি সঞ্চার পূর্ব্বক দীক্ষা দিতেন। ইহাতে কৃত কর্ম্মের ধারার সহিত বর্ত্তমান কর্ম্মের ধারার সম্বন্ধ স্থাপিত হয় ও অপেক্ষাকৃত অল্প আয়াসে প্রকৃত পথের প্রাপ্তি ঘটে। এই সম্বন্ধে শিষ্যগণের ব্যক্তিগত অনুভূতি স্পষ্টই উল্লেখযোগ্য।

ইহা হইতে বুঝা যায় পূর্ব্বের তিন জন্মের সংস্কার সাপেক্ষ ভাবে পরিদর্শন করিয়া সাধন-জীবনের ধারাটি আবিষ্কার করিতে হয়। সাধনা ষোল আনা পূর্ণ হইলে একই পরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। যে মার্গে সাধকের অধিক পরিশ্রম হইয়া থাকে এবং তজ্জন্য সাধন-সংস্কার অধিক বর্ত্তমান থাকে সেই মার্গই বর্ত্তমানে উক্ত সাধকের পক্ষে অবলম্বনীয়। তাহা হইতে পরিশ্রমের অনেকটা লাঘব হয় এবং পূর্ব্ব জন্মের কৃত কর্ম্ম বর্ত্তমান

জন্মে ফলসিদ্ধির সহায়ক হয়। এ বিষয়ে কিছু কিছু বিবরণ "বিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ" দ্বিতীয় খণ্ড বা তত্ত্বকথাতে দেওয়া হইয়াছে।

কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহা একটি স্থূল ব্যাপার মাত্র। গত তিন জন্ম ত দূরের কথা, ঐ প্রকার সহস্র জন্ম বিচার করিলেও প্রকৃত পথের সন্ধান পাওয়া যাইবে না। ঐ তিন জন্ম বস্তুতঃ এক জন্মেরই ত্রিবিধ বিলাস মাত্র। স্থূল দেহ ধারণই স্থূল জগতে অর্থাৎ ভৌতিক স্তরে প্রবেশের চিহ্নস্বরূপ। স্থূল দেহ সর্ব্ব প্রথম কখন গ্রহণ করা হইয়াছিল ইহার ইতিহাস কেহ বলিতে পারে না। স্থূল দেহ জাত হয় এবং মৃত হয়—এই প্রকার জন্ম-মৃত্যু যে কতবার হইয়া গিয়াছে তাহারও সন্ধান কেহ জানে না। কালের জগতে নামিয়া আসা জন্ম-মৃত্যুর অধীন হওয়া, কিন্তু এই স্থূল দেহে প্রবেশ কোথা হইতে হইয়াছে তাহা জানা আবশ্যক। যদি সেই সন্ধান পাওয়া যায় তাহা হইলে সেখান হইতে আরও ঊর্দ্ধে উঠিয়া সন্ধান নিতে হইবে যে মৌলিক আবরণ সর্ব্বপ্রথম কোন্ সূত্রে শুদ্ধ-চৈতন্যকে গ্রাস করিয়া থাকে।

শ্রীশ্রীগুরুদেব তাঁহার "প্রকৃতি তত্ত্বে" বলিয়াছেন—"স্বভাবের ধারা ত্রিধা সৃষ্টি করা।" এই যে ত্রিবিধ সৃষ্টি ইহাই বস্তুতঃ আত্মার তিনটি জন্ম। এই তিনটি জন্মের বৃত্তান্ত নিপুণদৃষ্টিতে দেখিতে না পারিলে এই মায়িক জগৎ হইতে পরম স্থানে পৌঁছিবার ধারাটি খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। পরম পথকে আবিষ্কার করাই দীক্ষার উদ্দেশ্য। এই তিন জন্মের মধ্য দিয়াই, অর্থাৎ এই ত্রিবিধ স্তর ভেদ করিয়াই, এই পথটি প্রসারিত রহিয়াছে। কোনও সাধকের প্রকৃতি নির্ণয় করিতে হইলে তাহার মায়িক

দেহ, মহামায়িক দেহ এবং চিন্ময় দেহের প্রকৃতি অবগত হওয়া আবশ্যক।

বিশুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপতঃ নিরাকার ও নির্ম্মল চিদ্-বস্তু। যখন সৃষ্টিমুখে উহা কালের রাজ্যে আগত হয় তখন প্রকৃতির বিভিন্ন স্তর ভেদ করিয়া উহাকে আসিতে হয়। সর্ব্বপ্রথম চিৎ-স্বরূপ হইতে চিৎ-শক্তির যে সঙ্কুচিত উন্মেষ হয়—যাহাকে চিদণু বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে তাহা চিন্ময়ী শক্তির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে চিদাকার একটি স্বচ্ছ আবরণ তাহাতে যুক্ত হইয়া যায়। ইহা চিন্ময়ী শক্তির আবরণে আবৃত চিদণু। ইহাই অপরিচ্ছিন্ন বা পূর্ণ 'অহম্'এর প্রথম প্রতিবিম্ব। এই আবরণটি আত্মার প্রথম দেহ। এই দেহটি সাক্ষাদ্‌ভাবে কালের রাজ্যে আসে না। ইহা বিশুদ্ধ অচিৎ অথবা মহামায়ার গর্ভে প্রবিষ্ট হয়। মহামায়া নিজের উপাদান দ্বারা ইহাকে বেষ্টন করিয়া ইহার উপর দ্বিতীয় আবরণ সৃষ্টি করেন। ইহার পর চিন্ময় ও শুদ্ধ অচিন্ময় এই দ্বিবিধ আবরণবিশিষ্ট চিদণুটি মায়াগর্ভে প্রবেশ করে। মায়াগর্ভে প্রবেশের ফলে মায়িক উপাদান উহাকে বেষ্টন করিয়া থাকে। ইহাই ত্রিবিধ আবরণ। এই মায়িক আবরণ পর্য্যন্ত যে তিনটি আবরণের প্রাপ্তি তাহাই চিদণুর ত্রিবিধ দেহ রূপে বর্ণিত হইয়া থাকে। এক এক প্রকার আবরণ পাওয়াকে এক এক প্রকার জন্ম লাভ বলা চলে, সুতরাং তিন প্রকার আবরণ-প্রাপ্তি ফলতঃ ত্রিবিধ জন্মেরই দ্যোতক। মায়ার আবরণে আবৃত হইয়া জীব কালরাত্রির রাজ্যে উপনীত হয়। আমরা যে স্থূল দেহ দেখিতে পাই তাহা কালের দেহ। ইহা পরিণামশীল এবং ক্ষয়-

প্রধান। এই দেহ যতক্ষণ পর্য্যন্ত আরোহ-ক্রম ধরিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রকৃতির স্তরে উত্থিত হইতে না পারে ততক্ষণ পর্য্যন্ত জীব নিজের পরম স্বরূপে উপনীত হইতে পারে না।

কালের দেহ দীক্ষা জন্য সংস্কার প্রাপ্ত না হইলে এবং মূল স্থানে ফিরিবার পথ না পাইলে অসংখ্য বার কালের আবর্ত্তেই ঘুরিতে থাকে। এই আবর্ত্ত হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে ইহার পক্ষে ফিরিবার রাস্তাটি জানা আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে তিনটি পূর্ব্ব জন্মের প্রশ্ন যোগীর বিচার-পথে উপস্থিত হয়। কাল হইতে বাহির হইতে হইলেই সর্ব্ব প্রথম মায়িক দেহ ভেদ করা আবশ্যক। মায়িক দেহ ভিন্ন কালের রাজ্যে প্রবেশ হইতে পারে না। সুতরাং ফিরিবার সময় কালের রাজ্য হইতে মায়াগর্ভেই প্রথম প্রবেশ করিতে হয়। ইহাই বিপরীত গতি। যে প্রকার মায়িক উপাদানে সাধকের নিজ মায়াদেহ গঠিত তাহারই অনুরূপ পথ ধরিয়া তাহাকে মায়া হইতে নির্গম লাভ করিতে হইবে। কারণ সকলের পথ সকলের জন্য নহে। মায়া হইতে নির্গত হইয়া মায়াতীত অবস্থায় স্থিতি নিলে পরম স্থানে যাওয়া সম্ভবপর হয় না। সুতরাং মায়ার বাহিরে গিয়াও নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। তখন যে মহামায়ার গর্ভ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া মায়িক দেহ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল পুনর্ব্বার সেই মহামায়ার গর্ভে প্রবেশ করিতে হয়। তাহার পর মহামায়ার গর্ভ হইতে নির্গত হইয়া চিৎ-শক্তিতে প্রবেশ করিতে হয়। কারণ চিৎ-শক্তি হইতেই চিন্ময় আবরণে আবৃত হইয়া জীব মহামায়ার গর্ভে প্রবেশ করিয়াছিল। তাই ফিরিবার সময়

পুনর্ব্বার চিৎ-শক্তির গর্ভে প্রবেশ করিয়া ঐ স্থান হইতে নির্গত হওয়া আবশ্যক। তখন নিজের বিশুদ্ধ চিৎ-স্বরূপের প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

যতগুলি আবরণ জীব প্রাপ্ত হয় ততগুলি কর্ম্মের ভূমি তাহার রচিত হয়। অনাবৃত চিৎ-স্বরূপে কর্ম্মের কোন প্রশ্নই থাকে না। নামিবার সময় এক একটি আবরণ গ্রহণ করিতে হয়, পুনর্ব্বার ফিরিবার সময় ঐ আবরণকে কর্ম্ম দ্বারা কায়াতে পরিণত করিয়া চৈতন্যের সঙ্গে ঐ কায়ার অভেদ সম্পন্ন করিতে হয়। তদনুসারে আরোহ-ক্রমে সর্ব্বপ্রথম মায়িক দেহের কার্য্য হইয়া থাকে। শরীর কর্ম্মেরই জন্য। শরীরোপযোগী কর্ম্ম পূর্ণ না হইলে সেই শরীর-ধারণের সার্থকতা হয় না। মায়িক শরীরের কর্ম্ম পূর্ণ হইলে জীব মায়ার অতীত হয় এবং তাহার আত্মসত্তা জাগ্রদ্‌ভাবে মায়াকে অধিষ্ঠান করিয়া থাকে। ঐশ্বর্য্যের ইহাই প্রথম অঙ্গ। মহামায়ার শরীরে মহামায়ার আবরণ আছে বলিয়া তদনুরূপ কর্ম্মও আছে। ঐ কর্ম্ম পূর্ণ না করা পর্য্যন্ত মহামায়ার শরীর অনিবার্য্য। কিন্তু ঐ কর্ম্ম পূর্ণ হইলে মহামায়ার স্তরও ভেদ হইয়া যায়। তখন যোগী মহামায়া হইতে নির্গত হইয়া মহামায়ারও অধিষ্ঠাতা হইয়া থাকে। চরম অবস্থায় চিন্ময় শরীরেরও তদনুরূপ কর্ম্ম আছে। তাহা সম্পন্ন হইলে যোগী চিন্ময়ী শক্তির অতীত হইয়া চিন্ময়ী শক্তিকেও নিজ শক্তিরূপে ধারণ করিতে সমর্থ হয়। এই প্রকারে ত্রিবিধ শক্তিই তাহার নিজ শক্তিরূপে পরিণত হয়। জীব তিনটি আবরণ লইয়া আসে বলিয়া যোগ-মার্গে ফিরিবার সময় এই ত্রিশক্তির অধিপতি রূপে ত্রিকোণের মধ্যবিন্দুতে নিজ স্থান লাভ করে।

সদ্‌গুরু দীক্ষার সময় যখন পূর্ব্ব তিন জন্মের বিচার করেন তখন বাস্তবিক পক্ষে এই তিন জন্মেরই বিচার করিয়া থাকেন। কারণ চিন্ময় অখণ্ড সত্তা পর্য্যন্ত পথ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। শুধু কালরাজ্যের স্থূল উপাদানের তিনটি প্রাক্তন জন্ম বিচারের দ্বারা অখণ্ড চৈতন্য পর্য্যন্ত মধ্যবর্ত্তী বিশ্ব প্রকৃতির অন্তঃস্থিত দীক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ধারা নিরূপিত হইতে পারে না। প্রত্যেক প্রকৃতি হইতেই আকৃতির গঠন হয় এবং ঐ আকৃতি দ্বারা স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ কর্ম্মের নির্দ্দেশ হইয়া থাকে। দীক্ষাকালে দীক্ষার্থী গুরুদত্ত কায়া প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঐ কায়াতে দীক্ষার্থীর মায়িক, মহামায়িক এবং চিন্ময় কায়া অবিভক্ত ভাবে নিহিত থাকে। কর্ম্ম-সাধন যথানিয়মে সম্পন্ন হইলে ঐ সকল আকৃতি ও প্রকৃতির কার্য্য সমাহিত হয়। তখন নিজ ধামে স্থিতি লাভের যোগ্যতা জন্মে। স্থূল ভাবে তিন জন্মের বিচার সাধারণ অবস্থায় উপযোগী তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু চরম মীমাংসা উহা হইতে পাওয়া যায় না। তিন জন্মের সূক্ষ্ম রহস্য সাধকের বোধগম্য হইতে পারে না বলিয়া তিনি সাধারণতঃ স্থূল ভাবেই ব্যাখা করিতেন। বস্তুতঃ এই রহস্য বুঝিতে পারিলে জন্মান্তর তত্ত্ব বুঝিবার পথ সুগম হয়।

———

শ্রীগুরুর কৃপা-স্মৃতি

শ্রীজীবনধন গাঙ্গুলী

আমি শ্রীশ্রীগুরুদেবের একজন নগণ্য শিষ্য। পূর্ব্ব জন্মের কিঞ্চিৎ সুকৃতির জন্য তাঁহার শ্রীশ্রীচরণ লাভ করিয়াছিলাম। যদিও আমি ২৪ পরগণার অন্তর্গত বেলঘরিয়া গ্রামের বিখ্যাত গাঙ্গুলী বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম, ভাগ্যদোষে বাল্যে ছয় বৎসর বয়সে পিতৃ-বিয়োগ হওয়ায় এবং আমার পুণ্যবতী মাতা ঠাকুরাণী ব্যতিরেকে আর কোন অভিভাবক না থাকায় বহু বিষয় সম্পত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। অধিকন্তু বাল্যকালে নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া মরণাপন্ন হইয়াছিলাম। যখন আমার বয়স ১৬ বৎসর তখন কলিকাতায় বেরি-বেরি রোগ প্রথম দেখা দিয়াছিল এবং সেই রোগে আমি আক্রান্ত হইয়াছিলাম—আমার জীবনের কোন আশা ছিল না। সেই সময়ে আমার বাম স্কন্ধের পেশীতে পক্ষাঘাত হয়, বাম বাহুর কোন কার্য্য ছিল না এবং তৎকালীন কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তারদের দ্বারা চিকিৎসা করাইয়া ও কোন ফল পাওয়া যায় নাই। তৎকালীন কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার কর্ণেল কাল-বার্ট তাঁহার সহকর্ম্মী কর্ণেল বার্ড প্রভৃতি চারিজন বিখ্যাত চিকিৎসক সহ আমাকে পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন যে আমার রোগ দুরারোগ্য ও ডান দিক্‌টা ঐরূপ আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। তাহা হইলে আমি অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইব, অধিকন্তু আমার

জীবন-নাশেরও আশঙ্কা। বিখ্যাত বহু জ্যোতিষী দ্বারা আমার কোষ্ঠী বিচার করাইয়া জানা গিয়াছিল যে, আমার ২৩ বৎসর বয়সের মধ্যে অকাল-মৃত্যু-যোগ আছে। শ্রীশ্রীগুরুদেব সেই সময়ে আমার ছোট মেসো মহাশয়ের (কলিকাতার বিখ্যাত ব্যবসায়ী ৺উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের) বাড়ীতে পদধুলি দেন। সেই সুযোগে আমার মাসীমাতা ঠাকুরাণী অত্যন্ত কাতর হইয়া শ্রীশ্রীগুরুদেবকে আমার বিষয় জানান এবং শ্রীশ্রীবাবা আমার উপর কৃপাদৃষ্টি করেন। আমার সৌভাগ্য বশতঃ কিছুদিন বাদেই তিনি আমাকে দীক্ষা দেন এবং দীক্ষা-কার্য্য শেষ হইবার পরই প্রকাশ করেন যে আমার জীবনের কোন আশঙ্কা নাই এবং আরও বলেন যে বড় বড় ডাক্তাররা যাহাই বলুক আমার প্রাণ-নাশ তো হইবেই না, বরং আমার শরীরের দিন দিন উন্নতি হইয়া আমি কার্য্যক্ষম হইব। অতি আশ্চর্য্যের বিষয়, আমার দীক্ষার পর হইতে আমার শরীর ভাল হইতে আরম্ভ হইয়াছিল এবং আমি দুই বৎসরের মধ্যেই অতি কার্য্যক্ষম হইয়াছিলাম। এখানে উল্লেখ-যোগ্য যে আমার ২৩ বৎসর বয়সে যখন আমি ৺পুরীধামে আমার ছোট মাসীমাতা ঠাকুরাণীর সহিত বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য গিয়াছিলাম। তখন তথায় আমি টাইফয়েড্ রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রায় মৃত্যুমুখে পতিত হই। তৎকালীন তথাকার সিভিল সর্জ্জেন ডাঃ পুলিপাকা আমাকে চিকিৎসা করিয়াছিলেন এবং একদিন আমার মুমুর্ষু অবস্থা দেখিয়া আমার জীবনের আশা ত্যাগ করেন। সেজন্য আমার মাসীমাতা ঠাকুরাণী প্রভৃতি সকলে কাঁদিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু সেই সময়েই আমি কিছু অনুভব করিয়াছিলাম এবং

তৎক্ষণাৎ আমি একটু চেতনা পাইয়া বলিলাম যে, আমার জীবন রক্ষা হইবে, তোমরা কাঁদিও না। পরদিন শ্রীশ্রীবাবার একখানা অভয়প্রদ পত্রও পাইয়াছিলাম। তাহার পর হইতে আমার শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইতে আরম্ভ হইয়াছিল এবং কিছুদিন বাদে আমি বিশেষ হৃষ্ট-পুষ্ট ও বলবান্ হইয়াছিলাম। শ্রীশ্রীবাবার কৃপায় আমার আর্থিক উন্নতিও আরম্ভ হইয়াছিল। আমার দীক্ষার পর শ্রীশ্রীবাবা আমার জীর্ণ তিন-কামরা বাসস্থানে পদার্পণ করিয়াছিলেন এবং সেই সময়ে আমার মাসতুতো ভগিনীপতি খিদিরপুরনিবাসী ৺সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল (পূর্ব্বোক্ত ৺উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জামাতা) আমার পূর্ব্বপুরুষের অট্টালিকার ধ্বংসের বিবরণ দেওয়ায় শ্রীশ্রীবাবা বলিয়াছিলেন যে, বাড়ীটির পুনর্গঠন হইবে এবং আমার নষ্ট বিষয় সম্পত্তি পুনর্লাভ হইবে। আমার তৎকালীন শারীরিক ও আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী আমি ধারণা করিতে পারি নাই যে উহা কিরূপে সম্ভবপর, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপায় ও তাঁহার শুভ ইচ্ছায় সাত আট বৎসরের মধ্যেই আমার পৈত্রিক ভদ্রাসনের পুনর্গঠন হইয়াছিল এবং নষ্ট বিষয়-সম্পত্তিরও অনেকাংশ পুনরুদ্ধার হইয়াছিল ও আর আর নূতন সম্পত্তি লাভ করিয়াছিলাম।

আমার চৌত্রিশ বৎসর বয়সে আমার স্ত্রী একটি কন্যা সন্তান প্রসব করিয়া সেপ্‌টিক ও ফ্লেগমেশিয়া রোগে আক্রান্ত হয়। সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তারেরা তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছিল। তখন আমি অতি কাতর হইয়া শ্রীশ্রীবাবাকে জানাইলে তিনি

বলিয়াছিলেন যে আমার স্ত্রী রক্ষা পাইবে ও ৬০ দিন বাদেই রোগের উপশম হইবে। ইহা বলিয়া আমার স্ত্রীর মেসোমহাশয় বিখ্যাত ডাক্তার ৺দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (স্বামী সচ্চিদানন্দ গিরি মহারাজ) শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীশ্রীচরণ দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ও রোগ আরাম হওয়া কঠিন, কারণ তাঁহার Practiceএ ও রোগ কখনও আরাম হইতে দেখেন নাই। তাহাতে শ্রীশ্রীবাবা বলিয়াছিলেন "তোমার মত ডাক্তার ও ভয় করিতেছ। যাও, নিশ্চিন্ত থাক, ৬০ দিন বাদেই রোগীকে বর্দ্ধমান হইতে বেলঘরিয়া লইয়া যাইবে। কারণ তোমার কলিকাতা হইতে বর্দ্ধমান যাতায়াতে খুব কষ্ট হচ্ছে।" অতি আশ্চর্য্যের বিষয় ৬০ দিন বাদেই রোগীর বিশেষ উন্নতি দেখা দিয়াছিল এবং যোগীকে রিজার্ভ কামরায় ইন্‌ভ্যালিড্ চেয়ারে বেলঘরিয়া স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। রোগীকে স্থানান্তরিত করিবার সময় বর্দ্ধমানের প্রসিদ্ধ ডাক্তার দ্বয়, যাঁহারা উপরোক্ত ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত রোগীর চিকিৎসায় নিযুক্ত ছিলেন, প্রচার করিয়াছিলেন যে, স্থানান্তরিত করিলে পথেই রোগীর মৃত্যু হইবে। কিন্তু আমি ও ডাঃ দেবেন্দ্রবাবু শ্রীশ্রীবাবার উপর নির্ভর করিয়া কোন ভয় করি নাই। পরে বর্দ্ধমানের ডাক্তারদ্বয় রোগীর নির্ব্বিঘ্নে বেলঘরিয়ায় পৌঁছান সংবাদ পাইয়া ও তাহার দিন দিন শারীরিক উন্নতির বিষয় অবগত হইয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। ইহার পর ঐ রোগীর উরুদেশ হইতে পায়ের গাঁঠ পর্য্যন্ত ঘা হইয়া পচন আরম্ভ হইয়াছিল। অনেক রকম চিকিৎসায় ও অটো ভ্যাক্‌সিন করাইয়াও ঘায়ের কোন উপশম হয় নাই। কিন্তু শ্রীশ্রীবাবা একটি মলম সূর্য্যবিজ্ঞানের দ্বারা

প্রস্তত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা ব্যবহার করিয়াই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। আমার কোষ্ঠী অনুযায়ী আমার স্ত্রী জীবিতা থাকিতে পারে না, কিন্তু শ্রীশ্রীবাবার কৃপায় আমার ৬৭ বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রী-বিয়োগ হয় নাই, বরং আমার স্ত্রী তাঁহার বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত (আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রবধুর স্বাস্থ্যহানির জন্য এবং কনিষ্ঠ পুত্রের পত্নীবিয়োগ জন্য) পুত্রবধুদের সন্তানাদি লালন পালন কার্য্য ও সংসারের সমস্ত দেখা শুনা কার্য্য করিতে সক্ষম আছে।

আমার জেষ্ঠা কন্যার বার বৎসর বয়সে তাহার বিবাহের পূর্ব্বে মাথার চুল উঠিয়া যায়, মস্তকের অধিকাংশ ভাগেই টাক পড়িয়া গিয়াছিল। অনেক রকম কবিরাজী বিলাত-ফেরৎ Skin Expert প্রভৃতির দ্বারা চিকিৎসা করাইয়া ও কোন সুফল না পাওয়ায় খুব কাতর ভাবে শ্রীশ্রীবাবার শরণাপন্ন হই। তিনি আমার উপর কৃপান্বিত হইয়া বলেন, "যদি পদ্মের নির্যাস জোগাড় করিতে পার তাহা হইলে একটা অব্যর্থ ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দিতে পারি।" আমি বহু চেষ্টায় বহু প্রকার পদ্মের নির্য্যাস সংগ্রহ করিয়াছিলাম, এমনকি ফ্রান্স হইতেও উহা আনাইয়াছিলাম। কিন্তু কোন নির্য্যাসেই প্রকৃত বস্তু পাওয়া যায় নাই। পরে কলিকাতার বাথ্‌গেট কোম্পানীর দোকান হইতে এক শিশি পাই এবং তাহা শ্রীশ্রীবাবার কাছে লইয়া যাইলে তিনি বলেন যে তাহাতে প্রকৃত জিনিষ মাত্র ছয় ফোঁটা আছে। তিনি সেই শিশি না খুলিয়াই এমন কি শিশির প্যাকেট পর্য্যন্ত অটুট রাখিয়া, একটি ছোট পাত্র নিকটে বসাইয়া একটি লেন্স দ্বারা ফোকাস্ করিয়া শিশি হইতে ছয় ফোঁটা নির্য্যাস ছোট পাত্রটিতে পাত্রান্তর করিয়া লইয়াছিলেন

এবং সূর্য্য-বিজ্ঞান দ্বারা একটি ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। উপরোক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা ছয় ফোঁটা নির্য্যাস বাহির করা দেখিয়া আমার গুরু ভ্রাতা ৺যোগেশচন্দ্র বসু (কলিকাতা করপোরেশনের ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর) বলিয়াছিলেন, "বাবা, আপনি ঐ প্রকারে তো বাথগেট্ কোম্পানীর ঘর হইতে ঔষধটা যোগার করিতে পারিতেন।" তাহাতে বাবা হাসিয়া উত্তর দেন যে, তাহা নিশ্চয় হইত কিন্তু তাহাতে চুরি করা হইত। বলা বাহুল্য যে শ্রীশ্রীবাবার সূর্য্য-বিজ্ঞান দ্বারা প্রস্তুত ঔষধ আমার কন্যার মস্তকে সপ্তাহ কাল লাগাইবার পরই তাহার মাথায় পূর্ব্বাপেক্ষা ঘন ও কাল চুল হইয়াছিল এবং শ্রীশ্রীবাবার অসীম কৃপায় আমি কন্যাদায় হইতে উদ্ধার হইয়াছিলাম।

একচল্লিশ বৎসর বয়সে আমি পুনরায় দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া যাই এবং কলিকাতার তৎকালীন প্রায় সকল চিকিৎসকের দ্বারা কবিরাজী, হোমিওপ্যাথিক এবং এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করাইয়া কোন ফল পাই নাই। অবশেষে হতাশ হইয়া ৺পুরীধামে যাই। কিন্তু তথায়ও রোগের কোন উপশম হয় নাই। করুণাময় শ্রীশ্রীবাবার আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি পতিত হয়। হঠাৎ একদিন সংবাদ পাই যে, তিনি ৺পুরীধামে আসিতেছেন। যেদিন ৺পুরীধামে পৌঁছিয়াছিলেন সেদিন ষ্টেশনে তাঁহারা শ্রীশ্রীচরণ দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। গাড়ী হইতে নামিবার পূর্ব্বেই আমার পুত্রকে দীক্ষা দিবেন প্রকাশ করেন এবং তথাকার আশ্রমে বসিয়া আমার মুখের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া বলেন যে, আমার শরীরে খুব কষ্ট হইতেছে, অতএব একটা

প্রতিকার করিয়া দিবেন। পরদিন প্রাতে আশ্রমে যাইলেই তিনি সূর্য্যবিজ্ঞানের প্রক্রিয়া দ্বারা কোন দুষ্প্রাপ্য বস্তু প্রস্তুত করিয়া আমার ডান বাহুর পেশীতে প্রবেশ করাইয়া দেন এবং আমি সেই দিন হইতে সুস্থতা অনুভব করি ও দিন দিন আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। তাঁহার কৃপায় আজ ৫৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমি যুবা পুরুষের মত কার্য্যক্ষম আছি।

আমার জ্যেষ্ঠপুত্রের ১৬ বৎসর বয়সে অকালমৃত্যু-যোগ ছিল। সুতরাং শ্রীশ্রীবাবা তাঁহার স্বাভাবিক কৃপাশীলতা বশতঃ ৺পুরীধামে পৌঁছিয়াই তাঁহার শরীরের অবস্থা খুব খারাপ থাকা সত্ত্বেও আমার পুত্রটিকে দীক্ষা দেন এবং দীক্ষা দান করিয়া বাহিরে আসিয়াই বলেন যে তাঁহার শেষ কার্য্য সমাধা হইল। আর তিনি এ জগতে থাকিবেন না—৺পুরীধাম হইতে ফিরিয়াই তিনি দেহ রক্ষা করিবেন। আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে আমি আমার নিজের ও পুত্রের জন্য তাঁহার শারীরিক অবস্থায় কিছু না জানাইলেও তিনি আমার এবং আমার পুত্রের জীবন রক্ষা করিবার জন্যই ৺পুরীধামে যাইয়া তাঁহার অসীম কৃপা দেখাইয়া ছিলেন। তাঁহার কৃপা উপলব্ধি করি, কিন্তু অনেক বিষয় প্রকাশ অনুচিত বিবেচনায় তাহা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলাম না।

———

গুরু বন্দনা

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রভাতের স্নেহস্নিগ্ধ মন্থর পবন,
অফুরন্ত সঙ্গীতের অপূর্ব্ব মূর্চ্ছন,
তন্দ্রালস মোহময় মদির আকাশ,
দিবসের ক্লান্ত নগ্ন ক্ষুদ্র অবকাশ,
দিগন্তের অস্তমান শত রক্ত ছটা,
অনন্ত অসীম নীলা নীলিমার ঘটা—
অজ্ঞাতে নিভৃতে যেন দেয় আজি আনি'
ব্যাকুল হিয়ায় তব অর্ধস্ফূট বাণী।
নিশীথের মৃদুমন্দ গন্ধভরা বাসে,
উচ্ছলিত তরঙ্গিত শুভ্র জ্যোৎস্নাকাশে—
উন্মুখ অন্তর মম স্পন্দনে স্পন্দনে
থেকে থেকে কেঁপে ওঠে তব পরশনে!
নিত্য নব রূপ ল'য়ে আমার ভুবনে
লীলাচ্ছলে ছেয়ে রাখো মোরে সারাক্ষণে।

শ্রীশ্রীগুরুদেবের কয়েকটি উপদেশ বাক্য*

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

২৫। কোন কর্ম্ম করিতে হইলে তাহা দৃঢ়তার সহিত সাধনা করিবে। যে কর্ম্মই কর না কেন, তাহাতে যদি সিদ্ধিলাভ করিতে চাও তাহার উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া বিশেষ দৃঢ়তার সহিত করিয়া যাইবে। তখন এদিক্ ওদিক্ দেখিবে না, তাহাতে অবহেলা করিবে না, একনিষ্ঠ হইয়া সে কাজ করিয়া যাইবে, দেখিবে সুফল পাইবেই। তাহার গতি কেহ রোধ করিতে পারিবে না, ব্রহ্মা বিষ্ণুও নয়। মনুষ্যের অসাধ্য কি আছে! তোমার মধ্যে যে কি শক্তি আছে তাহা তুমি জান না: দৃঢ়তা চাই, একনিষ্ঠ হওয়া চাই, উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করা চাই। সৎকর্ম্মে বাধা-বিঘ্ন ত আছেই। হ্যাঁগো, যাদের সঙ্গে একদিন ঘরকন্না করছ, তারা কি সহজে ছাড়তে চায়? নানা রকম কু-প্রবৃত্তি, কু-অভ্যাস, অসৎভাব নিয়ে সর্ব্বদা দিন কাটাচ্ছ, তাহাদের সঙ্গে এতদিনের এত ভালবাসা মাখামাখি, আর তারা কি সহজে তোমার সঙ্গ ত্যাগ করতে চায়? তাহারা অনেক চেষ্টা চেয়ে দেখবে; কত রকমে তোমাকে বেঁধে রাখবার চেষ্টা করবে, কিন্তু তুমি যদি আর তাদিকে গ্রাহ্য না কর, খুব দৃঢ় হও, তাহা

---

* বিশুদ্ধবাণী, তৃতীয় ভাগে প্রকাশিত (পৃঃ ১৫৭—১৬৫) উপদেশ বাক্যের অবশিষ্টাংশ। —সম্পাদক

ক্রমে ক্রমে আস্তে আস্তে সরে পড়বে। দেখ্‌লে এর কাছে আর সুবিধা হ'বে না, তখন আর তোমাকে বিরক্ত করবে না। তখন তুমি নিশ্চিন্ত তোমার কাজ করতে পারবে। প্রথম প্রথম অনেক গোলমাল আসে, অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হয়। কিন্তু যখন তাহারা দেখিবে তুমি কিছুতেই টলিতেছ না, তখন আর তাহারা তোমার নিকট আসিবে না। অধিবাস সহ্য করতে হ'বে রে বাপু। গল্প জান ত?

[এখানে 'বাঘের বিবাহে'র গল্পটি লেখা হয় নাই।]

২৬। প্রশ্ন—শ্রীভগবানের কৃপা না হইলে কি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যায়?

উত্তর—আরে বেটা কৃপা ত আছেই। তাঁর কৃপার কি অভাব আছে? কৃপা সর্ব্বদাই পূর্ণ মাত্রায় বর্ষণ হইতেছে। সূর্য্য কিরণ দিতেছেন, কিন্তু তুমি যদি ঘরের ভিতর বদ্ধ হয়ে বসে থাক সূর্য্য কিরণ তুমি ভোগ করিতে পার না। সেইরূপ কৃপা উপলব্ধি করিবার জন্য কর্ম্ম করিতে হয়। আধার প্রস্তুত করিতে হয়। কৃপার জন্য প্রার্থনা করিতে হয় না। ক্রিয়া না করিলে, সাধনা না করিলে, যোগাভ্যাস না করিলে, তাঁর কৃপা যে তোমার উপর সর্ব্বদা বর্ষণ হইতেছে তাহা বুঝিতে পারিবে না। তাঁর কাজ তিনি করিতেছেন। আমরা যে তাঁর ছেলেগো, ছেলেকে দয়া করবার জন্য কি বাবাকে বলে দিতে হয় গো। বাবা ছেলের মঙ্গলের জন্যই সর্ব্বদা ব্যস্ত। কিন্তু ছেলে অজ্ঞান বশতঃ তাহা সব সময় বুঝিতে পারে না। তবে এসব 'বাবা' ছেলের মঙ্গল করতে যেয়ে ভুল করতে পারে, করেও থাকে; তাঁর আর ভুল-

ভ্রান্তি নাই। তিনি সর্ব্বদাই আমাদের জন্য কৃপা বর্ষ করিতেছেন, আমাদের মঙ্গল বিধান করিতেছেন। কৃপা বুঝিবার জন্য, উপলব্ধি করিবার জন্য কর্ম্মের আবশ্যক। কর্ম্ম না করিলে তাহা বুঝিতে পারিবে না। কর্ম্ম করা চাই বাপু, বচনে কিছু হ'বে না; শুধু কথায় কিছু হবে না। কর্ম্ম করিতে হইবে। অতএব কর্ম্মভ্যো নমঃ।

২৭। কিছুতে ম'জনা বাপু, মজলেই মুস্কিল। সংসারী লোক সবই করতে হ'বে। না করলে তারা ছাড়বে কেন? ছেলেমেয়ে পরিবার, আত্মীয়—এসব ত আছে, কর্ত্তব্য জ্ঞানে যাহার সহিত যেরূপ সম্বন্ধ তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিতে হইবে অর্থের আবশ্যক, সর্ব্বদাই আবশ্যক। মসলা ত চাই, তা না হ'লে ত আর কিছু চলবে না। কাজেই অর্থ রোজগারও করতে হ'বে তবে তাহার জন্য নীচ বৃত্তি অবলম্বন করিও না, মর্য্যাদা নষ্ট করিও না, অসৎ পথে যাইও না—সৎপথে সব কাজই করবে, করতে হ'বে। তবে তাতে ম'জ না। "পাত্রে পারদবৎ, পদ্মপত্রে জলের ন্যায়।"

২৮। প্রঃ—বাবা, ক্রিয়া করিয়া, সাধনা দ্বারা কিছু যে হচ্ছে তা বুঝব কি করে?

উঃ—এই ধর কলিকাতা হইতে কাশী যাইতেছ। কলিকাতা হইতে যতদূরে যাইবে কাশীর তত নিকট হইতেছ, কেমন সেইরূপ সংসারে, বিষয়ে যত আসক্তি কমিতে দেখিবে, বুঝিবে সেই পরিমাণে অগ্রসর হইতেছ। এদিকে ক্রমে ক্রমে বিরক্তি আসবে, এসব আর তত ভাল লাগবে না। করতে হয় করে

নিস্কৃতি পেলেই বাঁচি, এইরূপ মনে ভাব আসিবে। তখনই জানিবে ওদিকে একটু ভালবাসা হয়েছে।

২৯। উপযুক্ত সময়ে সকল কাজ করিবে। সময় অতিবাহিত করিয়া অসময়ে কাজ করিলে সে কাজের সম্যক্ ফল পাওয়া যায় না। ক্রিয়া ঠিক সময়ে করিলে তাহার যেরূপ ফল পাওয়া যায় —অসময়ে করিলে তদ্রূপ ফল পাওয়া যায় না। বিশেষ অসুবিধা না হইলে ঠিক সময়ে ক্রিয়া করিবে। রাত্রি চারটায় উঠিয়া ক্রিয়ায় বসিবে এবং সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত করিবে এবং সন্ধ্যায় ঠিক সূর্য্যাস্ত সময় ক্রিয়ায় বসিবে। ঐ সময় ক্রিয়া করিলে তাহাতে সুফল পাইবে। অন্যথায় সেরূপ ফল হইবে না। তবে সময় অতিবাহিত হইয়াছে বলিয়া যেন ক্রিয়া বন্ধ করিও না। একেবারে বন্ধ করা অপেক্ষা অসময়ে করা ভাল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিছু ফল ত হ'বেই। তবে সময়ে করিবার বিশেষ চেষ্টা করিবে। বাপু, মনে রাখিও "ক্ষুধার সময় খেতে না দিলে, ভাল লাগে না সুধা পেলে।"

৩০। অতিশয় মূঢ় লোকেই হঠাৎ সকল বিষয় বিশ্বাস করে; কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা তাহা করেন না। নিজের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিবে, পরীক্ষা করিবে, তবে বিশ্বাস করিবে। সেই বিশ্বাসই প্রকৃত বিশ্বাস, তাই স্থায়ী হইবে এবং তদনুসারে কাজ করিলে সুফল পাইবে।

৩১। প্রঃ—আপনি সর্ব্বদাই নিয়মিতরূপে ক্রিয়া এবং সৎ-কর্ম্ম করিতে উপদেশ দেন। সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি আসিবে কি করিয়া? কাহারও প্রবৃত্তি হয়, কাহারও হয় না; এরূপ কেন হয়?

উঃ—কর্ম্ম করিলেই কর্ম্মে প্রবৃত্তি আসে। সৎ-কর্ম্মের অনুশীলন করিতে করিতে এমন অভ্যাস হইবে যে আর তাহা ত্যাগ করিতে পারিবে না। প্রথম প্রথম নিজে চেষ্টা করে ক্রিয়ায় বসিতে হইবে, তারপর এমন হইবে যে না বসিলে প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করিবে। গুরু উপদেশ দেবেন, বলে দেবেন, দেখিয়ে দেবেন, কাজ তোমাকে করিতে হইবে। যে কাজ করবে সেই তার ফল পাবে। দৃঢ়তার সহিত নিজের মঙ্গলের জন্য কাজ করতে হ'বে, খাট্‌তে হ'বে। গাল গল্প করলে কিছু হ'বে না। ক্রিয়ার অভ্যাস করলে আর তাহা ছাড়্‌তে পারবে না। এই দেখ না বাপু, আমি আজ দুই তিন বৎসর নানা কারণে নানা প্রকারে ভুগিতেছি, কিন্তু কোন দিন দেখেছ কি নিজের কাজ বন্ধ গেছে। এই ত সব কাছেই শুয়ে থাকে, একদিন কি শরীর অসুস্থ বলে আসল কাজে অবহেলা করেছি? ঠিক রাত্র বারটা বাজলেই তখনি উঠে পড়েছি, আসনে বসেছি। আর শুয়ে থাকতে পারি নাই। নিজেকেই সব করতে হবে। আলস্য ত্যাগ করতে হ'বে।

জ্ঞানগঞ্জের পত্রাবলী

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট্

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সপ্তম পত্র

ওঁ তৎসৎ

জ্ঞানগঞ্জ
পঞ্জাব আশ্রম,
১৮৩৫, শুক্লপক্ষ।

নারায়ণ স্মরণবরেষু,

পরমহংস ভৃগুরাম স্বামীর শুভ সংবাদে যথাবিধানে সম্ভাষণ-পূর্ব্বক বিজ্ঞাপন পরম্—

যথা স্বপ্নে দ্বয়াভাসং চিত্তং চলতি মায়য়া।
তথা জাগ্রদ্ দ্বয়াভাসং চিত্তং চলতি মায়য়া॥
অস্তি নাস্তীতি নাস্তীতি নাস্তি নাস্তীতি বা পুনঃ।
চল স্থিরোভয়াভাবৈরাবৃণোত্যেব বালিশঃ॥

যখন কর্ত্তৃত্বপদকে পায় অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় কাজের এক বোধ হয়। এক বলিলেই এক হয় না। মন সকল দিকেই যাউক না কেন কার্য্যের সময় ক্ষণকালের জন্য ঠিক থাকিলে যোগের উপদেশ আমাদের যেমন সহজসাধ্য তাহাতেই প্রত্যক্ষ হইবেই হইবে। তবে আসন ঠিকভাবে হওয়া কর্ত্তব্য। উপযুক্ত গুরু ব্যতীত যোগপ্রাপ্তি কোন যুগে কোন কালে কোন মতে হইবে

না। "তরতি শোকমাত্মবিৎ" ইতি। যিনি আত্মাকে জানেন তিনিই শোক হইতে পরিত্রাণ পান। তাঁহাকে পরব্রহ্ম জানিও। তিনিই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম জানিয়া পরমপদকে পায়। তবে তুমি কে আমি কে ভাই ?

বিশুদ্ধানন্দ ভাই, আর নারে, আর না—তোর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। সংসার শ্মশানভূমির ভীষণ দর্শনেও অসারকে সকলে সার ভাবে। প্রকৃত সত্যকে উপেক্ষা করিয়া আমিত্বের দাসত্বে বাধ্য হয়। বিশে ভাই, আমিত্ব কি ভয়ঙ্কর! কিছুতেই মানব-প্রকৃতিকে উচ্চ আদর্শের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় না। ইহাতে আবার মায়ার বিবিধ প্রলোভন উপস্থিত। কিন্তু ইহা কি কর্ত্তব্য নহে যে এই সকল বিঘ্ন বিড়ম্বনা সত্ত্বেও গন্তব্য পথের [পথ ?] স্থির রাখিতে হইবে ? মুহূর্ত্ত সময়েই যদি শ্মশান-বৈরাগ্যকে আসক্তির পদতলে নিক্ষিপ্ত করে তাহা হইলে কি হইল ? অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় পবিত্র বৈরাগ্যকে অন্তরে জাগ্রৎ রাখিয়া প্রত্যেক ঘটনার মধ্যে প্রবেশ করিলেই সংসারের নিষ্কলঙ্ক বিশুদ্ধ সত্যের অনুষ্ঠানে অনায়াসেই শান্তিলাভ হইতে পারে। ঠিক জ্ঞান কি? বস্তুতঃ জ্ঞানের মৌলিক তত্ত্ব চেতন শক্তি। যোগীরা ইহাকে স্বরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। স্মৃতি, বুদ্ধি, বাক্য, মন, দর্শন, শ্রবণ এ সকল ঐ শক্তিরই বিকাশ। ইহারা ও শম, দম, তিতিক্ষা ও দ্বেষ দম্ভ হিংসা প্রভৃতি শুভাশুভ উত্তম বৃত্তির মধ্যে বিচরণ করে [করতে ?] জ্ঞানস্বরূপ বিধাতা সকল প্রকার ব্যক্তিকেই স্বাধীনতা দিয়াছেন। তাহারা সেই স্বাধীন শক্তি বশে সুখ, দুঃখ, শান্তি ও অশান্তি ভোগ করিতেছে। পশুপক্ষীর মধ্যে সীমাবদ্ধ জ্ঞানের

বিধানেও কোন যন্ত্রণার কারণ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু উচ্চ জ্ঞান বিশিষ্ট মানবগণ স্বাধীন শক্তির স্বার্থ প্রলোভনে পড়িয়া জ্ঞানকে নানাভাবে গ্রহণ করে। মানবের চিন্তাশক্তি সকল অপেক্ষা উন্নত। এজন্য কেহ গুরু-ব্রহ্মের অস্তিত্বই স্বীকার করে না, একেবারেই উড়াইয়া দেয়। তাহার প্রমাণ তুমি ও তোমার শিষ্য বুঝিতে হইবে। এই যে জ্ঞান—বিভ্রাট্ ইহার দুইটি কারণ আছে। একটি শাস্ত্রে অবিশ্বাস, আর একটি রুচিগত স্বার্থচিন্তা। এই দুই অনুদার ভাব দ্বারা সরল প্রকৃতিকেও সন্দেহের তরঙ্গ-ঘোরে আকুল করিয়া তোলে। নদী যেমন বাধা প্রাপ্ত হইলে বহুদিকে প্রবাহিতা হয়, তেমনি তেজস্বী মনস্বীরাও স্বার্থচিন্তার উত্তেজনায় বিবিধ প্রকার যুক্তি পথে ছুটিতে থাকে। অনাবৃত সরল তত্ত্বের প্রতি তাহাদের আদতেই দৃষ্টি পড়ে না। যদি পড়িত তাহা হইলে সত্যের এত অনাদর হইত না, বর্দ্ধমান আশ্রমের এত বিভ্রাটও ঘটিত না।

অন্য শিষ্যের দ্বারা কার্য্য চালাইবে। যাহার এভাব তাহার নিকট আমার নির্দ্দিষ্ট আশ্রমের ভার গ্রহণার্থ সকলে অর্থ গ্রহণ করিবে না। নররূপী পিশাচ * * * ১৩১৯ সালে তোমায় কিভাবে পত্র লিখিয়াছিল তাহা মনে আছে কি? সেই হইতেই তাহাদের উপর আমি বিরূপ। পিশাচ তোমার নাম করিয়া না করিয়াছে এমন কার্য্য নাই। তোমার অগোচরে অযথা যাচ্ঞা করিয়া কি না করিয়াছে? অতি পাতক সমগ্র নষ্ট করিতে বসিয়াছে। তাহাকে তুমি সাবধান করিতে যাও। তুমি সাবধান করিয়া কি করিবে? * * * ঐরূপ ব্যবহার প্রায়

ধরিয়াছে। ঐরূপ প্রবঞ্চক হওয়াতেই ঐরূপ ঘটনা হইতেছে। কাহার উপর কৌশল পাতিয়া সকলে কার্য্য করিতেছে ? * * একটি প্রধান অন্ত্যজ। সে না পারে এমন কোন কার্য্য নাই। আরও জানিতে চাও তাহাদের সমস্ত বৃত্তি এবং সকলের সমস্ত বৃত্তি লিখিব। * * প্রভৃতি নরাধমদিগকে সাবধান হইতে বল। শুভ চায় ত সাবধান হইতে বল। তোমার নাম করিয়া যে সকল কার্য্য যাহার নিকট করিয়াছে বা বলিয়াছে তাহার নিকট যাইয়া সমস্ত সত্য বলিতে বল। এখনও যদ্যপি ভাল চাহে। তুমি আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর বস্তু। তোমাকে যখন যাহা বলিয়াছি তখন তাহা বলিতেছ বা করিতেছ। তুমি যাহা দেখ না বা বল না বা কর না তোমার জন্য আমি সমস্তই করিতেছি। তোমার দাস আমি, অথচ তুমি আমার দাস হইতে পার। তুমি আমি, আমি তুমি, তুমি জান না। অথচ ঐ দুষ্কৃতেরা অনেক কার্য্য করিয়াছে। যাহা করিয়াছে তাহা সমস্ত মিথ্যা। সমস্ত প্রকাশ করুক তাহা হইলে অনেক পাপের লাঘব হইবে। তাহা হইলে ত্রিপুরা ভৈরবী তাহাদের জন্য কার্য্য করিবেন। ৯ই ভাদ্র হইতে * * যে ভাল গ্রহ পড়িবে তাহার দ্বারা শুভ কিছুই হইবে না, বিশেষ ক্রিয়া করিতে হইবে। তাহাকে সংবাদ দাও। আসিলে পত্রের মর্ম্ম সমস্ত বুঝাইয়া দাও। তোমায় এত বিশৃঙ্খলতা দেখিতে হইত না, তোমায় এত উদ্বিগ্ন হইতে হইত না। ১৩১৮ সালের ১৩ই আষাঢ় বর্দ্ধমান আশ্রমে বসিয়া বেলা ঠিক দ্বিপ্রহর কি ভাবিলে ? গুঙ্করা হইতে তোমায় যখন বর্দ্ধমানের শিষ্যরা বর্দ্ধমানে আনিল তখন কি

ভাবিলে ? ভাবিলে এইবার ধর্ম্মের উন্নতি হইবে। সকলকে রীতিমত যোগশিক্ষা দিয়া পরম আনন্দে সকলে থাকিব, শিষ্য সকল জাতিস্মর হইবে, ত্রিকালজ্ঞ হইবে—কি আনন্দই হইবে। এখন কি হইতেছে ভাই ? তখন আর এখন। তোমার শিষ্য সকল ফল্গুনদীর ন্যায় থাকিয়া তোমার দ্বারা সকল কার্য্য করিয়া লইবে। হাঁ রে, দাস প্রভু যে চেনা ভার রে। অথচ সাবাস লওয়া চাই। ধন্য কাল প্রভাব! তোমার সেবাযত্ন দূরের কথা —অন্তরালে থাকিয়া মজা দেখিব। কি দুরদৃষ্টের কথা। ইহাতেই তাহারা ধার্ম্মিক ও যোগী হইবে। কোন কার্য্য না করিয়াও গুরুর যত্ন ও গুরুর কার্য্যে কেহ বাধা না দেয় এরূপ করিলে যে সিদ্ধ ও সর্ব্বজ্ঞ হয় তাহা তাহারা জানে না। আশ্রমের সুবন্দোবস্ত সকল শিষ্য যদি না করে তাহা হইলে তুমি তথায় থাকিবে না, অন্যত্র যাইবে কিংবা আমাদের নিকট থাকিবে। আর যথেষ্ট হইয়াছে। বর্দ্ধমান আশ্রমের ভার যাহার, তাহার উপর ন্যস্ত করিয়া তুমি চলিয়া আসিবে। ঐ আশ্রম হইতে যাহা হইবে ভৈরবীদের হইবে। যত্যপি শীঘ্র তাহারা উত্তমরূপ বন্দোবস্ত করে তাহা হইলে যতদিন ইচ্ছা বর্দ্ধমান আশ্রমে থাকিতে পার। আমি অনেকবার বর্দ্ধমান আশ্রমে যাইয়াছি। বর্দ্ধমান আশ্রমের ভার আমি যাহাদের উপর ন্যস্ত করিতেছি তুমি তাহাদের উপর ন্যস্ত কর। উহারা যাহাকে বা যে শিষ্যকে ইচ্ছা তাহাকে লইয়া কার্য্য করিতে পারিবে। ইহারা যাহা বলিবে বা যাহা করিবে সকল শিষ্যই তাহাতে স্বস্তি করিবে। স্বস্তি না করিলে আমি তাহার বিশেষ

বিধান করিব। দুই হাজার শিষ্যের মধ্যে পনের শত শিষ্য বাদ দিব। * *

অষ্টম পত্র

নারায়ণ স্মরণবরেষু,

পরমহংস উমানন্দ স্বামীর শুভ সংবাদ যথাবিধানে সম্ভাষণ-পূর্ব্বকং বিজ্ঞাপন পরং।

পিতৃসন্নিভ! মহাদুঃখ ও মহাভয়ই বন্ধু। মহাশক্তি মহামায়া জগৎ-প্রসবিনীর নাম সূত্রে অসীম আকাশে স্থিতিরূপা। মহাশক্তি মহানুগ্রহ ব্রহ্মনিষ্ঠা সদ্‌ব্রাহ্মণ মহাবিজ্ঞান, যিনি জগৎ প্রসব করিতেছেন এবং যিনি তাঁকে প্রসব করিয়াছেন তাহার তত্ত্বই সর্ব্বদা অনুসন্ধানে যিনি রত এবং করিতেছেন, মেঢ্রে চতুর্দ্দল, কণ্ঠে ষোড়শদল, চক্ষে দ্বিদল, মস্তিষ্কে সহস্রদল প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি যোগবিজ্ঞানে পরমযোগী। তিনি যাহাকে যেভাবে শিক্ষা দিবেন, উক্ত আদেশ অনুযায়ী যিনি কার্য্য করিবেন, নিশ্চয় তিনি প্রত্যক্ষ করিবেন ও বিজ্ঞান শিক্ষা অনুযায়ী ত্রৈলোক্যমণ্ডলং সূর্য্যস্থ বিজ্ঞানং শিক্ষা করিলে সকল বিষয় অধিকারী হইবেন। আবশ্যকীয় দ্রব্য ও দেবদেবীর দর্শন মুহূর্ত্তমধ্যে প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই; অবশ্য সময় সাপেক্ষ। যিনি বিশ্বাস ও ভক্তিশূন্য, গুরুবাক্যে বিশ্বাস নাই, শাস্ত্রবাক্যে অবহেলা করেন, তিনি নিশ্চয় মূলধনে বঞ্চিত হইবেন, চিরকাল দুঃখভোগ করিবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আপনি যে সকল বিজ্ঞান-যন্ত্রের বিষয় লিখিয়াছেন তাহা পাইতে দেরী হইবে। * * পরে সমস্ত লিখিব। পূর্ব্বপত্রে অনেক বিষয় আপনাকে লিখিয়াছিলাম,

তাহা পরমারাধ্য পূজ্যপাদ গুরুদেবের আদেশানুযায়ী। তিনি যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, তাহাতে আপনার শিষ্যদের মধ্যে সরলতা নিষ্ঠাবান্ শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস খুব কম। যাহারা লোকের নিকট সৎ বলিয়া পরিচয় দেয় তাহারা নিতান্ত মূঢ় ও মহাপাপী। এই সব দেখিয়াই আপনাকে সকল তত্ত্বের বিষয় জানিবার যে শিক্ষা দিয়াছেন তাহা বন্ধ রাখিয়াছেন। পাছে আপনার মানসিক বৃত্তি তাহাদের দেখিয়া খারাপ হইয়া যায় এবং যোগ বিজ্ঞানের অনিষ্ট হয় সেই জন্য। আপনি কোন বিষয়ে চিন্তিত হইবেন না। আশ্রমের সকল বিষয় সেইজন্য আপনাকে সঠিক তিনি লেখেন না বা বলেন না। আমি তাঁহার আদেশ অনুযায়ী লিখিতেছি। আমার এ বিষয়ে কোন দোষ নাই। আপনার ব্রহ্মচারী শিষ্যের মধ্যে অনেকেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এখন তাঁহারা এইখানেই থাকিবেন, পরে যেরূপ আদেশ করিবেন সেইরূপে কার্য্য করিব। যে পত্রে বিশেষ আবশ্যকীয় গুপ্ত বিষয় আছে তাহা কোন শিষ্যের নিকট বা কাহারও নিকট এখন প্রকাশ করিবেন না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব পত্রে যাহা আছে, যাহা ছাপাইতে আদেশ করিয়াছেন, তাহা এখন বন্ধ রাখিবেন। বিবেচনা অনুযায়ী কার্য্য করিবেন ও ছাপাইবেন। আপনার অনেক শিষ্যের মধ্যে সেব্য-সেবকের ভাব বেশ আছে, তবে অহং শুষ্কজ্ঞানের তীব্রতাপে বিশুদ্ধ তত্ত্বের স্পর্শযুক্ত বা আস্বাদন বুঝিতে পারে না। তাহাদের পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে বিশ্বজনীন প্রেম উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইতে পারে। অনেকের ভিতর বেশ কার্য্য হইতেছে, অথচ অস্ফুটভাবে রহিয়াছে বটে ও ভাবিতেছে এতদিন কার্য্য করিতেছি

কি হইল ? নিজের দোষ নিজে বুঝিতে পারিতেছে না। তাহার কারণ শুদ্ধ আত্ম-গরিমা। আত্মগরিমা-ঝটিকা বন্ধ হইলেই পাইবেই পাইবে। যে পর্য্যন্ত আত্মাভিমান কর্ম্মানুরাগ ত্যাগ না হইবে সে পর্য্যন্ত যোগ-বিভ্রাট্ হইবেই হইবে। কারণ যে ক্রিয়া বা বীজ তাহাদিগকে দিয়াছেন, তাহাতে সমস্ত দোষ ও ক্ষোভ বিরহিত। ভাবিয়া দেখুন যোগীদের ইষ্টলাভ সত্ত্বেও প্রার্থনার বিরাম নাই। ইহা কি পরমানন্দের বিষয় নয় ? তাঁহাকে পাইয়াও আশার প্রবল স্রোত অনিবার্য্য প্রবাহিত হইয়া থাকে। এই কারণে জননী ও পুত্রের মধুর ভাবাদি শ্রেষ্ঠ। গুরুদেবকে যদি আন্তরিক মন-প্রাণ উৎসর্গ করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে নিশ্চয়ই স্বর্গীয় পবিত্রতার অধিকারী হয় এবং তাঁর কৃপায় চেষ্টা শূন্য হইলেও স্বভাবতঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। পরিণাম ব্যাপার পূজ্যপাদ স্বয়ং গুরুদেবই জানেন ও দেখিতেছেন। বন্ধুগণ আশ্রমের প্রতি আর দৃষ্টি নাই কেন ? তাহা তাঁহারা জানিতে বিশেষ ইচ্ছুক। যাঁহার দৃষ্টি পড়িবে তাঁহার নিশ্চয়ই মহাভাবের আবির্ভাব হইয়া কাম-ক্রোধাদির অসার ভাব বিনষ্ট হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের প্রবল জ্যোতি প্রকাশ পাইয়া কলুষিত চিত্ত দূর হইয়া অপার আনন্দ আসিবেই আসিবে। আশ্রমের যে কার্য্যই হউক —আপনি দৃষ্টি রাখিবেন। আদান-প্রদান প্রভৃতি কার্য্যে নিজে নিকট শিষ্য রাখিয়া বলিয়া দিবেন বা নিজে করিবেন, তাহা হইলে শিষ্যদের কোন আপত্তি থাকিবে না। পরমারাধ্য পূজ্যপাদ ভৃগুরাম পরমহংসদেব তিনি সমস্ত আশ্রমের আয় ব্যয়াদি সমস্ত কার্য্য দেখিতেছেন ; আপনি দেখিবেন না ইহার কারণ কি

যিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কেন সমস্ত জগতের ব্যাপার দেখিতেছেন এবং বিচার করিতেছেন, তাহার দণ্ড ও পরিত্রাণ দিতেছেন ? আপনি না যদি দেখেন বা করেন তাহা হইলে আপনাকে বিশেষ দণ্ড পাইতে হইবে এবং ক্রিয়াদি সমস্ত কাড়িয়া লইবেন। আপনাকে পূর্ব্বের ন্যায় দরিদ্র ব্রাহ্মণবেশে বেড়াইতে আজ্ঞা দিবেন। আমার কোন দোষ নাই। তাঁর আজ্ঞা এবং তিনি সম্মুখে থাকিয়া আদেশ করিতেছেন। বিশেষ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবেন। পরে সমস্ত বিষয় আরও লেখা হইবে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বিজ্ঞানের কার্য্য আরম্ভ হইলে যে সকল শিষ্য আপনার নিকট থাকিবে ও কার্য্য করিবে তাহাদের আয় ব্যয় যে সমস্ত হইবে, সমস্ত আশ্রম হইতে দেওয়া হইবে, তাহাদের কোন বিষয়েই অভাবের কারণ যাহাতে না থাকে তাহার ব্যবস্থা হইবে। আশ্রমের সেবা কার্য্যাদি মিতাহারীর ন্যায় ব্যবহার হইবে। ভোগ-যাতনা আরম্ভ হইলে কোন কার্য্যই সুসিদ্ধ হইবে না। লালসা না ত্যাগ হইলে বিশুদ্ধ-আনন্দের আশা কোথায় ? পরে সমস্ত বিষয় তাঁহার আদেশ অনুবায়ী লিখিব। আপনার অনুগ্রহ প্রার্থী, আপনা অপেক্ষা বয়সে অধিক হইলেও আমি আপনার দাস, আমার কোন দোষ গ্রহণ করিবেন না। আমাকে যাহা বলিলেন আমি তাহাই লিখিলাম। ক্রিয়া সম্বন্ধে পূর্ব্বপত্রে যাহা লেখা হইয়াছে যোগ-জ্যোতিষ প্রভৃতি উপযুক্ত শিষ্যকে এইবার দিতে পারিবেন। সূর্য্যবিজ্ঞান সকল শিষ্যকে দেখাইবার নিয়ম নয়, উপযুক্ত বোধে দিবেন। কারণ ইহার দ্বারা না হইতে পারে এমন কার্য্য কিছুই নাই। পরমারাধ্য পূজ্যপাদ

ভৃগুরাম পরমহংসদেব কাশী ও বণ্ডুল আশ্রমে গিয়াছিলেন এ
মধ্যে মধ্যে যান। আপনার মানসিক বৃত্তি পরীক্ষার জন্য না
ঘটনা করিয়াছেন ও করিতেছেন, ইহা আপনার শুভরই লক্ষ
এখন আমি আসি।

—উমানন্দ স্বামী

কয়েকখানা ছিন্নপত্র

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট্

(১)

প্রস্তাবনা

এই সঙ্গে "কয়েক খানা ছিন্ন পত্র" নামে যে পত্রাংশগুলি প্রকাশিত হইল তাহা আমার নিকট লিখিত একজন সাধক গুরুভ্রাতার কয়েকখানা পত্রের অংশ। এইগুলি প্রায় ১০।১১ বৎসর পূর্ব্বে আমার নিকট লিখিত হইয়াছিল। আমি যথা-সময়ে ঐগুলির উত্তরও দিয়াছিলাম। পত্র-লেখক শ্রীশ্রীগুরু-দেবের একজন কর্ম্মী শিষ্য। তিনি নিজের অনুভব-সংক্রান্ত বহু বিষয় মাঝে মাঝে পত্র দ্বারা আমার নিকট বর্ণনা করিতেন এবং এখনও করেন। একটি বিশিষ্ট প্রসঙ্গের আলোচনা আছে বলিয়া এই পত্রগুলি আংশিক ভাবে প্রকাশিত হইল। অন্যান্য পত্র এই বিষয়ে অপ্রাসঙ্গিক মনে করিয়া তাহা হইতে কোন অংশ উদ্ধার করা হইল না। লেখকের নাম অপ্রকাশিত রহিল এবং অপ্রকাশিতই থাকিবে। এই পত্রে বর্ণিত বিষয় সম্বন্ধে আমার নিজের বক্তব্য পত্রাংশের উপসংহার রূপে পরে প্রদত্ত হইয়াছে।

(২)

প্রথম পত্র

দাদা, সত্যই কি আমি কোথাও গিয়াছিলাম ? এ জগৎ ছাড়িয়া ঐ রকম কোন স্থান প্রকৃতই আছে কি ? এটা আমার কল্পনা নয় ত ? বার বার যত পরীক্ষা করিয়া বাজাইয়া দেখি মনে হয় যেন সত্যই আমি ঠিক সেই একটি সুন্দর স্থানে, অতি পরিচিত অথচ নূতন স্থানে, স্নিগ্ধ রশ্মির মধ্যে পথ চলিতেছিলাম। খুব তীব্র আলো অথচ সূর্য্য-রশ্মির বা রোদের মত তীব্র ও প্রখর নয়, জ্যোৎস্নার অপেক্ষা আরও স্নিগ্ধ এবং উজ্জ্বল প্রকাশ। এ জ্যোৎস্নায় পড়া যায় না, দূর পর্য্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায় না। সেখানে অতি দূর পর্য্যন্ত অতি স্পষ্ট ভাবে দেখা যায়। ক্ষুদ্র অপেক্ষা ক্ষুদ্র বস্তুও দৃষ্টিগোচর হয়।

কতবার ভাবি যে লিখিব, কিন্তু এতই সঙ্কোচ ও লজ্জা মনে আসে যে লিখিতে পারি না —এতই সন্দিগ্ধ মন ! সন্দেহ এইজন্য পাছে ভুল হয়, পাছে কল্পনা হয়। অথচ উহা এতই পরিষ্কার সত্য যে যখন দেখি বা পাই তার অপেক্ষা এই জগৎ অতি তুচ্ছ, অতি ম্লান, ক্ষণ-ভঙ্গুর মনে হয়। এটা যেন আজ আছে কাল নাই সেটা যেন চিরদিন চিরকাল শাশ্বতভাবেই আছে ও থাকিবে। দাদা, এ জগতে ইহা সকলে হেঁয়ালি মনে করিবে; কিন্তু আপনি হেঁয়ালি মনে করিবেন না। আমি কেবল এটুকু জানিতে চাই আমার এটা স্বপ্ন নয় ত ? নিছক মায়াবীর কল্পনা বা ছায়াবাজীর মত নয় ত ? আমি এখন আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়া রাখি, আপনি স্পষ্ট করিয়া জানাইবেন। আমি ভাবের ঘরে চুরি করিতে চাই না

আমরা বাবার শিষ্য, প্রত্যক্ষবাদী, কেবল খেয়ালের উপর জীবনটা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা খেলিতে গেলেই বাবার বড় বড় দুটি চক্ষু জ্বলিয়া উঠে ও শাসন করে—"খবরদার, মিথ্যার আশ্রয় লইও না। যাহা প্রত্যক্ষ তাহাই বিশ্বাস করিবে!" ইহাই বাবার বাণী।

মহানিশার আসনে কিছুক্ষণ বসিবার পূর্ব্বে কানের মধ্যে একটা গুন গুন শব্দ হইয়া আমাকে উঠাইয়া দিল। তারপর আসনে বসিবার পর একটা আলোময় রাজ্যে গিয়া পড়িলাম, যেন একটি সুন্দর পথ একটি বিরাট্ শ্বেত অট্টালিকার দিকে নিয়া যায়। সেখানে যেন কেহ নিয়া যাইবার জন্য প্রেরণা করিতেছে, কার যেন ডাক পড়িতেছে। সম্মুখ হইতে হাত ছিনাইয়া 'আয় আয়' করিয়া কে যেন ডাকিতেছে, অথচ কেহ ডাকেও না, কথাও কয় না, সব মৌন, চোখে চোখে তাকাতাকি হইয়াই যেন সব কথা হইয়া যায়। বেশী বাক্য-ব্যয়ের প্রয়োজনই হয় না। এমন যে পরিষ্কার ঝরঝরে জ্যোৎস্না তার ছায়া পড়ে না। আমি প্রথমে মনে করিলাম এতদূর হেঁটে যাব কি করে? ভাবিতেছি এত তীব্র রোদে কি ক'রে হাঁটব? এই সব ভাবিতেছি, হাঁটিতেছি কি,বসিয়া আছি তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু সেই বিরাট্ অট্টালিকার নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছি। দূর হইতে সেই শ্বেত স্ফটিক-নির্ম্মিত অট্টালিকা বা মন্দির যত বৃহৎ মনে হইতেছিল নিকটবর্ত্তী হইয়া তত বড়ই দেখাইল—নিকট দূর বলিয়া যেন কিছু নাই। প্রথম প্রথম কয়েকদিন দরজার নিকট হইয়া ফিরিয়া আসিলাম। তখন মনে মনে ভাবিলাম সত্যই কি আমি নিজের আসন ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছি? এই মনে করিয়া নিজের হাত দিয়া আসনটা feel

করিলাম, ছুঁইলাম, দেখিলাম যে আমি আসনেই বসিয়া আছি। ইহাতে আরও প্রমাণ হইল যে 'অজ্ঞান' হইয়া যাই নাই, সম্পূর্ণ চৈতন্য আছে, চৈতন্য হারাই নাই, সমাধিও নয়। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলাম। মনে হইল যে মন্দিরে প্রবেশ করিলে জানি না ফিরিতে পারিব কি না। তার পরদিন আবার সেখানে যাইবার জন্য কৌতূহল হইল। এতই প্রবল কৌতূহল যে না গিয়া থাকা যায় না। কিন্তু আমার দুষ্ট মন, সন্দিগ্ধ মন, কেবলই ভাবিতেছিল এই সব যা দেখিতেছি একটা খেয়াল মাত্র নয় ত? আসনের উপর বসিয়া ভাবিলাম আজ আবার যেতে পাব কি? যাইতে যাইতে জানু দিয়া টিপিয়া দেখিলাম—আসনের উপর আছি ত? শূন্যে নাই ত? আসনের কথা ভুলিয়া গিয়াছি, হঠাৎ কখন্ যে সেই আলোময় জগতে গিয়া পড়িয়াছি তা মনেও নাই। সেই দিন আবার পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা হইল। দেখিলাম একজন অতি সুন্দর পুরুষ আমারই মত পথিক। তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখি যে তিনি নিশ্বাস লইতেছেন না—শ্বাস প্রশ্বাস নাই বলিলেও হয়। অতি কৌতূহলী হইয়া দেখিতেই তিনি যেন আমার প্রতি চাহিয়াই আমাকে বলিলেন, এখানে আসিলে কাহারও শ্বাস প্রশ্বাস বয় না। আমি তৎক্ষণাৎ জোরে শ্বাস প্রশ্বাস লইবার জন্য চেষ্টা করিলাম, দেখিলাম যেন সত্যই আমারও কিছুক্ষণ শ্বাস বন্ধ ছিল। মনে করিতেই শ্বাস বহিতে লাগিল। বিনা প্রয়াসে শ্বাস রুদ্ধ হইবার কি আনন্দ তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। সেদিনকার মত আর মন্দিরে প্রবেশ করা হইল না। কেননা নিজের প্রতি লক্ষ্য করিলেই

ফিরিয়া আসিতে হয়। সন্দেহ হইলেই আর সেখানে থাকা যায় না। * * *

এ সব কথা কাহাকেও এখন বলিবেন না। পাছে কেউ শোনে এই ভয়। আপনাকে বলিব বলিয়া কতবার পত্র লিখিলাম, কিন্তু পাঠান হয় নাই। তবে মনে যখন প্রশ্ন উঠে তখন আপনাকে ছাড়া আর কাহাকেই বা জিজ্ঞাসা করিব?

* * *

মন্দিরে প্রবেশের কথা।

দ্বিতীয় পত্র

আপনাকে আমি পূর্ব্ব পত্রখানিতে ১০-৪-৪৫ হইতে আরম্ভ করিব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, কারণ ঐ তারিখ হইতে আমি কর্ণে ধ্বনি শ্রবণ করিতে লাগিলাম বিশেষ রকমে ও বিশিষ্টভাবে। তার পরে পাঁচ ছয় দিন পর হইতে ক্রমশঃ শব্দ যেন আলোকে পরিণত হইতে লাগিল। আলোক যত বেশী পরিষ্কার হইতে লাগিল উহার স্নিগ্ধতা ও উজ্জ্বলতা ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে শব্দের ধ্বনি যেন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া চলিল অর্থাৎ আলোকের সহিত শব্দময় বা শব্দমাখা হইয়া গেল। শব্দের সহিত আলোকের কিরূপ সম্বন্ধ? তখন আমি কোথায় থাকি?

এই পত্রখানি লিখিতে আজ এত বিলম্ব হইল কেন জানেন? আমি বোধ হয় খুব অপরাধ করিয়াছি, আপনি যদি নিকটে থাকিতেন তাহা হইলে বোধ হয় এত ভুল করিতাম না।

আমার ইচ্ছা হইল যে এই আলোকে বসিয়া আপনাকে পত্র লিখিব। মনে হইল এত স্পষ্ট আলোকে যদি পত্রই লিখিতে না পারিলাম তাহা হইলে ইহার মূল্য কি? আমার নিকট ঐ আলোকটি এতই স্পষ্ট ও পরিষ্কার ছিল যে সেই আলোকে বসিয়া মন্দিরের বর্ণনা সহ বিস্তারিত পত্র লিখিতে সাধ হইল। সেই জন্য পূর্ব্ব হইতেই দোয়াত কাগজ কলম লইয়া আসনে বসিলাম। সম্মুখে দৃশ্যপটে আলোক ফুটিয়া উঠিল—শব্দ ধীরে ধীরে মিশিয়া গেল, অর্থাৎ শব্দ যেন একেবারেই রহিল না। কেন? সেখানে শব্দ না থাকাটাই বেশী ভাল লাগে। এই সময় একটা প্রশ্ন করিয়া রাখিলাম—শব্দ, আলোক ও দৃশ্য এই তিনের মিলন হইলে কি হয়? জানিতে ইচ্ছা হয়। মাথা নীচু করিয়া যেই কলম তুলিয়া লিখিব অমনি ধীরে ধীরে আলোক অদৃশ্য হইয়া গেল। ইহা করা উচিত ছিল কি? বোধ হয় খুব ভুল করিলাম।

মার্চ্চ মাসের ১৪ই ও ১৫ই তারিখে আমি প্রতিদিন সাদা সিঁড়ির উপরে যাইয়া বসিতাম,—মন্দিরের সিঁড়ির ষ্টেপ প্রায় সাত আটটা হইবে। মন্দিরের চারিদিকে বড় বড় খাম, আর খাম্বার মাঝে মাঝে পদ্মফুলের পাঁপড়ী যুক্ত আছে এবং প্রত্যেকটি পাঁপড়ী যেন প্রদীপের ন্যায় জ্বলিতেছে। এই প্রকারে খামের চারিদিক আরতির প্রদীপের মত সাজান। মন্দিরের দরজায় বসিয়া কিছু দেখিতে পাইলাম না, মনে হইল যেন একটা সাদা পর্দা দিয়া ঢাকা আছে। ১৮ই মার্চ্চ তারিখে পর্দ্দার মধ্য হইতে ফাঁক হইয়া গেল। ঐ স্থান হইতে একটি অতি সুন্দরী ষোড়শী রমণী মূর্ত্তি অতি কোমল, করুণ ও স্নেহার্দ্র বচনে যেন আমাকে বলিলেন,

"ভিতরে এসো।" আমি কলের পুতুলের মত ভিতরে গিয়া দেখি মাথার উপরে অতি সুন্দর চন্দ্রাতপ, তাহার চারিধারে ফুল-দেওয়া ঝালর। দেখিতে এই প্রকার—ᨓᨓᨓᨓᨓᨓᨓᨓ। মধ্যখানে একটি খুব বড় লাল পদ্ম। মেজেটি স্ফটিকের দ্বারা নির্ম্মিত—ঝক্ ঝক্ করিতেছে। আমি আদেশ পাইয়া সেখানে গিয়া বসিলাম। অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলাম, তাই মেজেতে গড়াইয়া পড়িলাম। মাথার শিয়রে তিনি (দেবী) আসিয়া বসিলেন ও আমার মাথা তাঁহার কোলের উপর রাখিয়া আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আর সকলে কে কোথায় ?" উঃ—"সকলের সহিতই সাক্ষাৎ হইবে।" আবার প্রশ্ন করিলাম, "বাবা কখন আসিবেন ?" উঃ—"বাবা এখানে আসিবেন না।" আমি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে কি তাঁহার দর্শন এখানে কোনদিন হইবে না ?" উঃ—"না, কখনই না। তিনি এখানে আসিবেন না। তাঁহার দর্শন পাইতে হইলে অনেক দূর যাইতে হইবে, এত উতলা ও ব্যস্ত হইলে চলিবে কেন। স্থির হও, শান্ত হও, ক্রমশঃ সমস্ত হইবে। তাঁহাকে দর্শন করিতে হইলে এত চঞ্চল হইলে চলিবে না। এখানে স্থিরভাবে কিছুদিন থাকিবার পর সেই স্থান অতি সুগম হইবে। তখন অতি দূর পথ—অতি নিকট হইয়া যাইবে। কিন্তু এখনই তাঁহার দর্শন এখানে পাইবে না। তবে তাঁহার দর্শনের পথ এই—এই পথে ক্রমশঃ স্থির হইতে পারিলে ঐ অখণ্ড মণ্ডলাকার রাজ্যে গিয়া পড়িবে।" এই বলিয়া তিনি সম্মুখে একটি খুব বড় মণ্ডলাকার আলোকের প্রকাশ দেখাইয়া বলিলেন, "উহা ভেদ

করিয়া আরও দূরে গিয়া বাবার রাজ্য পাইবে। সে অনেক দিনের কথা—এখন স্থির হও, শান্ত হও।" এই বলিয়া তিনি আমাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি যতই চেষ্টা করিতে লাগিলেন আমি ততই উতলা ও ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িলাম। দেবীকে বলিলাম, "যখন এখানে বাবার দর্শন পাইব না তখন আর এখানে থাকিয়া কি করিব? চলিলাম।" বলিতেই যেন তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আবার পথে আসিলাম। দেখিলাম সেই আলোকের পথের দুইধারে আরও কত লোক ছোট ছোট বেদীর উপর বসিয়া ধ্যানস্থ আছেন। এক একটি বেদী দেখিতে এক একটি পদ্মফুলের মত মনে হইতেছিল। তাঁহাদের দেখিয়া মনে হইল যেন ইঁহারা সকলেই বাবার দর্শনের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। আমি যদি খুব বেশীক্ষণ ধরিয়া থাকিতাম তাহা হইলে খুব ভাল হইত, শেষ কালে যেন আমার একটু পরিতাপ হইতে লাগিল। ক্রিয়া পাইবার পর হইতে এই ভুল আমি প্রায়ই করিয়াছি—ক্রিয়া করিতে করিতে যখনই আনন্দের সময় আসিয়াছে, সংখ্যা শেষ হইল আর উঠিয়া পড়িলাম। আরও বসা উচিত।

১৯।২০ তারিখে আবার গেলাম। সিঁড়ির উপর গিয়া বসিব এমন সময় একটি দিব্য-পুরুষ অতি স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "ভিতরে যাও, মন্দিরে গিয়া মার নিকট স্থির হইয়া বস, সব মঙ্গল হইবে, উতলা হইও না।" আমি আমার স্বাভাবিক রুক্ষভাবে বলিলাম, "বাবার দর্শন যখন হইবে না তখন আমার এমন মন্দিরের প্রয়োজন নাই। বাবার দর্শনের জন্য আমি

এদিক্ ওদিক্ কতদিক্ গেলাম, সকলেই অনন্তকাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে বলে, আমার এত ধৈর্য্য নাই। বাবা আমাকে বলিয়াছিলেন, 'তীব্র ইচ্ছা হইলেই দর্শন পাইবে।' এখানে আপনারা সকলে বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, জানেন না কত কাল পড়িয়া থাকিতে হইবে। মার কবলে কত কাল থাকিব?" ইত্যাদি বহু কথা অভ্যাস মত বলিয়া ফেলিলাম। সঙ্গে সঙ্গে স্থির হইয়া থাকিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল। তর্ক যেন কোথায় বিলুপ্ত হইতে লাগিল। আহা! সেই মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া পড়িয়া থাকার মত সুখ কোথাও অনুভব করি নাই। কিন্তু কি যে ভুল সংস্কার! যেন থাকিতে দেয় না—মনে হয় এই আনন্দে ডুবিয়া গেলে আর ফিরিতে পারিব না। আমি ত এই শরীরেই একবার বাবার দর্শন চাই, নইলে জীবন পণ করিয়া রাখিয়াছি শেষ জীবনে আহার পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গার ধারে গিয়া পড়িয়া থাকিব। হয় বাবার দর্শন হউক নইলে এই শরীরের পতন হউক, ইহাই আমার সঙ্কল্প থাকিবে জীবনে অনেক বার পালাইয়াছি, এইবার আর ফিরিব না, এইবারই শেষ। বাবার দেহরক্ষার পর হইতে আমার মনের সঙ্কল্প এই রহিয়াছে যে আমি স্বর্গ চাই না, দিব্য জ্যোতি চাই না, আমি চাই একবার বাবার দর্শন। সে কবে হইবে জানি না।

ঐ দেব-কন্যাটির রক্তবসন পরণে ছিল, তিনি একটি পরিবেশ দ্বারা আবৃত ছিলেন অর্থাৎ তাঁহার চারিদিকে মণ্ডলাকার একটি Halo বা প্রভামণ্ডল ছিল। তার মধ্যে মুখখানা অতি কোমল ও অতি পরিচিত; যেন নূতন করিয়া অচেনাকে চিনাইয়া দেবার

প্রয়োজন নাই। কিন্তু ওখানে গিয়াও আমার এক-রোখা ভাব গেল না। আমি বহু দিন হইতে মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছি যে কখনও কোন দেবতা বা মহাপুরুষ আসিলে তাঁহাকে এই কথা বলিব যে, তিনি যেন দয়া করিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া বাবার নিকট চলেন, কারণ আমি জ্যোতি-দর্শনের আবেশের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে চাই না। সেখানে যে সব দেবতা বা ভক্তগণ ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া আছেন আমি তাঁহাদের সকলকেই এক বাক্যে এই কথা বলিতে চাই যে এখানে সকলে আবদ্ধ না থাকিয়া আমরা আরও এগিয়ে চলি। যখন আমরা সকলে বাবার দর্শনই চাই তখন এখানে বসিয়া থাকিয়া ফল কি? সকলকেই বলিব মনে করি, কিন্তু বলা হয় না। পরে অন্যান্য বিষয় লিখিব।

তৃতীয় পত্র

এই মাত্র আপনার পত্র পাইয়া একটা খুব বড় সন্দেহ ভঞ্জন হইল। দৃশ্যটির বর্ণনার সময় আমার বার বার মনে হইতেছিল যেন ইহা সেই 'হরিদ্বারের মহাপুরুষটি'র চক্রান্ত। তিনি বলিয়াছিলেন, "একদিন এইরূপ একটি রাজ্যে গিয়া সকলেই উপস্থিত হইব, যেখানে আর অপরিচিত বা ভেদাভেদ বলিয়া কিছুই থাকিবে না। সেখানে আমাকে ও অন্যান্য বহু লোককে (তাহাদের নাম করিলেন) সাক্ষাৎ করিতে পারিবে।" আমি দৃশ্য দেখিয়া মনে করিতেছিলাম যে, ইহা হয় তো ঐ মহাপুরুষের মায়াজাল। তিনি এই প্রকার একটা আশ্রম করিয়া আমাদের সকলকে আবদ্ধ করিয়া নিজে হয় তো মহাপ্রস্থান করিবেন। কেননা তাঁহার

কথায় মনে হইতেছিল যে, তিনি ঐরূপ একটা আশ্রম বা দিব্য জগতের আবিষ্কার করিবেন বা স্থাপনা করিবেন। আমার মনে এইরূপ একটা দ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু পরে জানিলাম যে ইহা বাবারই কৃপা।

মন্দিরটি পাহাড়ের নিকটস্থ নদীর ধারে বলিয়া মনে হয়। নদীতে জলের স্রোত ছিল, কিন্তু কুল কুল শব্দ ছিল না—যেমন পর্ব্বতের ক্রোড়ে নদীর প্রবাহের শব্দ হয় সেইরকম শব্দ ছিল না। অনেক গাছ ছিল, তার নীচে ছোট ছোট বেদী গোল-গোল পদ্মফুলের মত স্থাপিত ছিল। কতকগুলি শূন্য ছিল এবং কতকগুলির উপর সাধকেরা উপবিষ্ট ছিলেন। আমি যখন গেলাম তখন প্রথম দিন তাঁহারা সকলেই আহ্নিক সারিয়া আসিলেন। পরদিন যেন কতই ব্যস্ত, তাড়াতাড়ি আসনে গিয়া বসিবেন বা ধ্যানস্থ হইবেন বা নিজ আলয়ে ফিরিয়া যাইবেন এইরূপ একটা ভাব।

চতুর্থ পত্র

মন্দিরের চারিদিকে পাখী ছিল, কিন্তু পাখীর ডাকের শব্দ ছিল না। মানুষের শব্দহীন কথা বা ভাষা ছিল। তাকালেই যেন কথা হইয়া যাইত। যেন চোখে-চোখে কথা হইয়া যাইত, মনে হইত যেন কর্ণের কোন প্রয়োজন নাই। গাছের পাতা বায়ুতে নড়ে, কিন্তু পত পত শব্দে নাই। প্রথমে কেমন গভীর ঝিল্লী রব, তারপর সব কোথায় বিলুপ্ত হইয়া যেন এক নিস্তব্ধ ভাবে পূর্ণ হইয়া গেল। মনে হইল এটা যেন একটা শব্দহীন জগৎ। এইরূপ একটা বর্ণনা সেই হরিদ্বারের মহাপুরুষের নিকট শুনিয়াছিলাম।

তবে আমার ইচ্ছা মহাপুরুষের বর্ণিত কোন স্থান বা অবস্থাতে যাইব না, তাহাতে চিত্তে নিষ্ঠার অভাব বা ব্যভিচারের ভাব আসিতে পারে বলিয়া আশঙ্কা হয়। * *

পঞ্চম পত্র

আমার কাছে পঞ্জিকা নাই, ঠিক জানি না কবে একাদশী। আমাকে দেখিবামাত্র সাধুটি বলিলেন, "এই যে ভায়া, চল শীঘ্র চল। আজ একাদশী, মা আগে আগে গিয়াছেন, গঙ্গা পার হইতেছেন, এই সময় আমরা পিছু পিছু যাইব, তাহা হইলে বেশ আরামে পার হওয়া যাইবে।" এই বলিয়া তিনি আমার হাত ধরিলেন। আমরা গঙ্গার উপর দিয়া হাঁটিয়া পার হইলাম। পায়ের তলায় জল যেন বরফ-জমার মত শক্ত মনে হইল। পার হইয়া দেখিলাম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতের মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট গুহা অবস্থিত। তার মধ্যে এক একজন সাধু থাকিয়া তপস্যা করিবে এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। এখানে কিছুকাল বাবার সমস্ত শিষ্যকে আসিয়া থাকিতে হইবে, তারপর আবার অগ্রসর হইয়া যাইতে হইবে। আমার বেশ মনে আছে, আমি বলিলাম, "গুহার দরজা নাই, এমন খোলা স্থানে আহ্নিকের কার্য্য কি করিয়া হইবে ?" তখন সাধুটি বলিলেন, "সে সব ব্যবস্থা হইবে, চিন্তা নাই। এখানে খুব আনন্দ করা যাইবে।" আমরা ফিরিয়া আসিলাম। [এইটি ৩-৮-৪৫ এর ঘটনা]

ষষ্ঠ পত্র

একটি প্রশ্ন না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। জ্যোতিকে অনুসরণ করিতে করিতে শেষকালে উহা দৃশ্যে পরিণত হয়—শব্দ

যেন দৃশ্যের মধ্যেই মিলাইয়া যায়। কিন্তু যখন কেবল শব্দকে লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতে থাকি তখন কোন দৃশ্যও থাকে না আর শব্দও থাকে না, থাকে কেবল শূন্যময় জগৎ। এ অবস্থায় আনন্দ খুব বেশী মনে হয়। দৃশ্যে যেন অরুচি হইয়া আসিতেছে। এখানে কোন দৃশ্য নাই অথচ খুব বেশী স্ফুর্ত্তি ও প্রশান্ত ভাব। আমার প্রশ্ন এই—জ্যোতিকে লক্ষ্য করিয়া চলা প্রশস্ত না শব্দকে লক্ষ্য করিয়া চলা প্রশস্ত? আমার মনে হয় আরও বেশীক্ষণ অনবচ্ছিন্ন ভাবে স্রোতের টানে থাকিলে দুইটাই এক হইয়া যায়। কিন্তু ইহাতে সময় বেশী দিতে হয়।

সপ্তম পত্র

ইতিপূর্ব্বে একাদশীতে একখানা পত্র দিয়াছি, তাহাতে একটা ভুল বা রহস্য আছে বুঝিতে পারিলাম না। আজকের একাদশীতে বিশেষ করিয়া সাবধানে রাত্রি দেড়টার সময় আসনে বসিলাম। যে সাধুটি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, মা বাবার কাছে সঙ্গে করিয়া নিয়া যাইবেন, আজ তিনি নিজেই আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, "এই যে—ভায়া, গত বারে একাদশীতে আমি আসিতে পারি নাই। গঙ্গাতটে মহাযাত্রার সময় অতি নিকট। যে সমস্ত সাধু আজ হাজার হাজার বছর হইতে সাধনায় রত তাঁহারাও গঙ্গামুখী বা তটের নিকটস্থ হইতে পারেন নাই। কয়েক লক্ষ সাধুর মধ্যে মাত্র কিছু লোককে মা সঙ্গে করিয়া নিয়া যাইবেন। গঙ্গা নদী পার হইয়া আরও অনেক উচ্চে বাবার স্থান। তাকে যদি কৈলাস বলি তাহাও ঠিক বলা হয় না। ঐস্থান কৈলাস

অপেক্ষা অনেক উচ্চ ও অনেক বড় । আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "গতবারে যে নদী পার হইলাম সেটা কি গঙ্গা নদী নয় ?" উত্তর —"কত শত নদী পাবে, তার কোনটাই গঙ্গা নদী নয়। এখানে অনেক সাধুর এই ভ্রম আছে যে তাঁহারা মনে করেন এই ছোট ছোট নদীই গঙ্গা। শাখা-প্রশাখা কত দেখিবে, তার কোনটিই গঙ্গা নয়, সব ছায়াচিত্র বা স্বপ্নবৎ। ঐগুলি আজ আছে, কাল নাই। এখানকার কোন দৃশ্য স্থায়ী নয়, এখানে আত্মস্থ হইয়া বসিলে সব প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে। সমস্ত জগৎ স্বপ্নবৎ, ঠিক জলের বুদ্বুদের ন্যায়। এই প্রকার দৃশ্য কিছুদিন দেখিতে দেখিতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, এই ছায়াবাজী ছাড়া একটি মহাসত্য আছে, যাহার কোন পরিবর্ত্তন নাই। তবে এখানে বসিয়া ঠিক এখানকার মত হইয়া ডুবিয়া থাকিতে হইবে। যখন মন প্রাণ বেশ ডুবিয়া যাইবে, তন্ময় হইয়া যাইবে, তখন আরও অগ্রসর হইবার অবসর হইবে। সেই অবসরে মা নিজে সঙ্গে করিয়া নিয়া যাইবেন। মাকে ছেড়ে এক পা অগ্রসর হইতে পারে মানুষের এতটুকু শক্তি নাই। কত লোক লক্ষ লক্ষ যুগ তপস্যা করিয়াও এক পা অগ্রসর হইতে পারে নাই। যুগ-যুগান্তর হইতে বিরাট্ পর্ব্বতের প্রস্তরের ন্যায় কোটি কোটি সাধু অচল অটল ভাবে এই নদীর তটে যোগাসনে বসিয়া আছেন, সকলেই মার ক্ষণিক কৃপার প্রার্থী। আমাদের কত বড় সৌভাগ্য যে সেই কঠোর তপস্যা হইতে আমরা রক্ষা পাইয়াছি। আমরা বাবার কৃপায় ও মার অনুকম্পায় কঠোর তপস্যার দুর্গম পথ যে এত সুগম হইতে পারে তাহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। এখানে কিছুই বলিবার নাই, কেবল

চুপ করিয়া কৃতার্থ হইয়া গদ্‌গদ চিত্তে অশ্রু বর্ষণ কর, কত জন্মের কত অসৎ কর্ম্ম কোথায় কে চকিতে ধ্বংস করিয়া আমাদিগকে বুকে করিয়া নিয়া চলিয়াছে। বিশ্বাস কর বা না কর, কর্ম্ম কর আর না কর, অনুকম্পা হইতে আমরা কেহই বঞ্চিত হইব না। এত বড় আশ্বাস আর কোথায় পাইব? যুগ যুগ ধরিয়া যে সকল যোগী কঠোর তপস্যা করিতেছেন, তাঁহাদের অবস্থা যখন বিচার করি তখন মনে হয় ইঁহারা অসীম শক্তি-সম্পন্ন হইয়াও ঐ মায়ের এতটুকু কৃপার ভিখারী হইয়া এখানে এদিক্ ওদিক্ পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠে—তবে কি এই সব তপস্যা সবই বৃথা! উত্তর—না। এই সমস্ত যোগী নিজের আত্মকর্ম্ম দ্বারা নিজের দুষ্কর্ম্মগুলি কঠোর তপস্যা বলে ধ্বংস করিয়া জীবের পথ পরিষ্কার করিতেছেন। ভাবিয়া দেখ কাদের কর্ম্মফলে আমাদের দুষ্কর্ম্ম কুকর্ম্ম ধ্বংস হইয়া গিয়াছে এবং আমরা মায়ের কোল প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সকল সাধুদের তপস্যার ফলেই উহা সম্ভব হইয়াছে। ইঁহারা কেহই আমাদিগকে সঙ্গে না নিয়া অগ্রসর হইতে চান না। মা যেন সারথি, এই সাধুরা যেন অশ্ব আর আমরা যেন রথের উপর বসিয়া বসিয়া আনন্দ করিয়া দৃশ্য দেখিতেছি।”

এই প্রকার অনেক কথা হইল, তখন রাত্রি তিনটা, আমি বিশ্রাম করিতে চলিলাম। বেশীক্ষণ আসনে বসিতে পারি নাই। অতি অল্প ক্ষণেই অনেক কথা শুনিলাম। নিকটে পঞ্জিকা না থাকায় একাদশী কবে আমি জানিতাম না। গতবারে সাধুটি যখন বলিলেন “আজ একাদশী, চল গঙ্গা পার হই, মা আগে

আগে গিয়াছেন।” পরদিন পঞ্জিকা দেখিয়া জানিলাম যে, ঠিক সেই সময় সত্যই একাদশী ছিল। সাধুর কথা সত্য হওয়াতে দৃশ্যগুলির উপর আমার কিছু শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। কিন্তু ওটা যে গঙ্গা নদী নয় সে রহস্যটা পরে খুলিয়াছিল।

(৩)

আমার বক্তব্য

উপরি লিখিত পত্রগুলিতে পত্র-লেখকের যে অনুভূতি আলোচিত হইয়াছে তাহা কর্ম্মী যোগীর পরিচিত সাধারণ অনুভূতি। অবশ্য গুরু কৃপা ব্যতীত সকলের মধ্যে এই অনুভূতির উদয় হয় না। এই অনুভূতি সম্বন্ধে ব্যক্তিগত প্রশ্ন পরিহার করিয়া সাধারণ ভাবে কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

শব্দ, জ্যোতি এবং রূপ—যোগ-পথে এই তিনটির মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। শব্দ প্রথমে গুরুদত্ত মন্ত্ররূপে অথবা অন্য কোন প্রকারে নিজের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। ইহা বস্তুতঃ শব্দমাতৃকা কুণ্ডলিনী-শক্তিরই একটি উচ্ছ্বাস। গুরু-সঞ্চারিত জাগ্রৎ শক্তির প্রভাবেই হউক, অথবা অন্তরুদ্বুদ্ধ আত্ম-শক্তির প্রভাবেই হউক, শব্দ নাদরূপে সাধকের দেহকে আশ্রয় করিয়া সুষুম্না-মার্গে নিরন্তর ধ্বনিত হইতে থাকে। এই শব্দ বস্তুতঃ জাগ্রৎ চৈতন্যেরই নামান্তর। প্রকৃত প্রস্তাবে শব্দ ও জ্যোতিঃ অভিন্ন বস্তু। বাচক অধ্বাতে যাহা শব্দরূপে প্রকট হয় বাচ্য অধ্বাতে উহাই জ্যোতীরূপে আত্মপ্রকাশ করে। শব্দ মায়াবদ্ধ জীবের নিকট বিচ্ছিন্ন বর্ণের সমষ্টিভূত পদ বাক্য প্রভৃতি রূপে

অভিব্যক্ত হয়। এই সকল বিচ্ছিন্ন বর্ণ ভৌতিক আকাশের গুণ স্বরূপ। এইগুলি পরস্পর মিলিত হইয়া যে পদ ও বাক্য রচনা করে তাহা আমাদের চিন্তাময় মনোভূমির পুষ্টিকারক। অশুদ্ধ বিকল্প-জ্ঞান এই মায়িক শব্দ হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকে! বিশুদ্ধ নির্ব্বিকল্প জ্ঞান পাইতে হইলে এই চিন্তাময় শব্দ-রাজ্য অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধে উত্থিত হওয়া আবশ্যক। সেইজন্য বর্ণাত্মক শব্দকে পদ বাক্যাদি রূপে পরিণত না করিয়া বিপরীত ক্রমে ধ্বনিরূপে পরিণত করা আবশ্যক। ইহার ফলে বর্ণাত্মক শব্দ সুষুম্নাবাহী নাদরূপে আত্মপ্রকাশ করে। তখন বৈখরী বাক্ স্বভাবতঃই মধ্যমা বাক্‌রূপে পরিণত হয়। পুনঃ পুনঃ মন্ত্র-জপের ফলে অথবা নিরবচ্ছিন্ন নাম-কীর্ত্তনের প্রভাবে সহজে এই অবস্থায় উপনীত হওয়া সম্ভবপর। চক্ষু নিমীলিত করিলে ভিতরে যে অন্ধকার দৃষ্টিগোচর হয় তাহাই অজ্ঞানের অন্ধকার জানিতে হইবে। নাদের ক্রম-বিকাশের ফলে এই অন্ধকার ক্রমশঃ অপসারিত হয়। তখন চক্ষু মুদ্রিত করিলেও ভিতরে স্বচ্ছ প্রকাশ নির্ম্মল শুভ্র আকাশের ন্যায় স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা নাদের তীব্র শক্তিতে ঘটিয়া থাকে। এই অবস্থায় ভিতরের প্রকাশ ভিতরেই অবরুদ্ধ থাকে। বাহিরে তাহার সমাগম হওয়ায় অন্তর্দৃষ্টির সম্মুখে একটি বিরাট্ জ্যোতির্ম্ময় আকাশ ফুটিয়া উঠে। কিন্তু বহির্দৃষ্টির সম্মুখে উহার কোন প্রভাব পড়ে না। বাহ্যজগতে আলো ও অন্ধকার পূর্ব্বের ন্যায় আবর্ত্তিত হইতে থাকে, কিন্তু অন্তর্জ্জগতে অনন্ত প্রকাশ খুলিয়া যায়। নাদের ক্রমিক অভিব্যক্তির ফলে কাহারও কাহারও সাময়িক ভাবে ঐ জ্যোতি বাহিরেও ফুটিয়া

উঠে। বস্তুতঃ তখন বাহ্য জগতের সত্তা উহা দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া যায়। ঐ সময়ে চারিদিকে অর্থাৎ বাহ্য দৃষ্টির ক্ষেত্রে সর্ব্বত্র বিশাল জ্যোতি প্রসারিত হয়। এই জ্যোতি বস্তুতঃ ঐ নাদেরই স্ফুরণের ফলে দৃষ্টিগোচব হয়।

নাদ হইতে যেমন জ্যোতির অভিব্যক্তি হয় তেমনি জ্যোতি হইতে রূপের অভিব্যক্তি হয়। বস্তুতঃ নাদ হইতে জ্যোতি হয় না, কিন্তু বিন্দুরূপা মহামায়া বা কুণ্ডলিনী ক্ষুব্ধ হইয়া একদিকে নাদরূপে ও অপরদিকে জ্যোতীরূপে আত্মপ্রকাশ করে। জ্যোতির ঘনীভূত পরিপক্ক অবস্থাতে রূপ ফুটিয়া উঠে, কিন্তু ইহা এক দেশেই হইয়া থাকে। বিশাল সমুদ্রের ক্ষুদ্র এক প্রান্তে যেমন বরফের পাহাড় রচিত হয় এবং ঐ পাহাড় সমুদ্রের বক্ষঃস্থলে এক প্রান্তে ভাসমান থাকে, তদ্রূপ বিশাল জ্যোতিঃপুঞ্জের কিছু অংশে রূপ আবির্ভূত হইয়া ঐ জ্যোতি দ্বারা বেষ্টিত হইয়াই প্রতিভাসমান হয়। তবে দ্রষ্টা যখন ঐ রূপের সহিত ব্যবহার মূলক সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয় তখন রূপ স্বাভাবিক প্রতীয়মান হয় এবং ব্যাপক জ্যোতি দেখা যায় না। রূপবান্ দ্রষ্টা ও রূপবান্ দৃশ্য একই স্তরের হইলে জ্যোতির দর্শন থাকে না। নতুবা রূপটি নিম্নভূমির দ্রষ্টার নিকট জ্যোতির্বেষ্টিতরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে।

রূপ বলিতে শুধু মূর্ত্তি বুঝায় না, যে কোন সাকার দৃশ্য বস্তুই রূপের অন্তর্গত, অর্থাৎ অনন্ত বৈচিত্র্যময় সাকার বিশ্বরূপ শব্দের বাচ্য অর্থ। জ্যোতি ও রূপ অভিন্ন হইলেও জ্যোতিকে অবলম্বন করিয়া উহারই ঘনীভূত অংশ রূপের আকারে অর্থাৎ সাকার

দৃশ্যের আকারে ঐ জ্যোতির মধ্যেই প্রকাশিত হয়। বৃক্ষ লতা পশু পক্ষী মনুষ্য দেব দানব নদ নদী পাহাড় পর্ব্বত সমুদ্র কুঞ্জ প্রভৃতি অনন্ত আকারে জ্যোতিই দৃশ্য ভাব ধারণ পূর্ব্বক প্রকাশিত হয়। দেশ ও কাল বস্তুতঃ জ্যোতি হইতে ভিন্ন নয় বলিয়া ঐ সময়ে উহারাও নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া জ্যোতির মধ্যেই নিজেকে প্রকাশ করে। সেই জন্য সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বের অর্থাৎ সুদূর অতীতের প্রকাশও বর্ত্তমান রূপে ঐ জ্যোতির মধ্যেই হইয়া থাকে। তদ্রূপ বহু দূরের দৃশ্যও সন্নিহিত রূপে উহাতে প্রকাশমান হয়। দেশগত ব্যবধান এক হিসাবে থাকে না, কারণ ব্যবধান-নিবন্ধন দৃশ্যের যে সঙ্কুচিত ভাবে দর্শন স্থূল জগতে ঘটিয়া থাকে ঐ জ্যোতিতে দর্শন কালে সে সঙ্কুচিত ভাব মোটেই থাকে না। সুতরাং দূরত্ব এক হিসাবে থাকে না বলা অসঙ্গত নহে। পক্ষান্তরে যোগীর কর্ম্মগত অপূর্ণতা থাকিলে এই অব্যবধানের মধ্যেও একটা দুর্ভেদ্য আড়াল থাকিয়া যায়। সেইজন্য দৃশ্য বস্তু সুস্পষ্টভাবে অতি সন্নিহিত প্রতীত হইলেও এবং তাহা স্পর্শযোগ্য হইলেও দ্রষ্টা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। দর্পণস্থ প্রতিবিম্ব যেমন সম্মুখে দৃষ্ট হইলেও তাহাকে স্পর্শ করা যায় না তদ্রূপ ঐ দৃশ্যও সুস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইলেও উহা স্পর্শের অগোচর। কর্ম্ম পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত দর্শন ও স্পর্শন যুগপৎ হইতে পারে না। অপূর্ণ কর্ম্ম পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত এই রূপই ঘটিয়া থাকে।

শুষ্ক জ্ঞান ও দিব্য জ্ঞানের সম্বন্ধে আমি স্থানান্তরে আলোচনা করিব। সংক্ষেপে এখানে ইহাই বলিলে পর্য্যাপ্ত হইবে যে শুষ্ক-জ্ঞানের প্রভাবে নিষ্ক্রিয় স্থিতি জন্মে, কিন্তু জ্ঞানের সহিত ক্রিয়ার

যোগ থাকিলে ঐ শুষ্ক জ্ঞান আর শুষ্ক জ্ঞান থাকে না, উহা দিব্য জ্ঞানে পরিণত হয়। শুষ্ক জ্ঞানে বৈচিত্র্য দর্শন হয় না, কিন্তু অখণ্ড জ্যোতিতে স্থিতি হয়। ঐ জ্যোতির অন্তর্নিহিত অনন্ত বৈচিত্র্য যে ফুটে না জ্ঞানের সহিত কর্ম্মের সম্বন্ধের অভাবই উহার একমাত্র কারণ, তাই ঐ জ্ঞান জ্ঞান-শক্তি নহে। জ্ঞান-শক্তির সহিত ক্রিয়া-শক্তির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। তাই জ্ঞান অনন্ত দূর প্রসারিত জ্যোতীরূপে প্রকাশমান হইলেও ক্রিয়ার তারতম্য অনুসারে প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ দেশগত ও কালগত ব্যবধান ক্রিয়ার পূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে অস্তমিত হইয়া যায়। তখন জ্ঞান ও ক্রিয়া সম-সূত্রে অভিন্ন হয় বলিয়া প্রাপ্তিও পূর্ণভাবে ঘটিয়া থাকে। এ বিষয়ে দিব্যজ্ঞানের আলোচনা প্রসঙ্গে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল।

মা ও গুরু স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও মাকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে আশ্রয় না করিয়া গুরুকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কৃপা এবং কৃপাশূন্য পুরুষকার, উভয় পথে পার্থক্য থাকিলেও এই অংশে সাদৃশ্য আছে। তবে কৃপাপথে মা পথ-প্রদর্শিকা রূপে অগ্রগমন করেন এবং কৃপাশূন্য পথে মা সন্তানের অনুগমন করেন। তিনি পশ্চাতে থাকিয়া সন্তানকে রক্ষা করিতে করিতে গুরুর নিকট উপস্থিত হওয়া পর্য্যন্ত সন্তানের অনুগমন করেন। উভয় পথেই পর্য্যবসানে মা ও সন্তান অভিন্ন হইয়া গুরুতে আত্ম-সমর্পণ করেন। তখন গুরুর মহাকৃপার সঞ্চার হইলে আত্মজ্ঞানের উদয় হয়, যাহার ফলে গুরু আর গুরু থাকেন না। একমাত্র আত্মাই তখন পরম স্বরূপে অখণ্ড সত্তা লইয়া বিরাজ করে।

সন্তানের অর্থাৎ যোগীর নিজ স্বরূপ, ইহা মায়ের নিজ স্বরূপ এবং ইহা গুরুরও নিজ স্বরূপ—ইহারই নাম স্বয়ং রূপ।

পত্র-লেখক মাতৃ-ভূমি হইতে গুরু স্থানে যাওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি নিজের দৃষ্টিকোণ হইতে যে দর্শন লাভ করিয়াছেন তাহাতে বলিবার কিছুই নাই, কারণ তাহা সত্য। ইহা খুবই সত্য যে গুরুর জন্য তীব্র ব্যাকুলতা জাগিলে যে কোন স্থিতিতেই গুরু-দর্শন হইতে পারে। তবে নিজের যোগ্যতা অর্জ্জিত না হইলে গুরুর স্বরূপে স্থিতিলাভ সুকঠিন। মায়ের রাজ্যে আনন্দময় স্বরূপে দীর্ঘকাল থাকিতে পারিলে মায়ের কৃপায় অন্তরের পুষ্টি ও বলাধান সম্পন্ন হয় বলিয়া মাতৃ-ভূমি হইতে গুরু-ভূমিতে মাই অগ্রগতি ঘটাইয়া দেন। তবে ইহাও সত্য যে আনন্দে আত্মবিস্মৃত হইয়া গেলে ঐ আনন্দ-ভূমিতেই সুদীর্ঘ কাল আবদ্ধ হইয়া থাকার আশঙ্কা রহিয়াছে। মনে রাখিতে হইবে ইহাও এক প্রকার মোহ। ইহা কাটাইতে না পারিলে চিরচৈতন্যময় গুরু-ভূমিতে জাগরণ ঘটে না।

পত্র-লেখক জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—শব্দের অনুসরণ ও জ্যোতির অনুসরণ এই উভয়ের মধ্যে ফলগত তারতম্য আছে কিনা। ইহার একদিক্ হইতে সমাধান তিনি নিজেই করিয়াছেন। জ্যোতির অনুসরণ করিতে করিতে রূপময় দৃশ্য জগৎ ফুটিয়া উঠে। ইহার মূলে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ইচ্ছাশক্তির খেলা রহিয়াছে, কারণ ইচ্ছা-বিবর্জ্জিত হইয়া পরম জ্যোতিতে প্রবেশ করিলে সেখান হইতে আর ব্যুত্থান হয় না। তাই রূপময় দৃশ্য জগৎ ফুটিবার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু ইচ্ছা-শক্তির প্রভাবে

জ্যোতিতে স্থিতি হয় না, অর্থাৎ স্থিতির মধ্যেও গতির প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এই গতির ফলে স্তরের পর স্তর ভাসিয়া উঠে এবং সেই সকল অতিক্রম করিয়া মাহানুগ্রহের ফলে পূর্ণ স্বরূপে অধিরূঢ় হওয়া সম্ভবপর হয়। লীলার মূল ইচ্ছা, তাই ইচ্ছা বীজরূপে থাকিলে জ্যোতির মধ্য হইতে রূপ আপনিই ফুটিয়া উঠে। পক্ষান্তরে শব্দকে অনুসরণ করিলে এবং জ্যোতির দিকে লক্ষ্য না দিলে ঐ শব্দ ক্রমশঃ পুষ্ট হইয়াই হউক অথবা ক্ষীণ হইয়াই হউক, শব্দাতীত পরব্যোমে লীন হইয়া যায়। ইহা আনন্দের পরিপূর্ণ স্বরূপ, যে আনন্দে লীলারস না থাকিলেও মহাশান্তির স্নিগ্ধ ও সুশীতল প্রভাব অনুভূত হয়। তবে ইহা সত্য যে পূর্ণ বিকাশের ফলে শেষে দুইটি ধারাই এক সঙ্গে মিলিত হইয়া যায়। এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

পত্র-লেখক যে "হরিদ্বারের সাধুর" কথা উল্লেখ করিয়াছেন তিনি একজন অলৌকিক মহাপুরুষ। লছমনঝোলা হইতেও কিঞ্চিৎ উত্তরে মহানিশার সময়ে গঙ্গাবক্ষে লেখক উঁহার দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। উঁহার সঙ্গে পত্র-লেখকের বহু বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। সে এক অপূর্ব্ব ব্যাপার। কিন্তু এখানে উঁহার চর্চ্চা অপ্রাসঙ্গিক।

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

জীবন সমস্যা সমাধান—শ্রীশ্রীগুরু

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ইং ১৯১২ সালে যখন কাপালিকেরা আমাকে বলি দিবার জন্য বিন্ধ্যাচলে লইয়া যায় তখন শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপাতেই রক্ষা পাই। কিন্তু তাহা তখন জানিতাম না—জানিতে পারিলাম অনেক পরে। সে সমস্ত বিস্তারিত ঘটনা সম্ভবপর হইলে বারান্তরে উল্লেখ করিতে চেষ্টা করিব। এখন আমার আন্তরিক বেগ ও ক্রন্দনের রোল স্মরণ-পথে উদয় হইতেছে। সে সময় মুক্ত হইবার পর বুকের মধ্যে কি যেন আলোড়ন করিত, মোচড় দিত, ছিন্ন ভিন্ন করিয়া খান খান করিয়া বিচ্ছুরিত হইতে চাহিত, কিন্তু পারিত না। তাই কি এত ক্রন্দন?

কি যেন ছিল,—কি যেন হারাইয়াছি! জানি না কি খুঁজিতেছি! পাই নাই বলিয়া কি এত ক্রন্দন!

কি যেন একটা অজানা আসন্ন বিপদ সদা সর্ব্বদা হুঙ্কার দিতেছে, প্রাণ ভয়-ভীত, তাই কি এত ক্রন্দন!

নীরব ক্রন্দন কেন? ক্রন্দনের শব্দ কোথায়? অশ্রু কোথায়? চোখে জল নাই কেন? জল থাকিলে যেন শান্তি পাইতাম। জল নাই বলিয়া কি এত ক্রন্দন!

রুদ্ধ-অশ্রু বুক-ফাটা আকুল ক্রন্দন কি এই? এত হাহাকার কেন? কাকে পাবার জন্য এত ক্রন্দন? কি করিব? কি করিলে এই ক্রন্দনের শান্তি হয়? এটা কি সত্যই ক্রন্দন?

না অন্য কিছু ? যদি ঠিক ক্রন্দনই হইত তাহা হইলে ঈপ্সিত ধনকে তৎক্ষণাৎ পাইতাম, আমার হারাধনকে বুকে করিয়া জড়াইয়া রাখিতাম! কি চান বলিতে পারি না। যদি সত্যই বলিতে পারিতাম তাহা হইলে হয়ত এত জ্বালা সহিতে হইত না। তা ত জানি না। কেহ বলিয়া দিবে কি ? আমার গভীর অন্ধকারে কে প্রদীপ জ্বালিয়া দিবে ? কে বলিয়া দিবে আমি কাহাকে হারাইয়াছি আর কাহাক পাইলে আমার জীবন-সমস্যার সমাধান হইতে পারে ?

সাধু ও কাপালিকের দল হইতে মুক্তি পাইয়া চারিদিক ঘুরিতেছি এমন সময় একদিন বৈকালে দেখি আমার একটি সহপাঠী গীতা হাতে করিয়া হন হন করিয়া কোন গন্তব্য স্থানে ছুটিয়া যাইতেছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। কিন্তু সে কিছু বলিতে চাহিল না। আমি তার পিছু ধরিলাম, সে নিরুপায় হইয়া আমাকে লইয়া চলিল। একটি ক্ষুদ্র গলির ভিতর দিয়া একটি ক্ষুদ্র মাঠে গিয়া পড়িলাম। জিজ্ঞাসা করায় বুঝিলাম যে আজ ওখানে একটি মরাল ক্লাস হইবে, সেখানে ছোট ছোট বক্তৃতা ও গীতা পাঠ হইবে। গীতার কথায় আমাকে আকৃষ্ট করিল, অথচ গীতা যে কি তা জানি না।

একজন সদস্য 'স্বামীজী বলিতেন' বলিয়া ইংরাজীতে বলিতে আরম্ভ করিলেন—"True religion will give us faith in ourselves, a national self-respect and the power to feed and educate the poor and relieve the misery around us. If you want to find

God, serve man ! এই lecture শুনিয়া পুস্তক পড়িতে আরম্ভ করিলাম। হাঁসপাতালে ও রাম-কৃষ্ণ আশ্রমে কত লোক রোগীর সেবা করিতেছে, কই তাদের মধ্যে এমন কাহাকেও দেখিলাম না যে আত্মোন্নতির বিষয় আলোচনা করিতেছে। কোথাও সাড়া নাই, অনুভূতি নাই। আজ দ্বিতীয় একটি বিবেকানন্দের সৃষ্টি হইতেছে না কেন? স্বয়ং বিবেকানন্দ কয়জনের সেবা করিয়া তাহাদের দুঃখ ঘুচাইতে পারিয়াছিলেন? কি ভাবে সেবা করিলে ভগবৎ-প্রাপ্তি হইতে পারে এই কৌতুহল মিটাইবার জন্য তাঁহার রাজযোগ, ভক্তিযোগ ও অন্যান্য গ্রন্থ পড়িয়া তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া নিরাশ হইয়া নীরবে ভাবিতে লাগিলাম, এই লইয়াই কি বেশ পরমানন্দে দিন অতিবাহিত করা চলে? অবশেষে বুঝিলাম যে ধর্ম্ম-আলোচনা মুখ্য নয়, ইহার পশ্চাতে আর কিছু গুপ্ত ব্যাপার আছে। সেটা হইল রাজনৈতিক বিপ্লব-দল সৃষ্টি করা।

আমি মাতিয়া গেলাম, ** দা ও ** দাকে পাইয়া মনে হইল যেন দ্বিতীয় স্বামীজী পাইলাম। আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া দেশের কাজে জুটিয়া গেলাম,—সেবা-সমিতির কাজ কাশীতে খুব জোরে চলিতে লাগিল। মনে হইল যেন শীঘ্র ভারত স্বাধীন হইয়া যাইবে, আর দেশের দুঃখ ঘুচিয়া যাইবে। যদি মানুষের দুঃখ এই ভাবে কাজ করিলে ঘুচিয়া যাইত তাহা হইলে এত দিনে কত লোকের দুঃখ ঘুচিয়া যাইত। এই কি প্রকৃত সেবা? দুঃখ যে কাহারও ঘুচিয়াছে তাহা ত মনে হয় না। সেই দুঃখ কি করিয়া ঘোচে? তাহার প্রকৃত উপায় জানা চাই। কেবল রোগের ঔষধ

দিলেই দুঃখ ঘোচে না। দুঃখ ঘোচাবার শক্তি কোথায়? নিজের দুঃখ যার ঘোচে নাই, সে পরের দুঃখ কি করিয়া ঘুচাইবে? প্রথমে কেহ নিজের দুঃখ ঘুচাইতে পারিলে তবে সে পরের দুঃখ কিছু অনুভব করিতে পারে, তাহাও কাল্পনিক, তবে কিছু ঘুচাইবার পথ বলিতে পারে, এমন কি নিজের শক্তি-বলে অপরের দুঃখ সাময়িক ভাবে ঘুচাইতে সক্ষম হয়। কাহারও রোগের কষ্ট হইলে মানুষ কি তার ব্যথা এতটুকু অনুভব করিতে পারে? যার এতটুকু পরের দুঃখ অনুভব করিবার শক্তি নাই, সে তার বিরাট্ দুঃখের বোঝা কি করিয়া সরাইবে? বাতুলতা নয় কি? ভ্রম! কেবল ভ্রম! সামান্য ঔষধ দিয়া, অর্থ দান করিয়া, লোকে মনে করে যে দরিদ্র-নারায়ণের সেবা হইয়া গেল। এ প্রকার সেবা কোন না কোন আকারে হাজার হাজার বৎসর অবধি চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু অন্তর্দাহ, মর্ম্মান্তিক ব্যথা এতটুকু কমে নাই, বরং দিনের পর দিন বৃদ্ধির দিকেই চলিয়াছে।

এখন প্রকৃত শিক্ষা চাই। আসল বস্তু পাওয়ার দিকে কতটা অগ্রসর হইলাম, তাহা ভাবিয়াছি কি? কত লোকে অশিক্ষায় জীবনে কত দুঃখ পায়, আবার কেহ অশিক্ষায়ও না জানি কি পাইয়া কত আনন্দে থাকে। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য—সেই আসল বস্তু পাওয়া। এই পাওয়া না পাওয়ার উপরেই সমস্ত নির্ভর করে। এইটাই হইল কষ্টিপাথর। এইটা দেখে বোঝা যায়, কে শিক্ষিত বা অশিক্ষিত।

সেই আসল বস্তুটি কি? তাহার কোনও অস্তিত্ব আছে কি? জগতে কেহ উহা পেয়েছে কি? যদি থাকে তো কি করিয়া

উহা পাওয়া যায়? ইহাই মুখ্য প্রশ্ন। কেবল ফাঁকা কথার উপর জীবনটা ফেলিয়া দেওয়া যায় না। সব ছাড়িয়া তার পিছনে ছুটিতে তখন পারা যায়—যখন তার সাড়া একটুকু পাওয়া যায়।

যখন আসল বস্তু থাকা আর না থাকার প্রশ্ন উঠিতেছে তখন পাবার কথা তো উঠিতেই পারে না। প্রথমে ভাল করিয়া বিচার করিয়া জানা চাই, কিছু আছে কি না—আছে বলিয়া বিশ্বাস হওয়া চাই—তখন পাওয়ার প্রশ্ন উঠিতে পারে। যদি না থাকে তো খুঁজিবার চেষ্টা ত হইতেই পারে না। আর যদি থাকে তো প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ করিয়া খুঁজিতে, সাধন করিতে, তপস্যা করিতে প্রেরণা আসিবে। "কি করিয়া খুঁজিতে হয়" এইটুকু জানাকেই শিক্ষা বলে। এই প্রকার-শিক্ষা প্রাপ্তির উপায় কে বলিয়া দিবে? কোন পুস্তকে ইহা আছে কি? কোনও সাধু কোথাও আছেন কি যিনি এ বিষয়ে কিছু বলিতে পারেন? এ বিষয়ের মীমাংসা ওখানে পাইলাম না—পাওয়ার মধ্যে ঝড়-ঝাপ্টার তরঙ্গ আসিয়া তোলপাড় করিয়া গেল।

তারপর জেলে ও অন্তরীণ অবস্থায় পাঁচ হইতে ছয় বৎসর কাটাইয়া ফিরিয়া আসিয়া মন-মরিয়া হইয়া নির্জ্জনে ও নিভৃতে সময় কাটাইতে লাগিলাম। এমন সময় * * * এর সহিত দেখা—তাঁহাকে মনের কথা বলিয়া বুকটা যেন হাল্কা হইল। আমেরিকা যাইয়া কিছু শিক্ষা করিব ভাবিতেছিলাম—তার জন্য কিছু lecture সংগ্রহ করিতে হইবে এবং পাথেয়ও প্রয়োজন। যোগ সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন করিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ও সব

বিষয় আমার কাছে কিছু পাবে না। গোপীদার কাছে যাও। তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিব।"

দাদাকে কাশীতে গঙ্গা-তটে পাইলাম। তিনি যেন আমার মনের কথা অবগত হইয়া অনেক কথা বলিতে লাগিলেন। তাঁর বাণীর প্রস্রবণ যেন আমার অন্তরের সমস্ত প্রশ্নের একাধারে উত্তর --শুনিতে লাগিলাম, এতটুকু প্রশ্ন করিবার অবকাশ নাই। কেবল অবাক্ হইয়া শুনিতে লাগিলাম। খুঁজিবার এই চেষ্টা'কে যে জাগিয়ে দিতে পারে সেই ত প্রকৃত গুরু। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মধ্যে তাকে কি করিয়া দেখিতে পাওয়া যায়? এই দেখিবার শক্তিকে যে উদ্দীপ্ত করিয়া দিতে পারে সেই ত প্রকৃত গুরু। অন্ধকারকে সরাইতে হইলে কেবল আলোটুকুর প্রয়োজন, সেই আলোটুকু যিনি কৃপা করিয়া প্রদান করেন তিনিই প্রকৃত গুরু। এই অ লো কি করিয়া আসে? তার জন্য কি করিতে হইবে? সত্যিকার চাওয়া কাহাকে বলে? যাহাকে না পাইলে এক দণ্ড চলে না, প্রাণ কেমন-কেমন করে; সর্ব্বদাই মনে হয় যেন কাহাকে চাই, না পাইলে চলিবেই না, পেতেই হইবে—এইরূপ দৃঢ়তা যখন প্রকাশ হয় তখনই পাইবার সময় হইয়াছে মনে হয়। কিন্তু আমার মনে হইল যে তখনও আমার পাওয়ার সময় হয় নাই। যখন পাইবার সময় হয় তার ব্যস্ততা ব্যাকুলতা যতই বাড়ে ততই নিকট হইতে থাকে। নিজের ব্যাকুলতার পরিমাণ ও প্রগাঢ়তা অনুভব করিতে পারিলাম না। যখন কিছুই পাই না তখন আমার ব্যাকুলতার মূল্য কতটুকু? এই সব কথা মনে মনে ভাবিতেছি তার উত্তরে দাদা নিজের বাণীর মধ্য দিয়া

বলিলেন, "তোমার মধ্যে এমন কোনও শক্তি নেই যে তুমি নিজের চেষ্টায় গুরু লাভ করিতে পার। যখন সময় হইবে তখন গুরু নিজেই দর্শন দিবেন, যেমন ফুল ফুটিলে ভ্রমর মধু লইতে আপনি আসে, কিন্তু ফুল মধু দিতে ভ্রমরের নিকট যায় না। কেবল কি করিয়া নিজেকে ফুটাইতে হইবে, কি করিয়া ফুটাইতে হয়, তাহাই জানা চাই। মনকে ঐভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া উহাকে আত্মস্থ করিতে হইবে।" দাদার বাণী শুনিতে শুনিতে আমি এত দিন পর কাহাকে আত্মস্থ হওয়া বলে তাহা বেশ অনুভব করিতে লাগিলাম। এবার সময়ের প্রতীক্ষা। কবে সে দিন হইবে ? সে মাহেন্দ্র সুযোগ কবে হইবে ? তারপর তাঁহার সান্ত্বনা পাইতে লাগিলাম, কিন্তু সান্ত্বনার পরিবর্ত্তে আমার মনে আরও হাহাকার পড়িয়া গেল।

দাদার বাণীর মধ্যে গুরু-লাভের লোভ ও আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিলাম। তিনি বলিলেন, "৺পুরীধামে শ্রীগুরুদেব আছেন, তাঁর দর্শন পাইতে হইলে ও কৃপা লাভ করিবার মত নিজে উপযুক্ত হইতে হইলে এখন হইতে কিছু নিয়ম অভ্যাস কর। তারপর ক্রমশঃ সব ঠিক হইয়া যাইবে।" গুরু-লাভের যে কত অন্তরায় আসিয়া পড়িতেছে সে কথা তখনও দাদাকে বলি নাই। ভয় ছিল পাছে দাদা নিজেও অন্তরায় না হইয়া পড়েন। কারণ তিনিও বিবাহিত ও সাংসারিক। তিনি হয়ত আমাকেও নিশ্চয়ই বিবাহ করিতে আদেশ করিবেন, যাহা আমি পালন করিতে পারিব না। তাই ভাবিলাম ইহা গুরুজনকে জিজ্ঞাসা করাই অনুচিত। জিজ্ঞাসা করলে তিনি যাহা আদেশ করিবেন তাহাই করণীয়।

আমার অন্তরীণ অবস্থায় বিবাহ সম্বন্ধে অনেক প্রস্তাব আসিয়াছিল, কিন্তু সমস্ত অতি তাচ্ছিল্যভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া আসিয়াছিলাম। আমি যখন জেলে, তখন আত্মীয় স্বজন, পিতা-মাতা সকলেরই একে একে তিরোধান হইয়াছে, কেহই আমাকে আশ্রয় দিবার নাই। আমি যেখানে বন্দী ছিলাম সেখানে বেশীর ভাগ বাদশাহদের পরিবার বাস করিতেন। ধনী ও শিক্ষিত সমাজ আধ্যাত্মিক বিষয়ে বেশ অগ্রসর, ইংরাজের রাজত্বে তাঁহারাই দক্ষিণ হস্ত, সেই জন্য তাঁহারা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি সহজেই সরকারের নিকট হইতে লাভ করিতেন। দলে দলে লোকের সমাগম হইতে লাগিল। তার মধ্যে এক জন ফকীর সাধুর দর্শন লাভ হইল। তিনি উর্দ্দু ভাষায় আমাকে অনেক শুনাইতে লাগিলেন, যোগ সম্বন্ধে তাঁর বেশ গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি রাত্রিতে নিদ্রা যাইতেন না, আমাকে লইয়া পদ্মাসনে বসাইয়া হিন্দুর মূল শিক্ষা বুঝাইতেন। আমি ভাবিতাম মুসলমান হইয়া হিন্দুশাস্ত্র-জ্ঞান কোথা হইতে পাইলেন। কয়েক দিন পর তিনি বলিলেন "দেখ এই গভীর নিশীথে কত দেবতারা আকাশ-মার্গে যাওয়া আসা করেন, তাঁহারা দুঃখী ও ভক্ত জীবকে সান্ত্বনা দিবার জন্য কতই ব্যস্ত। তোমরা এমন দুর্লভ মনুষ্য জীবনকে আহার-নিদ্রায় অবহেলায় ব্যয় করিতেছ।" যাহা হউক, তাঁর সংস্রবে আমার মন বেশ আকৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি একাধারে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্ট, জৈন প্রভৃতি ধর্ম্মের সমন্বয় সুন্দর ভাবে আমাকে বুঝাইতেন। মুসলমান ফকীর সাধুটির সহিত আমার বিশেষ ভাব হইবার কারণ ছিল, তিনি বিবাহ-বিরুদ্ধ ছিলেন। আমি বিবাহ

করি নাই বলিয়া তিনি আমাকে লইয়া একটি আশ্রম গঠন করিবেন স্থির করিলেন, তার জন্য বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন।

এ দিকে একটি হিন্দু কন্যা সদ্‌বংশীয়া পরমা সুন্দরী—তাহার বিবাহের জন্য লোকে নানা কথা আমার কর্ণ-কুহরে ঢালিতে লাগিল। আমি অতি নির্ব্বিকারে হঁা হঁা করিয়া সকলকে বিদায় করিতাম, কত করিয়া বুঝাইতাম যে আমার এমন অবস্থা নয় যে বিবাহের কথা ভাবিতে পারি। কে কাহার কথা শুনে, চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী। তাহারা কন্যাদায় গ্রস্ত, কোন মতে কন্যা দিতে পারিলেই যেন নিষ্কৃতি। অবশেষে ব্যাপার এতটা অগ্রসর হইল যে ম্যাজিষ্ট্রেট এর অনুমতি লইয়া মেয়ের মা ও বাপ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। আমি আরও অধৈর্য্য হইয়া পড়িলাম। একটি সাধু বা জ্যোতিষী বলিয়াছিলেন যে নয় দিন অনুষ্ঠান করা হউক একপায় দাঁড়াইয়া)—নয় দিন পরে বিবাহ হইবে। "Fasting till death" ইত্যাদি বলায় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সম্মতি দান করিয়াছেন আমাকে এই কথা বলা হয়। আমি পলাইবার ব্যবস্থা করিলাম,—"বিবাহ করিব না" বলিয়া পলাইলাম। পালইয়া ভাবিয়াছিলাম বেশ নিষ্কৃতি পাইলাম।

কিন্তু সেখান হইতে মুক্তি পাইয়া বাড়ীতে আসিয়া কিছু দিন পরেই দেখি যে এখানেও বিবাহের কথা চুপি চুপি চলিতেছে। সকলেই মনে করিত যে কোন রকম কিছু ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাই এখন পলাইতে চায়। এই বলিয়া তাহারা আমাকে চাপ দিবার চেষ্টা করিত। দেখিয়া আমি আরও বিরুদ্ধ ভাব ধারণ করিলাম।

এইরূপ আলোচনা আমার অসহ্য হইয়া উঠিল। কাশীতে ঔপন্যাসিক শরৎবাবু আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। আমার বিরুদ্ধ ভাব ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল।

অবশেষে দাদা আমাকে লইয়া ৺পুরীধামে তাঁহার গুরুদেবের আশ্রমে গেলেন। সেখানে বাবা অতি মধুরভাবে আমাকে বলিলেন, "দেখ, বিবাহ তো আমিও করিয়াছি, বিবাহ করিলেই কি কোনও ব্যাঘাত হয়? বরং যোগ সুসম্পন্ন হয়", ইত্যাদি। অনেক কথা বলিলেন। 'বিবাহ হইলেই আমার মৃত্যু হইবে এই প্রকার ঠিকুজীতে আছে ও একজন সাধুও বলিয়াছেন', ইহা শুনিয়া বাবা বলিলেন, "তার জন্য আমি দায়ী, সে বিষয়ে তোমাকে ভাবিতে হইবে না। মৃত্যু-গ্রহ খণ্ডন করিয়া দিব, আমার সাক্ষাতে মৃত্যু তোমার হইতেই পারিবে না।" এত জোর করিয়া বলিবার মত শক্তি অন্য কোনও সাধুর দেখি নাই। আমি কেবল অবাক্ হইয়া শুনিতাম ও তাঁহার কার্য্য-কলাপ লক্ষ্য করিতাম। মৃত বোলতা প্রভৃতিকে জীবন দান করিতেন, মৃত ব্যক্তিকে প্রাণ দিবার মত ক্ষমতা যে ইহার আছে তার অনেক প্রমাণ পাইলাম।

আমার সঙ্গে একটি আমেরিকা-ফেরত বাঙ্গালী বাবু ছিলেন, বেশ ধনী ও শিক্ষিত লোক। তিনি বাবার অনন্য ভক্ত ছিলেন। খুব বলিষ্ঠ ছিলেন, তিনি বাবার শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ মর্দ্দন করিয়া মেসাজ করিয়া দিতেন, তাহাতে বাবা বড়ই সুস্থ বোধ করিতেন। তিনি বলিতেন, বাবার শরীরের মধ্যে কি যেন পাথর ভরা আছে। একবার টিপিতে টিপিতে দুই তিন সের খুব চক্‌চকে ও খুব ঠাণ্ডা পাথর শরীর হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

বাবা মাত্র দেড় ঘণ্টা নিদ্রা যাইতেন। তখন রাত্রি নয়টা হইবে, বাবা গভীর নিদ্রায় মগ্ন। উনি কাঁদ-কাঁদ হইয়া আমাকে বলিলেন, "কি হইবে? বাবা উঠিয়া না জানি কতই রুষ্ট হইবেন।" অন্ধকারে স্ফটিকগুলির মধ্য হইতে জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছিল। প্রায় দেড় ঘণ্টা নিদ্রা যাইবার পর বাবা জাগ্রৎ হইলেন। উঠিয়াই বলিলেন, "কিগো, কাঁদিতেছ কেন? কাঁদিবার কি আছে? একটু আরাম পাইয়া অসাবধান হইয়া পড়িয়াছিলাম, তাই বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তোমাদের দোষ কি! সুরেন্দ্র, লণ্ঠনটা আন তো!" আমি লণ্ঠন লইয়া আসিলাম, দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুল ফাঁক করিলেন আর বলিলেন, "ওইগুলি ভরিয়া দাও।" বাঙ্গালীবাবু ওইগুলি মুঠি মুঠি করিয়া তুলিয়া ভরিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে লাগিলেন কোথায় তলাইয়া গেল। এতগুলো পাথর ঐ ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া ঢুকিয়া এই শরীরে কি করিয়া থাকিতে পারে তাহা ভাবিয়াই তিনি আকুল। আমাদের শরীরে একটি ক্ষুদ্র কণ্টক ফুটিলে কতই যন্ত্রণা হয়। হায়! কেবল এই পাথর প্রবেশ করাইবার ক্ষমতা দেখিয়া তাঁহাকে বিচার করিতেছেন। বস্তুতঃ এই বিরাট্ অট্টালিকা ক্ষণেকের মধ্যে প্রবেশ করাইলেও তাঁহার শরীরের এতটুকু বিকৃতি হইবে না। বড় যোগী চন্দ্র সূর্য্যকে নিজের মধ্যে লইতে পারেন, তাহাতেও বিস্ময়ের কিছু নাই।

যাহা হউক, আমরা কাশীতে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীশ্রীগুরুদেবের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। বাবার আসার পর আমার বিবাহের কথা লইয়া ঘোর আলোচনা হইতে লাগিল।

বন্ধু বান্ধব বড় বড় সাহিত্যিকমণ্ডল এবং বাঙ্গলার প্রসিদ্ধ লেখক শরৎবাবু প্রত্যহ আমার নিকট গল্প শ্রবণ করিবার আশায় আসিতে লাগিলেন। তার মধ্যে বিপ্লবদলের লোকেরা ও ছেলেদের দল ও গুপ্তভাবে আসা যাওয়া আরম্ভ করিতে লাগিল। আমি গুপ্ত দলের কার্য্য যাহাতে ত্যাগ না করি তাহার জন্য অনেকে অনুরোধ-পত্র লইয়া আসিতে লাগিলেন। সেই জন্য আমাকে দেখা কয়া বিষয়ে কিছু প্রতিবন্ধক রচনা করিতে হইয়াছিল। কার্ড না দিলে সাক্ষাৎ করিতাম না। একবার শিবপুরে শরৎ-বাবুকে একজন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আপনি কাশীর সুরেনকে চেনেন?" "হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি। যে কার্ড না হলে দেখা করিত না—আমাকেও কার্ড দিয়া সাক্ষাৎ করিতে হইয়াছিল। আমি জীবনে বাঙ্গালীর ঘরে, এমন কি রবি ঠাকুরের বাড়ীতেও, কখনও কার্ড দিয়া দেখা করিতে যাই নাই", ইত্যাদি। লোকটি একটু অপ্রস্তুত হইল দেখিয়া সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "আমি জানি সে সময় বড়ই বিব্রত হইয়া এই ব্যবস্থা তাহাকে করিতে হইয়াছিল। পুলিশের তাড়নায় তাহাকে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে। পুলিশের গুপ্তচরের জন্য এই কার্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিল। জানি তাতে লজ্জা পাইবার কিছু নাই। বিশেষ করিয়া বিবাহের জন্য যে সব লোকেরা আসিতেন তাহাতে সে অত্যন্ত অতিষ্ঠ হইয়া উঠিত। বিবাহের কথায় অনেকে কত প্রসন্ন হয়। আমি জীবনে এই একটি লোক দেখিলাম যে বিবাহের বিরুদ্ধে প্রাণটাকে পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিয়াছিল। মশায়, বলিব কি বিবাহ-বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার জন্য গভীর রাত্রে গঙ্গায় ঝাঁপ

দেয়, পিস্তল লইয়া গুলি দ্বারা আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করে। অন্তর হইতে বিবাহের প্রতি বিতৃষ্ণা ভয় ও উৎকণ্ঠা আমার জীবনে এত বেশী আর কোথাও দেখি নাই। কাশীতে সাধু দর্শন করিবার ইচ্ছা ছিল। অনেকে অনেক রকম সাধু দর্শন করাইলেন বটে, কিন্তু তৃপ্ত হইলাম না। সুরেন যে কয়টি সাধু দর্শন করাইল তাঁহারা প্রকৃতই দর্শনের যোগ্য। তাহার সাধু দেখিবার ও দেখাইবার চোখ আছে। অবশ্য অনেক বিষয় গুপ্ত রাখিতে বলিয়াছে, তাহা গুপ্ত রাখিয়াছি ও রাখিব। সে আমাকে বার বার বলিত, 'চাটুয্যে মশায়, অনেক কথা আপনাকে বলিতে আমার ভয় হয়, সঙ্কোচও হয়, পাছে আপনি পুস্তকে প্রকাশ করেন।' সকলেই চায় নিজের কথা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হউক, কিন্তু তাহার মধ্যে দেখিলাম যে অন্তর হইতে সে চায় না যে আমি তার কোনও কথা প্রকাশ করি।"

কাশীতে শরৎবাবু একদিন 'বড়দিদি' খুলিয়া পড়িয়া বলিলেন, "তোমার নাম আমি পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়া দিয়াছি, তোমার প্রকৃত রূপ আমি অনেক পূর্ব্বেই পাইয়াছি। আজ প্রত্যক্ষ যাহা দেখিতেছি তাহা আরও আশ্চর্য্য। তোমার মধ্যে এমন কি আছে যার জন্য কয়েকজন মেয়ে তোমাকে বিবাহ করিবার জন্য লালায়িত? এত সাধু দর্শন করিয়াও তুমি তৃপ্ত নও। প্রকৃত সাধুর দর্শন এখনও আমার হয় নাই। আশা আছে হবে। যোগী হইতে হইলে যোগীর আশ্রয় লইতে হইবে। এখন যোগীর অন্বেষণ করিতে হইবে। এরূপ যোগী কোথায় এবং কি করিয়া তাঁহার দর্শন হয়? কোনও সাধুর ভগবৎ-প্রাপ্তি হইয়াছে কিনা

তাহা কি কি লক্ষণ দেখিয়া বুঝিতে হইবে ? সে জ্ঞান তো আমার নাই।" আমি বলিলাম, "এই জগতে ভগবান্ আছেন তারই বা প্রমাণ কি ? তিনি না থাকিলে এই বিরাট্ বিশ্ব কে সৃষ্টি করিল ? কোন সাধু যদি তাঁহার সহিত যুক্ত হইয়া থাকেন তো নিশ্চয়ই তাঁহারও সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা থাকিবে। এই সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা চালাকী, ন্যাকামী, হাব-ভাব বা নকল ভক্তি দেখাইয়া প্রমাণ করা যায় না। প্রকৃত ভক্ত একমাত্র যোগীই হইতে পারেন। কেবল শাস্ত্র পড়িলেই যোগী হয় না।" শরৎবাবু বলিলেন, "এ প্রকার যোগী আছেন কি ? দর্শন পাইবার আশা আছে কি ? চিরকাল মেয়েমানুষ ও পুরুষ মানুষের চরিত্র বিচার করিলাম, কিন্তু প্রকৃত যোগীর খোঁজ করিলাম না। যে কয়জন সাধু তুমি দর্শন করাইলে তাহার মধ্যে একজনকে (ব্রহ্মানন্দ) অতি অদ্ভুত দেখিলাম—তিনি একজন অসীম শক্তিশালী যোগীর বিষয় বলিলেন। এই পৃথিবীর দুঃখ ঘুচাইবার ক্ষমতা একমাত্র যোগীরই আছে। তাঁহারা যে কর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত তাহা সাধারণ মানুষ বুঝিতে অক্ষম। এই যোগী এই ভারতেই আছেন, আর কাশী সহরে আসিয়া থাকেন—ঠিক সাধারণ মনুষ্যের মত প্রচ্ছন্নভাবে নিজের কর্ম্ম করিয়া চলিয়াছেন। এত বড় সাধুকে দর্শন করিবার মত ভাগ্য হইবে কি ?" শরৎবাবুর তো মাথা ঘুরিয়া গেল। তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দকে দেখিয়াই পাগল। বলিলেন, "ইঁহাকে আমি গুরু করিব, ইঁহাকে লইয়া আমি শিবপুর যাইব।" আমি বলিলাম, "উনি অতি গুপ্ত সাধক, শিষ্য করেন না, বলেন, 'প্রত্যেকের গুরু আছেন, সকলেই গুরুর আশ্রয়ে আছেন, কোনও জীব বিনা আশ্রয়ে এক

দণ্ড জীবিত থাকিতে পারে না—এত শত্রু দ্বারা বেষ্টিত যে তাদের কবল হইতে মানুষ রক্ষা পাইতে পারে না, গুরু সর্ব্বদা নিজ শক্তি বলে তাহাদের অলক্ষ্যে রক্ষা করিতেছেন। সময় হইলে দয়া করিয়া দর্শন দেন, সেই সুসময় ও মাহেন্দ্রযোগ জীবনে যখন হইবে তখন মানুষ ধন্য হইবে।"

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার কিছুদিন পূর্ব্বে ৺পুরীধাম হইতে শ্রীশ্রীবাবা কলিকাতায় আসিলেন। এবার কাশীতে আসিতেছেন। আমরা গভীর প্রতীক্ষায় রহিলাম। একদিন মোগলসরাই ষ্টেশনে দাদার সহিত গিয়া বাবাকে কাশীতে লইয়া আসিলাম। বাবা তখন কাশীতে হরিশ্চন্দ্র ঘাটের আশ্রমে উঠিতেন। আমাদের কি উল্লাস, কত আনন্দ! প্রত্যেক দিন বাবার নিকট না গেলে প্রাণ কেমন করিত, কতই আপন, কতই অন্তরের জিনিষ—এ রকম ভালবাসার স্থান যেন কোথায় ছিল, আজ এতদিন পরে সেই হারানিধিকে পাইলাম। কিন্তু আমার সুখের মধ্যে আবার ব্যাঘাত,—আশঙ্কাটা হইত আবার হারাইব কি? আবার পলাইতে হইবে কি? বিবাহের বিষয় লইয়া যাঁহারা ব্যস্ত তাঁহারা কোনও পথ যখন পাইলেন না, তখন বাবার দ্বারা আমাকে দাবাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে মেয়ের ভাইয়ের সহিত মেয়ে নিজে বাবার নিকট উপস্থিত হইল। বাবা মেয়ের ক্রন্দনে তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "বিবাহ হইবে, কিন্তু পূর্ব্ব বিবাহ যাহা জেলে হইয়াছে তাহা বিধিজনক স্বীকার করা যায় না, কারণ ও প্রকার বিবাহ গ্রাহ্য করা যায় না। বিধিপূর্ব্বক বিবাহ হওয়া উচিত। সুরেন মনে প্রাণে উহা গ্রহণ করে নাই।"

এদিকে আমি দেখিলাম যে বিবাহ অনিবার্য্য। তবুও চেষ্টা করিতে লাগিলাম যে যদি দীক্ষা পাইয়া যাই বাবার দেওয়া মন্ত্রটি লইয়া বিন্ধ্যাচলে গিয়া লুকাইয়া থাকা যাইবে। কয়েক দিন পর শুনিলাম যে বাবা নাকি বলিয়াছেন, বিবাহ না হইলে দীক্ষা দিবেন না। আমার তখন বড় দুঃখ হইল—কি করি, দীক্ষা না লইয়া কেবল শূন্য বক্ষে তো চিরদিন ঘুরিলাম, এবার কিছু পাথেয় না পাইলে কি লইয়া থাকিব? ব্রহ্মানন্দ বলিতেন, "যতদিন দীক্ষা না হইতেছে, ততদিন মানুষ শুষ্ক পত্রসম—যেমন বৃক্ষতলে শুষ্ক পত্র বায়ুতে উড়িয়া বেড়ায়, তোমার সেই অবস্থা। যাঁহাকে গুরু করিতেছ, তাঁহার আদেশ পালনে এত ভয়—ছিঃ, আত্মসমর্পণ করিতে শিক্ষা করিলে না?" দাদা খুব বেশী বিবাহ করিতে জোর দিতেন না, তাই তাঁহার নিকটেই থাকিতাম। তবে বলিতেন, "গুরু-আজ্ঞা সদা সর্ব্বদা শিরোধার্য্য। অন্তর হইতে তাঁহার আদেশ পালনে তৎপর থাকিতে হয়। তাঁহার আদেশ-পালনে দ্বিধাশূন্য হইতে হইবে, তাঁহার আদেশ-পালনে আনন্দ পাইবে—Obedience is love—learn to obey."

বিবাহ সম্বন্ধে অনেক গুপ্ত কথা বাবার সহিত হইতেছিল। তখন লজ্জা হইবার বয়স ছিল, এখন ত আর লজ্জা নাই। যোগ সম্বন্ধে অনেক কথা বাবা আমাকে বিশেষভাবে বলিয়াছিলেন। কাপালিকেরা যখন আমাকে বিন্ধ্যাচলে বলি দিবার জন্য ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল তখন আমাকে তাহারা impotent হইতে বলিয়াছিল। আমি রাজী হইলে একটি

অণ্ডকোষ অকর্ম্মণ্য করিয়া দিয়াছিল, ইহা লজ্জায় কাহাকেও বলি নাই। বাবা অন্তর্য্যামী, তিনি বলিলেন, "সুরেন্দ্র, তুমি যোগী হইতে চলিয়াছ। যোগীর অঙ্গহীন হইয়া থাকা উচিত নয়। তোমার কোষ আমি ঠিক করিয়া দিব", ইত্যাদি। অনেক গুপ্ত কথা হইয়াছিল তাহা এখানে আলোচ্য নহে।

আপাততঃ বিবাহ রহস্য উদ্‌ঘাটন করি—বাবার আদেশ অনুযায়ী বিবাহের ব্যবস্থা হইল কাশীতে আমাদের বাড়ীতে, অর্থাৎ মামার বাড়ীতে। এখানেই আমার জন্ম। দাদামহাশয় ও দিদিমা খুব বড় লোক ছিলেন, সাতটি মেয়েকে বিবাহ দিয়া ঘর-জামাই করিয়া কুলীনত্ব বজায় রাখিয়াছিলেন। আমাদের ভাই-বোন সকলেরই মামার বাড়ীতেই লালন পালন হইয়াছিল। আমার বিশ্বাস বা আন্তরিক শ্রদ্ধা কখনও শ্রীশ্রীগুরুদেবের উপর এতটা ছিল না, কিন্তু তিনি আমাকে খুব স্নেহ করিতেন। তিনি যে ভাবে বিবাহের ব্যবস্থাদি করিবার জন্য আদেশ করিলেন, তাহাই মামাবাবু পালন করিলেন। আমি বাড়ীতে বলিয়াছিলাম, "বিবাহ হইলেই আমার মৃত্যু অনিবার্য্য, যদি রক্ষা পাই তো ওই সাধু যাহাকে তোমরা কেহই চিন না তাঁহারই কৃপায় রক্ষা পাইতে পারি।" বাড়ীতে যখন মেয়েটি তাহার মাতা ও ভ্রাতার সহিত আসিয়া পৌঁছিলেন তখন আমি স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম—কেবল বিবাহের কথা হইতেই এত বন্ধন, এত দাবী, জোর করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়া পড়িলেন, কোন প্রকারে নিষ্কৃতি নাই। ইঁহারা অবশেষে গুরুদেবের নিকট গিয়া অনুমতি লইয়া আসিলেন। বাবার আদেশ মত আমাকে সমস্ত কার্য্য

করিতেই হইল। ইচ্ছা ছিল যোগ-মতে দীক্ষা লইয়া পলাইয়া যাইব। তাহা বাবা বুঝিতে পারিয়াই বলিয়াছিলেন, "দীক্ষা দিলেই সুরেন পলাইবে, বিবাহের পর দীক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিব।" —ক্রমশঃ

আধ্যাত্মিক পরিপৃচ্ছা

শুষ্কজ্ঞান ও দিব্যজ্ঞান

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট্

(১)

সূচনা

তত্ত্ব ও সাধন সম্বন্ধে অনেক সময়ে অনেকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। এই সকল প্রশ্ন কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রশ্ন হইলেও সাধারণতঃ অনেকের মনেই এইগুলি উদিত হয়। তাই ইহাদের সমাধান-সংক্রান্ত আলোচনা সাধারণ ভাবে করিতে পারিলে উহা দ্বারা অনেকের উপকার হইতে পারে। এই আলোচনার ফলে কাহারও মনে প্রসুপ্ত জিজ্ঞাসা জাগ্রৎ হইবে এবং কাহারও মনে পূর্ব্বোদিত জিজ্ঞাসার সমাধান হইবে। সমাধান না হইয়া যদি প্রশ্নান্তরের উদয় হয় তাহা হইলেও জ্ঞানের বিকাশের পথ ক্রমশঃ পরিষ্কৃত হইতে পারে। কারণ উহাপোহের উদয়ই জ্ঞানলাভের প্রকৃষ্ট পন্থা। এইজন্য আমরা যথাসম্ভব বিশুদ্ধবাণীর প্রতি ভাগেই "আধ্যাত্মিক পরিপৃচ্ছা" নামক প্রকরণে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও সাধন সংক্রান্ত প্রশ্নের আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। বক্তা ও জিজ্ঞাসুর কল্পিত সংবাদরূপে এই প্রকরণটি প্রকাশিত হইবে। বক্তা লেখক স্বয়ং, জিজ্ঞাসু একজন কর্ম্মী সাধক, যাহার কল্পিত নাম 'রাখাল'।

(২)

শুষ্কজ্ঞান ও দিব্যজ্ঞান

জিজ্ঞাসু। দাদা, আজ একটি জটিল প্রশ্ন লইয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইলাম—প্রশ্নের বিষয় জ্ঞানতত্ত্ব। আশা করি এই বিষয়ে আপনি কিছু আলোচনা করিবেন, যাহাতে এই তত্ত্ব সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা জন্মে। শুষ্ক জ্ঞান ও দিব্যজ্ঞানের পার্থক্য কি ইহাই আমার মূল জিজ্ঞাস্য।

বক্তা। শ্রীশ্রীগুরুদেব যেমন উন্মাদিনী ভক্তি হইতে দিব্য-ভক্তির পৃথক্ নির্দ্দেশ করিতেন, তদ্রূপ শুষ্কজ্ঞান হইতে দিব্যজ্ঞানেরও পার্থক্য স্বীকার করিতেন। তিনি যাহা বলিতেন শাস্ত্রেও তাহাই আছে। সর্ব্বদেশের মহাজনগণের অনুভবও উহার সাক্ষী। কিন্তু গভীর অনুভূতি এবং ব্যাপক দৃষ্টি না থাকিলে এই পার্থক্য ধারণা করা কঠিন। আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এ সম্বন্ধে যে অনুভূতি লাভ করিয়াছি তাহা অবলম্বন করিয়াই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

জি। আমরা সাধারণতঃ যে জ্ঞানের কথা শুনিতে পাই তাহা কি শুষ্কজ্ঞান না দিব্যজ্ঞান ?

ব। তাহাকে শুষ্কজ্ঞান বলাই বোধ হয় সঙ্গত। এই জ্ঞান বিবেক হইতে উদ্ভূত হয়। আত্মা চিৎস্বরূপ হইলেও অনাদি অজ্ঞানের প্রভাবে অচিৎ বা জড়ের কবলে পতিত হইয়া রহিয়াছে। কর্ম্মই যে ইহার কারণ তাহা বলা যায় না। কারণ কর্ম্মও এই অজ্ঞান হইতে উদ্ভূত। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি জড়, মায়া ও জড়। মায়া সূক্ষ্ম, প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত স্থূল। স্থূল, সূক্ষ্ম বা কারণ দেহ

এই জড়েরই কার্য্য বা বিকার। দেহের আবরণে আচ্ছন্ন হইয়া আত্মা দেহকেই 'আমি' বলিয়া অভিমান করিতেছে। এই অভিমান স্থূলে যত স্পষ্ট, সূক্ষ্ম বা কারণে তত স্পষ্ট নহে, কিন্তু তবু ইহা আছে। সকল দেহই অনাত্মবস্তু।

অনাত্মাতে জ্ঞাতারূপে বা কর্ত্তারূপে আত্মাভিমান উৎপন্ন হইলেই উহা হইতে সাংসারিক জীবনের সূত্রপাত হয়। কর্ম্মবীজ সঞ্চিত হয়, তাহার ফলে অনুরূপ দেহ ধারণ হয় ও ঐ দেহের দ্বারা সুখ দুঃখ ভোগ নিষ্পন্ন হয়। বিপক্ব বীজ ভোগের দ্বারা নষ্ট হইয়া যায়। আবার ঐ দেহে ভোগ-কালেও অভিমান বশতঃ অভিনব কর্ম্ম উৎপন্ন হয়। উহাও বীজ-ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়। মৃত্যুর পর যথাসময়ে বিপাক-প্রাপ্ত বীজের দরুণ আবার দেহ ধারণ আবশ্যক হয়। এই প্রকারে জন্মের পর মৃত্যু ও মৃত্যুর পর জন্ম পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হইতেছে। মূল অজ্ঞান থাকিয়া যাইতেছে, তাই কর্ম্ম-রচনারও বিরাম নাই, ভোগেরও বিরাম নাই। অনাদিকাল হইতে কালের রাজ্যে এই খেলা চলিতেছে। কর্ম্ম দেহে উৎপন্ন হয় এবং ঐ কর্ম্মের ফল-ভোগ দেহে অনুভূত হয়। চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বত্রই ভোগের খেলা চলিতেছে। দেহাদিতে আত্মবোধ রূপ অজ্ঞান না কাটিলে কোন উপায়ে এই চক্র হইতে নিস্তার নাই। দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ মন বুদ্ধি প্রভৃতিতে যে আত্মভাবনা তাহাই মিথ্যা-জ্ঞানের স্বরূপ। আত্মা দেহাদি হইতে একান্ত বিলক্ষণ, শুদ্ধ চিদাত্মক, অপরিণামী নিত্যবস্তু। কিন্তু অজ্ঞান বশতঃ দেহাদিতে এই আত্মভাব ফুটিয়া উঠে। ইহাই অনাত্মাতে আত্মবোধ। তখন অভিমান জাগে—দেহাশ্রিত

ভাবে নিজেকে জ্ঞাতারূপে জানা হয় ও তাহার অনুরূপ জ্ঞেয়রাশি তাহার জ্ঞানের বিষয় হয়। এই জ্ঞান অজ্ঞানেরই কার্য্য। তদ্রূপ দেহাশ্রিত ভাবে নিজে কর্ত্তা হইয়া কর্ম্ম করা হয়। তাহা হইতেই কার্য্য উৎপন্ন হয়। এই প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠানও অজ্ঞানেরই ফল।

সুতরাং এই ভব-চক্র হইতে উদ্ধার-প্রাপ্তির একমাত্র উপায় জ্ঞান। অনাত্মাকে অনাত্মা বলিয়া পৃথক্ ভাবে জানাই জ্ঞানের স্বরূপ। অনাত্মাকে 'আমি নই' বলিয়া চিনিতে পারিলেই বিবেক-জ্ঞান উদ্ভূত হইল বলা চলে। ইহাই বিশুদ্ধ বোধ। আত্মা যে শুদ্ধ চিদ্রূপ তাহা এই বোধেই প্রকাশিত হয়। এই বোধের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই অনাত্ম-সম্বন্ধ বর্জ্জিত হয়। ইহাই বিশুদ্ধ চিদ্‌ভাবময় অবস্থা— এই অবস্থায় আনন্দের অভিব্যক্তি থাকে না। ইহা নিষ্ক্রিয় ভাব মাত্র। উত্তম কর্ত্তৃত্ব অথবা অহংভাব এই স্থিতিতে থাকে না। অহংভাব স্বাত্ম-বিশ্রান্তিরূপে অভিব্যক্ত হইলেই তাহাকে আনন্দ নাম দেওয়া হয়। আনন্দই স্বাতন্ত্র্যের নামান্তর। এই শুদ্ধ বোধ পরমেশ্বরের স্বরূপ হইতে অভিন্ন হইলেও সর্ব্ব প্রকারে অভিন্ন নহে, কারণ পরমেশ্বর পূর্ণ স্বতন্ত্র অথচ অখণ্ড বোধ স্বরূপ, কিন্তু এই শুদ্ধ বোধময় স্থিতিতে স্বাতন্ত্র্য নাই। সেইজন্য শুদ্ধ বোধকে ঠিক ঠিক ভগবৎস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা চলে না। অহংভাবের বিমর্শ-বিশিষ্ট যে বোধ তাহাই ভগবত্তা। শুদ্ধ বোধ উভয়ে সমরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে।

জিজ্ঞাসু। দিব্যজ্ঞান ও শুষ্কজ্ঞানের পার্থক্যটা এখনও স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না। উভয় প্রকার জ্ঞানের স্বরূপ,

উদ্ভব প্রণালী এবং ফল নির্দ্দিষ্ট হইলে বোধ হয় অনেকটা সহজে এই পার্থক্য ধারণায় আনিতে পারিব।

বক্তা। বিশেষ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিলে আশা করি তুমি অনায়াসেই উভয় জ্ঞানের পার্থক্যটি ধারণায় আনিতে পারিবে। দেখ শুষ্ক জ্ঞান চিদচিদ্-বিবেক হইতে উৎপন্ন হয়। ইহারই নাম অহংকার-গ্রন্থির বা হৃদয়-গ্রন্থির ভেদ। অবস্থা-বিশেষে উৎকট বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, উপাসনা প্রভৃতি হইতেও ইহা জন্মিতে পারে। এই জ্ঞান অগ্নিস্বরূপ। কর্ম্মবীজকে দগ্ধ করাই ইহার স্বভাব। ক্রিয়াযোগ অর্থাৎ তপস্যা, মন্ত্র-জপ, ভজন প্রভৃতির প্রভাবে কর্ম্মাশয় তনুতা প্রাপ্ত হয়। তাহার পর জ্ঞানাগ্নি ঐ তনু অবস্থাপন্ন কর্ম্মবীজকে দগ্ধ করে। এই জ্ঞান বিবেক-জ্ঞান ভিন্ন আর কিছু নহে। সত্ত্ব হইতে বিবিক্ত-স্বরূপ পুরুষের জ্ঞানই বীজের দাহক। অজ্ঞান অর্থাৎ দেহাদিতে আত্মবোধ থাকিলে কর্ম্মাশয় বিপাক প্রাপ্ত হয়, কিন্তু জ্ঞানের উদয় হইলে কর্ম্মাশয় দগ্ধ হয়। এই শুষ্ক জ্ঞান চিত্তের ধর্ম্ম। উপায় অবলম্বনে নিজ হইতে ইহা প্রকট হয় ও অজ্ঞানকে নাশ করে। পরে ইহা স্বয়ং নিবৃত্ত হয়। তখন কেবল জ্ঞান-স্বরূপ আত্মা স্থিত হয়। ইহাই কৈবল্য বা মুক্তি। ইহা জন্ম-মৃত্যুর অতীতাবস্থা। এই পুরুষ নিষ্ক্রিয় চিৎ-স্বরূপ—ইহাতে আনন্দ নাই, গুণরূপে নাই স্বরূপেও নাই। সত্ত্বগুণের সঙ্গে যখন চিদাত্মক পুরুষের সম্বন্ধ ছিল তখন অবশ্য আনন্দ ছিল, কিন্তু এখন আর উহা নাই।

কিন্তু দিব্য জ্ঞান এই প্রকার নহে। ইহা একমাত্র ভগবানের অনুগ্রহ হইতেই উৎপন্ন হয়—ইহা নিজের সাধনার ফলে জন্মে না।

ভগবান্ ক্রীড়াচ্ছলে নিজেকে সঙ্কুচিত করিয়া পশু বা জীব সাজিয়াছেন। যিনি মহান্ তিনি অণু হইয়াছেন, যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকর্ত্তা তিনি অল্পজ্ঞ ও অল্পকর্ত্তা হইয়াছেন, যিনি নিত্য ও বিভু তিনি কাল ও দেশের আবরণ গ্রহণ করিয়াছেন। যিনি আপ্তকাম ও নিত্যতৃপ্ত তিনি নিজেকে অপূর্ণ মনে করিয়া নিজ হইতে ভিন্ন অপর কিছু প্রাপ্তির জন্য কামনা-যুক্ত হইয়াছেন। এইভাবে মহান্ পুরুষ সঙ্কোচ গ্রহণ করিলে মায়া ও কর্ম্মরূপ ছুইটি পাশ তাহাকে আবদ্ধ করে। পূর্ব্ববর্ণিত সঙ্কোচের ফলে স্বভাবসিদ্ধ অভেদ জ্ঞান আচ্ছন্ন হয়, কিন্তু ভেদজ্ঞান তখনও আসে না। মায়ার আবরণ গ্রহণ করিবার পর ভেদজ্ঞানের উদয় হয়, তাহার পর কর্ম্মের প্রভাবে কর্ত্তৃত্ব-অভিমান উদিত হয় ও কর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে কর্ম্মজনিত সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। কর্ম্ম করা ও তাহার ফলভোগ করা উভয়ই দেহ-সাপেক্ষ—এই দেহ মায়িক উপাদান হইতে রচিত হইয়া থাকে। কারণদেহ, সূক্ষ্ম-দেহ ও স্থূলদেহ দেহেরই প্রকার-ভেদমাত্র। স্থূলদেহের বিকাশ পূর্ণভাবে না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্মও ঠিক ঠিক হয় না এবং ইহার ফলভোগও ঠিক ঠিক হইতে পারে না।

নিবৃত্তি-মার্গে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় মায়া ও কর্ম্ম কাটিয়া গেলেও পশুভাব বা জীবভাব কাটে না। কর্ম্ম অজ্ঞান প্রসূত, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই অবিবেক রূপ অজ্ঞান কাটিয়া গেলে কর্ত্তৃত্ব-অভিমান থাকে না। তাই কর্ম্মও থাকে না। ইহার ফলে পুনঃ পুনঃ দেহ-গ্রহণ রূপ সংসার নিবৃত্ত হইয়া যায়। মৃত্যুরাজ্য হইতে জীবের উদ্ধার হয় এবং কর্ম্মের অভাবে মৃত্যুরাজ্যে পতনের

সম্ভাবনা থাকে না। ইহা অচিৎ হইতে মুক্ত শুদ্ধবোধের অবস্থা তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাকে মুক্তি বলা হয় এবং এই অবস্থাটিকে মুক্তি বলিলে কোন দোষের কারণ থাকে না। কারণ সংসারের বন্ধন চিরদিনের জন্য কাটিয়া গিয়াছে এবং ঐ বন্ধনের পুনরুদ্গমের সম্ভাবনাও নাই।

কিন্তু এই অবস্থাতেও আত্মার পশুভাব কাটে না, আত্মা ভগবত্তা লাভ করে না, এমন কি ভগবৎ রাজ্যেও প্রবিষ্ট হয় না, পূর্ণ মহেশ্বর-ভাব-প্রাপ্তি ত দূরের কথা।

জিজ্ঞাসু। অবিবেক-নিবৃত্তি হইলে আত্মা যখন স্বরূপ-স্থিত হয় তখনকার অবস্থা কৈবল্য নামে পরিচিত। এই অবস্থায় কি স্থিতিগত ভেদ থাকার সম্ভাবনা আছে?

বক্তা। বিশুদ্ধ কৈবল্য একই, তাহাতে কোন প্রকার ভেদের আশঙ্কা নাই। তবে অচিৎ বা জড় সত্তার স্থূলাদি ভেদ স্বীকৃত হয় বলিয়া ঐ সত্তা হইতে বিবেক লাভ করাও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বর্ণিত হইয়া থাকে। প্রকৃতি, মায়া ও মহামায়া, জড়ের এই তিনটি মুখ্য স্তর রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রকৃতি স্থূল ও ত্রিগুণাত্মক। মায়া সূক্ষ্ম, ইহা নির্গুণ অথচ মলিন। মহামায়া সূক্ষ্মতম, ইহা বিশুদ্ধ অবস্থা হইলেও অচিতেরই অবস্থা মনে রাখিতে হইবে। সাধারণ আত্মা পশুভাব নিয়া মহামায়ার রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। প্রকৃতি ও মায়ার রাজ্যে যে অজ্ঞান রহিয়াছে তাহা হইতে বিভিন্ন প্রকার অজ্ঞান মহামায়ার রাজ্যে খেলা করিয়া থাকে। অনাত্মাতে আত্মবোধই অজ্ঞানের স্বরূপ, এই কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই অজ্ঞান

প্রকৃতি ও মায়ারাজ্যে ব্যাপকভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই অজ্ঞান কাটিয়া গেলে অর্থাৎ কেবল জ্ঞানের উদয় হইলে যে শুদ্ধ বোধরূপ স্থিতি লাভ হয় তাহাতে পশুত্ব নিবৃত্ত না হইলেও সংসার ও জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত্তন বিবর্ত্তন চিরদিনের জন্য নিবৃত্ত হইয়া যায়। এই কৈবল্য অবস্থার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

জিজ্ঞাসু। ইহার পরেও কি কৈবল্য অবস্থা আছে? যদি থাকে তবে উহার হেতুভূত বিবেক-জ্ঞান কি প্রকার?

বক্তা। এই দ্বিবিধ কৈবল্যের উপরে উত্তম কৈবল্যের স্থান জানিতে হইবে। ঐ অবস্থায় আত্মা মহামায়া হইতেও নিজের স্বরূপকে পৃথক্ রূপে সাক্ষাৎকার করে। কিন্তু এই অবস্থা সাধারণ জীব ত দূরের কথা—কেবলীর পক্ষেও অতি দুর্লভ। ইহার কারণ এই যে মহামায়া-দেহ প্রাপ্ত না হইলে ঐ দেহ হইতেও পৃথক্‌রূপে নিজেকে জানিবার প্রশ্ন উঠিতে পারে না।

মহামায়ার দেহ একমাত্র শ্রীভগবানের অনুগ্রহ ভিন্ন প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। ইহা অধোবর্ত্তী কালের রাজ্যের দেহ নহে। কুণ্ডলিনী শক্তি উদ্বুদ্ধ হইয়া চিন্ময় জ্যোতি দ্বারা এই দেহ রচনা করে। সদ্-গুরুর কৃপা-কটাক্ষ ব্যতিরেকে সুপ্ত মহামায়া ক্ষুব্ধ হয় না এবং দেহও রচনা করে না। এই দেহকে Spiritual Body বলিয়া St. Paul, St. John প্রভৃতি প্রাচীন পাশ্চাত্য সাধকগণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। গুরুশক্তির ক্রিয়া ভিন্ন এই দেহ উৎপন্নই হয় না। মলপাক, কর্ম্মসাম্য প্রভৃতি নিমিত্ত সহকারে অথবা বিনা নিমিত্তে পরমেশ্বরের স্বাতন্ত্র্য বা শ্রীভগবানের অনুগ্রহ-শক্তির সঞ্চার

হইলে বিশুদ্ধ মহামায়া হইতে এই দেহ রচিত হয় এবং দীক্ষার্থী শিষ্য উহা প্রাপ্ত হয়। এই দেহ দ্বারা শুদ্ধ আত্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান হয় এবং বিশুদ্ধ বাসনা-ক্ষয়ের উপযোগী পন্থা খুলিয়া যায়। এই দেহের কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেলে ইহার প্রতিও বৈরাগ্য হয় এবং নিজের আত্ম-স্বরূপ যে ইহা হইতেও ভিন্ন তাহা অনুভূত হয়। ইহাই শ্রেষ্ঠ কৈবল্য অবস্থা। পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার কৈবল্য হইতে ইহার উৎকর্ষ অধিক। মহামায়ার দেহকে বৈন্দব দেহ বলে। শুদ্ধ আত্ম-স্বরূপ যে ইহা হইতেও ভিন্ন তাহা এই কৈবল্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

জিজ্ঞাসু। যাহাকে শিবত্ব অথবা ভগবত্তা বলা হয় ইহাই কি সেই অবস্থা ?

বক্তা। না। ভগবত্তা অথবা শিবত্ব আত্মার পরম স্বরূপ। আংশিকভাবে মহামায়ার দেহ-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহা অধিগত হয়, কিন্তু উহার পূর্ণ প্রাপ্তি মহামায়া দেহ থাকা পর্য্যন্ত হইতে পারে না। মহামায়া-দেহের প্রাপ্তি দিব্যজ্ঞান হইতে সম্ভবপর হয়। উহা শুষ্কজ্ঞানের কার্য্য নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে দিব্যজ্ঞান ভগবৎ-অনুগ্রহ-সাপেক্ষ। দিব্যজ্ঞানের প্রভাবেই পশুত্ব কাটিয়া যায় এবং শিবরূপী আত্মা পুনর্ব্বার শিবধর্ম্মে অন্বিত হয়। মহামায়ার রাজ্যে এই ব্যাপারের সূচনা হইলেও পূর্ণাভিষেক রূপ পূর্ণত্ব লাভ ঘটে না। পূর্ব্বে অনাত্মাতে আত্মবোধ রূপ অজ্ঞানের কথা বলিয়াছি। কিন্তু আত্মাতে অনাত্মবোধ অজ্ঞানও বিদ্যমান আছে। পূর্ণ শিবত্বের পূর্ব্বে উহাও নিবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। উহা প্রকৃতির রাজ্যে অথবা

মায়ার রাজ্যে অর্থাৎ অধোবর্ত্তী কালের রাজ্যে হইতে পারে না, এমন কি কৈবল্য-অবস্থাতেও হইতে পারে না। কারণ কৈবল্য অবস্থা বিদেহ অবস্থা,—বিদেহ-দশাতে কর্ম্মের সম্ভাবনা থাকে না। জ্ঞান ও ক্রিয়া উভয়ের সম্মিলন হইতেই দিব্য জ্ঞানের বিকাশ হয়। সুতরাং দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে জ্ঞানের পূর্ণতা সিদ্ধ হইলেও ক্রিয়া-শক্তির পূর্ণতা ধীরে ধীরে ক্রমশঃ ঘটিয়া থাকে বলিয়া পরিপূর্ণতা আসে না। ক্রিয়া-শক্তির বিকাশ না হইলে স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ কি প্রকারে হইবে ? স্বাতন্ত্র্যের অভিব্যক্তি ভিন্ন পরমেশ্বরত্ব অসম্ভব। দিব্য জ্ঞানের পথে সম্যক্ আত্মজ্ঞানের উন্মেষ হয় বলিয়া প্রথমে সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করিয়াও তখনই সঙ্গে সঙ্গে ইষ্টসিদ্ধি ঘটে না, পূর্ণ মহেশ্বরত্বের ও উদয় হয় না। তাহা জ্ঞানোত্তর ক্রিয়া-শক্তির ক্রমবিকাশের ফলে ধীরে ধীরে হইয়া থাকে। এই ক্রিয়া-শক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই আত্মাতে অনাত্মবোধ রূপ অজ্ঞান কাটিতে থাকে। আত্মাতে আত্মবোধই পূর্ণ অবস্থা বা সম্যক্ জ্ঞান। অবিবেক রূপ অজ্ঞান মূল বীজভূতরূপে তখনও যাহা থাকে তাহা কাটিয়া গেলে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-কৈবল্যের উদয় হয়। ইহাই আত্মস্বরূপের বিশুদ্ধতম স্থিতি, বস্তুতঃ ইহাই আত্মার নিষ্ক্রিয় শব-ভাব। অভিষেকের ফলে বিশুদ্ধ চিৎ-শক্তির অভিব্যক্তি হয়। তখন ঐ শব শিবরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই শিবই মহেশ্বর। দীক্ষাকালে অর্থাৎ দিব্য জ্ঞানের উন্মেষ কালে যে সম্যক্ জ্ঞানশক্তি সঞ্চারিত হইয়াছিল তাহা এই অবস্থায় পূর্ণ ক্রিয়াশক্তির সহিত অভিন্ন হইয়া ইচ্ছাশক্তিরূপে ফুটিয়া আত্মাতে স্থান লাভ করে।

এই ইচ্ছাশক্তিই পরমেশ্বরের পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য অর্থাৎ শ্রীভগবানের পূর্ণ ভগবত্তা। অবশ্য ইচ্ছার অতীত স্থিতিও আছে— তাহা অব্যক্ত।

জিজ্ঞাসু। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে অজ্ঞান যেমন দুই প্রকার, অজ্ঞানের বিরোধী জ্ঞানও সেইরূপ দুই প্রকার। প্রথম জ্ঞানের নাম শুষ্ক জ্ঞান এবং দ্বিতীয় জ্ঞানের দিব্যজ্ঞান। ইহা কি ঠিক নহে ?

বক্তা। সত্যই তাহাই। শুষ্ক জ্ঞানের ফলে ভগবত্তা লাভ ত হয়ই না, শ্রীভগবানের রাজ্যে সেবকরূপেও প্রবেশ করা যায় না। কিন্তু উহা বৃথা নহে, কারণ কর্ম্মবীজ নাশ করিয়া মায়াকে তিরোহিত করিয়া বিশুদ্ধবোধ রূপে আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করা উহারই কার্য্য। এ অবস্থায় সংসারে পতনের আশঙ্কা থাকে না, ইহা সত্য। কিন্তু উর্দ্ধে উত্থানেরও সম্ভাবনা থাকে না।

জিজ্ঞাসু। শুষ্ক জ্ঞানের পথ আলাদা, দিব্য জ্ঞানের পথ আলাদা। উভয়ের ফলও পৃথক্। মহত্ত্ব বিষয়েও উভয়ে তারতম্য আছে।

বক্তা। বিবেক বা বিয়োগের পথে শুষ্ক জ্ঞানের উদয় হয়, যোগের পথে দিব্যজ্ঞানের উদয় হয়। মহত্ত্ব দিব্য জ্ঞানেরই অধিক। কারণ শুষ্ক জ্ঞানের যাহা লক্ষ্য তাহা দিব্যজ্ঞান হইতেও সিদ্ধ হইতে পারে—বস্তুতঃ তাহা হয়ই। কিন্তু শুষ্ক জ্ঞান হইতে দিব্যজ্ঞানের লক্ষ্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না। শুষ্কজ্ঞানে যে অজ্ঞান কাটে তাহার ফলে কর্ম-বন্ধন স্থগিত হইয়া যায় এবং আত্মা

কালের ঘূর্ণি হইতে অব্যাহতি লাভ করে। এ স্থিতি অবশ্য জ্ঞানেরই স্থিতি। জাগতিক হিসাবে দেহ-বীজ পর্য্যন্ত নষ্ট হয় বলিয়া আর দেহারম্ভও ঘটে না। কিন্তু ভগবানের সঙ্গে যোগ লাভ হয় না—ভগবত্তা ত দূরের কথা।

সিদ্ধ পুরুষ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট্

আমাদের দেশে সকলেই বাল্যকাল হইতে সিদ্ধ পুরুষের কথা শুনিয়া আসিয়াছে। সিদ্ধ পুরুষ কাহাকে বলে তাহা না জানিলেও তাহাদের সাধারণ ধারণা এই যে, মানুষ নিজের জীবনে এমন একটি অলৌকিক অবস্থা লাভ করিতে পারে যখন সে আর সাধারণ মানুষ থাকে না—তাহার অলৌকিক শক্তি লাভ হয় এবং সে মনুষ্য-জীবনের একটি মহান্ আদর্শ প্রাপ্ত হইয়া জীবনের পথে অনেকটা পূর্ণত্ব লাভ করিয়া থাকে। যে কোন সাধনায় সফল হইলেই সাধককে সিদ্ধ বলা যাইতে পারে ইহা সত্য, কিন্তু সিদ্ধ পুরুষ বলিতে সাধারণতঃ লোকে ঐ সকল পুরুষকে লক্ষ্য করে না। প্রাচীন কালে চুরাশী জন সিদ্ধ পুরুষের কথা সাহিত্যে শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সিদ্ধ পুরুষের সংখ্যা অনন্ত।

আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সিদ্ধ পুরুষ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না। সিদ্ধাবস্থা লাভের উপায় সকল ধর্ম্মেই আছে। সুতরাং হিন্দু ধর্ম্মের ন্যায় খৃষ্টীয়, সুফী, বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়েও সিদ্ধ পুরুষ আছেন। কি প্রকারে মনুষ্য প্রকৃত সিদ্ধ পদবীতে আরূঢ় হইতে পারে সেই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

(২)

সমগ্র সৃষ্টি অথবা বিশ্বের মূলে এমন একটি মহাশক্তিধর সত্তা আছেন যাঁহাকে অদ্বৈত ও অখণ্ড না বলিয়া পারা যায় না। এই সত্তাটি চৈতন্য-স্বরূপ এবং আনন্দ-স্বরূপ—ইহাতে অনন্ত প্রকার অনন্ত শক্তি অভিন্ন ভাবে নিহিত রহিয়াছে। ইনি এক ও অদ্বিতীয়, অনাদি ও অনন্ত, এবং অক্ষত ও নির্ব্বিকার—ইনি পূর্ণ সত্যস্বরূপ। দেশ কাল ও নিমিত্ত ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কার্য্য-কারণ-ভাবের নিয়ম ও শৃঙ্খলা দ্বারা ইনি নিয়ন্ত্রিত হন না। মনুষ্য জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটি অবস্থার সহিত পরিচিত, কিন্তু পূর্ণ সত্য অর্থাৎ ভগবৎ-স্বরূপ এই ত্রিবিধ অবস্থায় পাত্রে পারদবৎ থাকিয়াও উর্দ্ধে নিত্যই অতি-চেতন অবস্থায় বিদ্যমান থাকেন। এই অতিচেতন অবস্থা চৈতন্যেরই অবস্থা। ইহাকে তুরীয় অবস্থা বলা যাইতে পারে—ইহা অপ্রতিহত এবং নিরবচ্ছিন্ন সাক্ষাৎকারাত্মক প্রকাশের অবস্থা। কিন্তু ইহার পরে এমন একটি গভীর অবস্থা আছে যেখানে বোধেরও উন্মেষ নাই এবং যেখানে বোধ-সহকারে প্রবেশ করাও যায় না। বস্তুতঃ ইহা কোন অবস্থাই নহে, একটি স্থিতি মাত্র। অতিচেতন অবস্থারও অতীত বলিয়া ইহাকে এক হিসাবে অচেতন অবস্থা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু ইহা অচেতন অবস্থা নহে, বরং চৈতন্যের ঘনীভূত অবস্থা। ইহা প্রকাশের ঘনীভূত অপ্রকাশ। ইহা আপাতদৃষ্টিতে জড় বলিয়া প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ ইহা জড় ও চেতন এই দ্বন্দ্বভাবের অতীত। ইহাই ভগবানের স্বরূপ। তাঁহার অনন্ত শক্তি থাকিলেও এই স্থিতি

হইতে ঐ সকল শক্তির প্রয়োগ সূক্ষ্ম বা স্থূল কোন স্তরেই হয় না। যিনি পূর্ণ সত্য, যিনি সত্যের অপার ও অতল প্রকাশ, তিনি নিজে তৎস্বরূপ হইয়াও তাহা যেন জানেন না। এই স্থিতি কিয়দংশে আমাদের পরিচিত গভীর সুষুপ্তির অনুরূপ।

(৩)

কিন্তু এই স্থিতি হইতে জগতের সৃষ্টি হয় না। যাঁহাকে আমরা জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারকর্ত্তা বলিয়া বর্ণনা করি তিনি এই পূর্ণ সত্য হইতে অভিন্ন হইলেও চেতন পুরুষ। তিনি নিরন্তর সৃষ্টি ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকেন এবং সে বোধও তাঁহার আছে। কিন্তু তিনিই যে অখণ্ড অনন্ত পরম তত্ত্ব তাহা সৃষ্টিকর্ত্তা রূপে তিনি যেন জানেন না এবং তাহা জানিবার প্রয়োজনও যেন হয় না। মনুষ্য সিদ্ধাবস্থাতে যে পূর্ণত্ব লাভ করে তাহার সঙ্গেও তাঁহার যেন কোন সম্বন্ধ নাই। তাঁহার একমাত্র সম্বন্ধ সৃষ্টি প্রভৃতি ব্যাপারের সহিত। এই সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর দেশ ও কালের অতীত নহেন এবং কার্য্য-কারণ-ভাবের সহিত সুপরিচিত। তাঁহার বোধ-কেন্দ্র হইতেই অনন্ত বিশ্বের নির্গম হইয়া থাকে। যত দিন তিনি ক্রিয়াশীল থাকেন সেই সময়-পরিমাণকে এক হিসাবে কল্প বা মহাকল্প নাম দেওয়া যাইতে পারে। সমস্ত বিশ্বই তাঁহার কর্ম্মের ক্ষেত্র।

যাহাকে আমরা জীব বলিয়া বর্ণন করি তাহাকেও পূর্ণ সত্য হইতে পৃথক্ বলা চলে না। ঈশ্বরও পূর্ণ হইতে ভিন্ন নহেন এবং জীবও ভিন্ন নহে, কিন্তু ঈশ্বর চেতন এবং জীব আংশিক চেতন ও আংশিক ভাবে অচেতন। জীব তাহার ক্ষুদ্র

অংশটিকে জানে, কিন্তু সে নিজেই যে বাস্তবিক পক্ষে আত্মা—যাহা অনন্ত এবং অখণ্ড—তাহা সে জানে না। দেশ ও কাল এবং কার্য্য-কারণ ভাবের নিয়ম জীবকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। জীবও পূর্ব্ব বর্ণিত কল্প বা মহাকল্প পর্য্যন্ত অবস্থান করে, তাহার পর সে নিজেকে পূর্ণের সহিত অভিন্ন বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিলে দেশ-কালের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া পূর্ণ রূপে স্থিতি লাভ করে। আত্ম-স্বরূপের সহিত মন প্রাণ প্রভৃতি উপাধির যোগ হইলে জীবরূপে আত্মার আবির্ভাব হয়। ভগবৎ-সাক্ষাৎকার করিতে হইলে উপাধিমূলক এই জীবভাবটি ত্যাগ করিতে হইবে। শুধু মৃত্যুর ফলে এই অবস্থার প্রাপ্তি ঘটিতে পারে না। কারণ জাগতিক বাসনা থাকা পর্য্যন্ত মৃত্যুর পরেও জীব-ভাব কাটে না এবং পূর্ণভাবে বাসনা কাটিয়া গেলে দেহ থাকিতেও মুক্তির আস্বাদন পাওয়া যায়। এই সকল বাসনা বা সংস্কারকে জ্ঞান-পূর্ব্বক রোধ করিতে হইবে। মনুষ্যের চিত্ত এই সকল সংস্কারের দ্বারা সর্ব্বদাই অনুবিদ্ধ থাকে বলিয়া চৈতন্য নিজেকে নিজে উপলব্ধি করিতে পারে না। জ্ঞানপূর্ব্বক এই সকল সংস্কারকে মুছিয়া ফেলিতে পারিলে প্রকৃত সত্য-দর্শন প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর। জীব-ভাব-বর্জ্জিত আত্মা বস্তুতঃ শুদ্ধ আত্মা ভিন্ন অপর কিছু নহে। সুতরাং জীবনের ধারা থাকিতে থাকিতেই জীব-ভাবের অতীত হওয়া আবশ্যক। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যই এই যে বোধাতীত পরম তত্ত্বকে বোধে ধারণ করিয়া সংসারের এবং দেহের যাবতীয় বাসনা বর্জ্জন করিতে হইবে। প্রতি মনুষ্যই নিদ্রাকালে বাসনা বর্জ্জন করিয়া থাকে ইহা সত্য, কিন্তু ইহা জ্ঞান পূর্ব্বক করে না, কিন্তু

অচেতন ভাবে প্রাকৃতিক নিয়মে করিয়া থাকে। তাই তাহাকে পূনর্ব্বার উঠিতে হয়। এই জন্য নিদ্রা অথবা সাধারণ মৃত্যু সকল মনুষ্যের প্রকৃত কাজে আসে না, গভীর নিদ্রাতেও কিছু না কিছু ত্রুটি থাকিয়াই যায়। কারণ যদিও নিদ্রাতে মনুষ্যের দেহ-স্মৃতি থাকে না তথাপি জাগিয়া উঠিলে সেই স্মৃতি পুনর্ব্বার ফুটিয়া উঠে। এই গভীর নিদ্রা মৃত্যুর ফলে ঘটিয়া থাকে। তখন জাগিয়া উঠিয়া জীব দেখিতে পায় যে সে নূতন দেহে নূতন আবেষ্টনের মধ্যে রহিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্ব-স্মৃতির রক্ষা হয় না বলিয়া নূতন বলিয়া বুঝিতে পারে না। এইজন্য যোগিগণ বলিয়া থাকেন যে মরিয়া মরা নিস্ফল, কিন্তু জীয়ন্তে মরা আবশ্যক। জীয়ন্তে মরা কাহাকে বলে ? বোধাতীত অবস্থার বোধ সম্যক্ প্রকারে রক্ষা করা, ইহাই জীয়ন্তে মরা। এই অবস্থায় একদিকে লিঙ্গহীন নির্ম্মল আত্ম-স্বরূপের পূর্ণ বোধ জাগিয়া থাকে ও অন্যদিকে দেহ মন ও বিশ্বের চেতনা থাকে না।

(৪)

জীব মায়াজাল ভেদ করিয়া সৃষ্টিকে ভেদ করিতে পারিলে নিজেকেই শিবরূপে প্রাপ্ত হইতে পারে। ইহাই তাহার জীবনের সার্থকতা। সে তখন তাহার, নিজের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করে। ইহাই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। তাহার নিকট স্রষ্টা ও সৃষ্টির ভেদ অর্থাৎ জীব জগৎ ও ঈশ্বরের ভেদ আর থাকে না। সে আর পূর্ব্বের ন্যায় তখন দেশ কাল ও নিয়তির অধীন থাকে না। সে তখন নিজেকেই সর্ব্বশক্তিমান্ পূর্ণসত্য ব.লিয়া চিনিতে পারে। তাহার এই স্থিতি আর কখনও ভগ্ন হইবার সম্ভাবনা

থাকে না। কোনও প্রকার জাগতিক পরিবর্ত্তন তাহাকে আর বিচলিত করিতে পারে না। সে বুঝিতে পারে যে, সে পশুপক্ষী কীট-পতঙ্গ স্থাবর-জঙ্গম সকলের মধ্যে যেমন ছিল তেমনি এই অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় সত্তাতেও ছিল। ছিল কেন?—আছে। কিন্তু ইহা সে পূর্ব্বে বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু জ্ঞানের উদয়ে ইহা তাহার বোধগম্য হইয়াছে। সর্ব্বশক্তিমান্ পরম তত্ত্বের সহিত জ্ঞান ও চৈতন্যের যোগ হওয়াতে এই অবস্থার উদয় হইয়াছে। ইহাই সিদ্ধাবস্থা। ইহা নিত্য জাগ্রৎ অবস্থা। জ্ঞাতা জ্ঞেয় ও জ্ঞান, দ্রষ্টা দৃশ্য ও দৃষ্টি এবং প্রেমিক প্রেমপাত্র ও প্রেম এখানে অভিন্ন। একমাত্র সিদ্ধ পুরুষই এই অদ্বয় স্থিতি অনুভব করিতে সমর্থ। অতীত অনাগত ও বর্ত্তমান তিন কালেই তিনি এক। বস্তুতঃ সকলেই তাহাই, কিন্তু অজ্ঞান অবস্থায় তাহা বুঝিতে পারে না।

প্রকৃত প্রস্তাবে এক পরমাত্মাই পরম তত্ত্ব—ঈশ্বর জীব ও সিদ্ধ পুরুষ রূপে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন প্রকার খেলা করিতেছেন। পরমাত্মা অবস্থায় পরমতত্ত্ব এক অখণ্ড ও অনন্ত স্বরূপে জ্ঞানের অগোচর ভাবে অনন্ত শক্তি, অনন্ত সত্তা ও অনন্ত চৈতন্য ধারণ করিয়া আছেন। ঈশ্বররূপে এই সকল শক্তিই তাঁহার আছে, কিন্তু তিনি শুধু বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার ব্যাপার অনুভব করিতেছেন। জীব রূপেও তিনি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, কিন্তু নিজেকে বাসনা দ্বারা বদ্ধ করিয়া সীমাবদ্ধরূপে অনুভব করিতেছেন। তাহার সিদ্ধ অবস্থাটি সেবাত্মক অবস্থা। একমাত্র এই অবস্থায় তিনি চেতনভাবে তাঁহার অনন্ত শক্তির সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন।

(৫)

এই যে সিদ্ধাবস্থার কথা বলা হইল ইহাই ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের পরের অবস্থা। ভগবৎ-সাক্ষাৎকার বলিতে শুধু ভগবদ্-বিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞান বুঝায় না—ইহা প্রকৃতই ভগবানের সহিত যুক্ত অবস্থা। এই অবস্থার প্রাপ্তি না ঘটিলে কোন সাধককেই যোগী বলিয়া বর্ণনা করা চলে না। এই অবস্থায় জীব নিজের পৃথক্ সত্তাবোধ হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্ব প্রকার দ্বৈত ভাবকে অতিক্রম করে। পরমাত্মার সহিত তাহার যে তাদাত্ম্য রহিয়াছে তাহার স্থায়ী জ্ঞান তখন প্রতিষ্ঠিত হয়। জীব যদিও তখন উপলব্ধি করে যে, এই অবস্থা তাহার অনাদিকাল হইতেই ছিল তথাপি সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বে ইহা তাহার বোধগম্য এবং আস্বাদনের বিষয় রূপে ছিল না, ইহা বলিতেই হইবে। যে অসীম এবং অব্যাহত আনন্দ সিদ্ধ পুরুষগণ অনুভব করেন তাহা কোন অভূতপূর্ব্ব বস্তু নহে। তাহা পরমাত্মস্বরূপে অনাদিকাল হইতেই ছিল, কিন্তু সাক্ষাৎকারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উহার প্রকাশ হয় নাই। সাধক সাধনা করিয়া সিদ্ধ হইলে ইহা মনে করা চলে না যে, সে কোন একটি পৃথক্ স্বরূপ প্রাপ্ত হইল। সে পূর্ব্বেও যাহা ছিল তখনও তাহাই থাকে। তাহার স্বরূপের কোনই পরিবর্ত্তন হয় না। তবে যাহা পূর্ব্বে সে জানিত না, সাক্ষাৎকারের পরে সে তাহা জানিতে পারে, ইহাই মাত্র ভেদ। অনাদিকাল হইতে এই যে ক্রম-বিকাশের খেলা চলিতেছে ইহা একটি খেলা মাত্র। ইহা মায়ার বিলাস, ইহার কোনই বাস্তবিক সত্তা নাই। ইহা আত্মহারা জীবের নিজেকে ফিরিয়া পাইবার কৌশল মাত্র।

জগতের মায়াজালে জীব আবদ্ধ হইয়া পড়ে বলিয়া এই খেলাটি সময় সময় অত্যন্ত কষ্টদায়ক হইয়া পড়ে। মায়াজালে জড়িত হইবার মূল কারণ জীবের অহঙ্কার। জীব প্রথমাবস্থায় অহঙ্কার-শূন্যই থাকে, কিন্তু তাহার চৈতন্যের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অহঙ্কারের বিকাশ হয়। এই অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়াই মোহ অথবা অবিদ্যা গুপ্ত ভাবে বিদ্যমান থাকে। ইহাই ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক। জীবের নিজ স্বরূপে অনন্ত জ্ঞান নিহিত থাকিলেও তাহার অভিব্যক্তির পথে ইহাই একমাত্র বাধক। গভীর নিদ্রার সময় জীব পরমাত্মার সহিত তাদাত্ম্য উপভোগ করে, কিন্তু এই উপভোগের সচেতন অনুভব হয় না। সুষুপ্তি কালে জগতের ভ্রম অল্প সময়ের জন্য তিরোহিত হয়, কারণ তখন চেতনা স্তম্ভিত অবস্থায় থাকে। কিন্তু তাহা হইলেও ভগবান্ বা আত্ম স্বরূপের সচেতন অনুভূতি ফুটে না, কারণ অহঙ্কার সম্পূর্ণ নিবৃত্ত না হইলে এবং চৈতন্যের ধারা ভগবানের দিকে উন্মুখ না হইলে শুধু বাহ্য জগতের জ্ঞান নিবৃত্ত হইলেই ভগবৎ-সাক্ষাৎকার সম্ভবপর হয় না। কখনও কখনও এমন হয় যে সুষুপ্তির গাঢ়তা ভাঙ্গিয়া যায় অথচ জাগ্রৎ অবস্থার উদয় হয় না। এই প্রকার সন্ধিক্ষণে চৈতন্য নিরালম্ব ভাবে অল্পক্ষণের জন্য আত্মপ্রকাশ করে। এইটি বোধের অবস্থা—জড়ত্ব নহে। কিন্তু কিসের বোধ? বিশ্বের নহে। এই ব্যাপক অভাবের বোধটি তখন জাগিয়া উঠে। ইহাকেই মহাশূন্যাবস্থা বলে। ইহাই ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের পূর্ব্ব সূচনা। চৈতন্য জগতের ইন্দ্রজাল হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া অহঙ্কারে নিহিত অনন্ত জ্ঞানকে

প্রকাশিত করিলে ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের প্রকাশ-কাল বলা যাইতে পারে। একমাত্র সিদ্ধ পুরুষেই এই প্রকার অনন্ত জ্ঞানের বিকাশ সম্ভবপর। সিদ্ধ পুরুষে পরমাত্মা নিজেকে অনন্ত বলিয়া জানেন, কিন্তু এই জ্ঞান সাধকাত্মাতে অথবা অসাধক অবস্থায় বদ্ধ আত্মাতে যে পরমাত্মা আছেন তাহাতে থাকে না। এইজন্যই ভগবৎ-সাক্ষাৎকার ব্যক্তিগত ব্যাপার। একই পরমাত্মা সর্ব্বত্র বিত্তমান থাকিলেও এক আধারে তাঁহার অনন্ত স্বরূপ-জ্ঞান খুলিয়া যায়, কিন্তু অন্য আধারে যায় না। যদি তাহা যাইত তাহা হইলে একজনের ভগবত্তা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই জগতের বিচিত্র লীলার অবসান হইয়া যাইত। অবশ্য যে কোন আত্মা সাধন-বলে যথাসময়ে পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ তাহাতে কোন বাধা নাই। অহঙ্কারের গ্রন্থি এবং জগতের ইন্দ্রজাল হইতে যে আত্মা মুক্তিলাভ করে তাহারই পক্ষে পরমাত্মভাবের স্ফুর্ত্তি সম্ভবপর, সকলের পক্ষে নহে।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের ফলে আত্মা কিছু প্রাপ্ত হয় কি ? এই প্রশ্নের সমাধানের পূর্ব্বে প্রাপ্তি শব্দের অর্থ কি তাহা বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তিকে প্রাপ্তি বলে, আবার নিত্য-প্রাপ্ত বস্তুও মোহ বশতঃ অপ্রাপ্ত বলিয়া প্রতীত হইলে মোহ-নিবৃত্তি দ্বারা নিত্য-প্রাপ্ত অবস্থার পুনরভিব্যক্তিকেও প্রাপ্তি বলে।

আত্ম-প্রাপ্তি বা ভগবৎ-প্রাপ্তি এই দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্গত। ইহা অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি নহে, তথাপি ইহার মহত্ত্ব অপরিসীম। অসিদ্ধ পুরুষ নিজেকে সীমাবদ্ধ মনে করেও সুখ দুঃখ ভোগ

করে, কিন্তু সিদ্ধ পুরুষ ইহার ঠিক বিপরীত। তাঁহার আনন্দ ও জ্ঞানের অন্ত নাই।

ভাগবত জ্ঞানের প্রাপ্তি নানা উপায়ে হইতে পারে। প্রেমই তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপায়। প্রজ্ঞান ইহার অন্তর্গত। বিচার-মূলক জ্ঞান অন্য প্রকার। প্রেমের দ্বারাই বুদ্ধিকে অতিক্রম করিতে পারা যায় ও পূর্ণ আত্মবিলোপ সংঘটিত হয়। ইহার পর ভগবানের সঙ্গে মিলন হয়। দিব্য প্রেমের প্রেমিক নিজের ব্যক্তিগত সত্তা ভুলিয়া যায় এবং ক্রমশঃ মানবীয় সীমার গণ্ডী অতিক্রম করে। ক্রমবিকাশের ফলে নিজের পরম সত্তা অভিব্যক্ত হয়। যখন মায়া ও দ্বৈতপ্রপঞ্চ হইতে আত্মা মুক্ত হয়, তখন সে একীভাব প্রাপ্ত হয়। তাই ঐ সময় মূল অদ্বয় সত্তার আকর্ষণ তাহার মধ্যে জাগিয়া উঠে। এই পথে প্রেমের প্রেরণাই বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য।

এই পথের তিনটি অংশ বা বিভাগ আছে। প্রথম অংশে পর পর অনেকগুলি স্তর আছে। এইগুলিকে ভূমি বলা যাইতে পারে। দিব্য জ্ঞানের সূত্রপাত হইতে পূর্ণ আত্মবিলোপ পর্য্যন্ত এই অংশটি বিস্তৃত। এই পথের চরমাবস্থাতে অহঙ্কার-নাশ সিদ্ধ হয় ও মায়িক ধারা হইতে সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। পরে বিচ্ছেদের সংস্কার পর্য্যন্ত কাটিয়া যায়। সুফী সাধকগণ এই স্থিতিকে 'ফনা' বলিয়া বর্ণনা করেন। এই দীর্ঘ পথের যে যাত্রী তাহার সম্বল কি? শুদ্ধ আত্মা ও তাহার আনুষঙ্গিক চেতনা-সংস্কার, অহঙ্কার ও মন। এই অহঙ্কার শুদ্ধ আত্মারই বিকৃত রূপ— মিথ্যা রূপ। ইহার পূর্ণ লোপই স্থিতির লক্ষ্য। অহঙ্কার

নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্ম, বাসনা, সংস্কার প্রভৃতি সব লুপ্ত হয়। এগুলি অহঙ্কারে জড়িত হইয়া মনোময় কোষে অবস্থান করে। তখন একমাত্র চেতনা অবশিষ্ট থাকে—তাহার লোপ হয় না। সব গুণকর্ম্মাদির অভাব হয়, জ্ঞানেরও অভাব হয়। কিন্তু এই অভাবের চেতনা বা বোধটা থাকে। ইহা শূন্যের বোধ মাত্র। অহঙ্কার থাকে না বলিয়া "আমি অকিঞ্চন" এই প্রকার ভাবও থাকে না। তখন ভগবান্ নাই, বিশ্ব নাই, স্রষ্টা নাই, সৃষ্টি নাই, কিছু নাই—অথচ চেতনা আছে। ইহা অচেতন চেতনা। ইহা বুদ্ধি দ্বারা ধারণা করা কঠিন। এই চেতনা স্থূল, সূক্ষ্ম, মিথ্যা, সত্য, জগৎ বা ভগবানের বিষয়ে নহে—অথচ চেতনা আছে। ইহা উপরাগ রহিত চেতনা। সংস্কার, অহঙ্কার, মন প্রভৃতি লুপ্ত হওয়ার পরও চেতনা থাকে বলিয়া তখন প্রকৃত আমির দিকে লক্ষ্য যায়। বিকৃত অহং নাই, তাই শুদ্ধ অহং ভাসে।

সাধারণ মানব-চেতনাতে সংস্কার বশতঃ এই প্রকৃত আমি ধরা পড়ে না। ঐ চেতনা ভ্রান্ত। সৃষ্টির পূর্ব্বে পরমাত্মাও অন্তশ্চেতন ছিলেন। সিদ্ধগণ বলেন যে তিনি পরমাত্মা বলিয়া নিজেকে চিনিতেন না। তাই বলা চলে যে তাঁহার "প্রকৃত আমি" ছিল না। আপাততঃ বিরুদ্ধ মনে হইলেও ইহা সত্য কথা। মিথ্যাজ্ঞানের উপরই সত্যজ্ঞান নির্ভর করে। সংস্কার-জন্য মিথ্যাজ্ঞান মূলক মিথ্যা অহং এর উপরেই প্রকৃত আমি নির্ভর করে।

পথের প্রথম অংশের চরম লক্ষ্য যে শূন্য অবস্থা তাহার কথা বলা হইল। এবার দ্বিতীয় অংশের কথা বলিতেছি। পূর্ব্বোক্ত

চেতনা ক্রমশঃ প্রকৃত আমিকে প্রাপ্ত হইবে। ইহার ইতিহাসই দ্বিতীয় অংশের বিষয়। এই সময়ে ঐ অচেতন চেতনা রূপান্তরিত হইয়া "আমি চেতনা" এইরূপ ধারণ করে। এই বোধই পরমাত্মার বোধ যাহা "আমি পরমাত্মা" বা "অহং ব্রহ্মাস্মি" রূপে আত্মপ্রকাশ করে। দ্বিতীয় অংশের অবসানে এই উপলব্ধি জন্মে। পূর্ব্বোক্ত সুফীগণের পরিভাষাতে ইহাই 'বকা'। ইহাই প্রকৃত ভগবত্তার বোধ।

কিন্তু ইহাও সিদ্ধ পুরুষের অবস্থা নহে। সিদ্ধ পুরুষের স্থিতি যে "অহং ব্রহ্মাস্মি" স্থিতি বা ব্রাহ্মীস্থিতি হইতে উৎকৃষ্ট তাহা বলা হইতেছে না। তবে উভয়ে ক্রিয়াগত পার্থক্য আছে বলিতেই হইবে। বস্তুতঃ "আমি ব্রহ্ম" এই দশা হইতে উচ্চতর অবস্থা হইতেই পারে না। চরম অতিচেতনা অবস্থা হইতে অধিকতর উৎকর্ষ কল্পনীয় নহে। ব্রহ্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে সাধকের অপ্রাপ্ত বা অসিদ্ধ কিছুই থাকে না, ইহা সত্য। মন, স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ, দেশ, কাল, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, লোক-লোকান্তর কিছুই তখন থাকে না। ইহা চিন্তা ও কল্পনার অতীত। নিত্য, স্থির, ত্রিপুটীরহিত বিশুদ্ধ অদ্বয় স্থিতি। তখন একই থাকে—দ্বন্দ্বের ক্রিয়া থাকে না। সকল সাধনার ইহাই চরম সিদ্ধির অবস্থা।

সিদ্ধিলাভের পর কেহ কেহ দেহ থাকা সত্ত্বেও আর অগ্রসর হন না। স্থূল ও সূক্ষ্ম চেতনাতে ইঁহাদের যোগ থাকে না। ইঁহারা পূর্ণতার প্রতীক স্বরূপ। ইঁহাদের সত্তা অনন্ত ও অসীম জ্ঞানময়।

কিন্তু পথের আরও একটি অংশ আছে—উহাকে তৃতীয় অংশ

বলা হইয়াছে। উহা সকলের জন্য নহে। উহা সদ্ গুরুর বিশ্বোদ্ধার কার্য্যে যাঁহাদিগকে প্রবৃত্ত হইতে হইবে তাঁহাদের জন্য। পথের তৃতীয় অংশে সূক্ষ্ম ও স্থূল চেতনার পুনরুদ্ধার ঘটিয়া থাকে। কারণ তাহা না হইলে সাধারণ জীবের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় না ও শ্রীভগবানের অনুগ্রহ-বিস্তার রূপ জগদ্-ব্যাপারে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভবপর হয় না। আধিকারিক পুরুষগণের জন্য পথের এই তৃতীয় অংশ উদ্দিষ্ট। আগমে নির্ব্বাণ-দীক্ষার পরে আচার্য্য-দীক্ষার সম্ভাব্যতা অঙ্গীকৃত হইয়াছে। সিদ্ধ পুরুষের অতিচেতনা ত অক্ষুণ্ণই থাকে, অথচ সৃষ্টিবিষয়ক চেতনারও অভিব্যক্তি থাকে। পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্মনিষ্ঠ অর্থাৎ 'মজুব' ও সদ্-গুরু ভাবাপন্ন অর্থাৎ 'কুতুব'সংজ্ঞক পুরুষে স্থিতিগত কোন পার্থক্য নাই—অথচ ভাবগত পার্থক্য আছে। ব্রহ্মনিষ্ঠের দৃষ্টিতে সৃষ্টি নাই, কিন্তু অনুগ্রাহক গুরুর দৃষ্টিতে সৃষ্টি আছে, তবে উহা ব্যক্তিগত, অহং এর শুদ্ধ কল্পনাপ্রসূত। এই গুরুই নররূপী বিরূপাক্ষ (God-man)।

শ্রীশ্রীগুরুদেবের রচিত চারিটি গান

(শ্রীমুনীন্দ্রমোহন কবিরাজ হইতে প্রাপ্ত)

সম্পাদক

(১)

হরি তুমিও আমার, আমিও তোমার,
তোমাতে আমাতে কোন ভেদ নাই।
তুমি না থাকিলে না থাকিব আমি,
আমি না থাকিলে না থাকিবে তুমি,
তুমি আমি কেবা তাই তোমায় শুধাই॥

(২)

ভবের তুফান দেখে ডরাস্ না মন, ভয় কি মাঝি হয়ে রে।
হরিনাম কালাপাতি নিতি নিতি কর দেখি এই ভাঙ্গা নেয়ে॥
জলুই এর ঘর আঁটবে সকল, নায়েতে আর উঠবে না জল,
চল্ আমার মন বেয়ে চল্ হেলে হুঁসার হয়ে রে;
ত্রিবেণীর তুফান ভারী, বাওনা তরী ঠাণ্ডা হয়ে গড় কাটায়ে॥
একে তোমার ক্ষুদ্র তরী, কাজ কি তাতে ছ জন দাঁড়ি,
তায় তারা প্রবল ভারী, থাকে না বশ হয়ে;
বিবেক দাঁড়ী বহাল করি, দেহতরি দাও ভাসায়ে॥
ভোলানাথ বলে, যা'স না ভুলে, সদা থাকিস চরণ ধ'রে,
দেখলে পরে আসবে নারে শমন যাবে পলাইয়ে॥

(৩)

ভেবে ভেবে কেন মর, কেন ঢাল ভস্মে ঘি,
জল না খেলে জল দেখিলে পিপাসা তায় যাবে কি ?

(অসম্পূর্ণ)

(৪)

কি কুযাত্রায় যাত্রা ক'রে এলাম মা তোর যাত্রাশালে।
না জুড়ি না রাজা মন্ত্রী আমায় চিরদিন বাঁদর সাজালে॥
এই দুঃখ রইল চিতে, পেলাম না সাজ অঙ্গে দিতে,
মাগো ভার দিলে সিদে বহিতে, সে ফল আমার কর্ম্মফলে॥

(অসম্পূর্ণ)

তত্ত্বকথা *

রায়সাহেব শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, কবিরত্ন, এম-এ

শাস্ত্রে কহে—ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান্
অদ্বয় তত্ত্বের এই তিন অভিধান।
পণ্ডিতেরা তর্ক করি' উচ্চ নীচ ভেদ
করে তাতে ; বুঝি না তা' ; নাই কোনো খেদ।
স্থূলবুদ্ধি আমি তত্ত্বে নাহিক প্রবেশ,
আমি যাহা বুঝি, ভাবি তা'ই মোর বেশ।

শব্দব্রহ্ম মোর ব্রহ্ম, মন্ত্ররূপে যাঁরে
পাইয়াছি ভাগ্যবলে সেবা করিবারে।
অপূর্ব্ব মহিমা তার ; সাধুমুখে শুনি—
এ নহে সামান্য নিধি, এ যে চিন্তামণি।
প্রজ্ঞার বিমল জ্যোতি ভিতরে বাহিরে
স্ফুরে তার নিষ্ঠাভরে সতত যে স্মরে।
হতভাগ্য আমি তাই চিনেও না চিনি,—
কুক্কুটের কাছে তুচ্ছ পদ্মরাগমণি।

পরমাত্মা মোর আত্মা মায়ায় আবৃত,
তাই মোর দৃষ্টি হতে চির তিরোহিত।

---

* তত্ত্বে যাহার অধিকার কম, তাহার তত্ত্বালাপ প্রলাপ তুল্যই। পাঠকগণ আমাকে ক্ষমা করিবেন।

মন্ত্রতনু পরমাত্মা—সাধুগণ বলে—
পরম প্রকাশ তাঁর মন্ত্রের হিল্লোলে ;
মন্ত্র ধর পরমাত্মা হইবে প্রকাশ,
একই তত্ত্বের দুই বিচিত্র বিলাস।
শুনি কথা, মনে মানি, নাহিক সংশয় ;
দুঃখ এই—কর্ম্মে তবু রতি নাহি হয়।

ভগবান্ গুরু মোর করুণা নিধান
ব্রত যাঁর অশরণ পতিতের ত্রাণ।
বিভূতি বলিয়া দিত—সাক্ষাৎ ঈশ্বর
নরদেহ, কিন্তু জেনো এ ত নয় নর।
চিনে নেও, ওরে মূঢ়, গুরুরূপে কারে
পেয়েছ পরম ভাগ্যে ভবে ত্রাণ তরে।
বুঝে নেও পরমাত্মা কল্যাণ-নিলয়
বিশুদ্ধ প্রকাশ গুরু ছাড়া অন্য নয়।
এই সার তত্ত্বকথা, ক্রিয়াযোগে এরে
করে লও চিরায়ত্ত অন্য চিন্তা ছেড়ে।

বিশুদ্ধবাণী

প্রথম ভাগ

শ্রীগুরু-স্মরণ

রায় সাহেব শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, কবিরত্ন, এম-এ

(১)

দেব দয়াময় দীন-শরণ্য
দৈবত দুর্ল্ভ-ভূতি বরেণ্য।
গন্ধ বিমোহিত সজ্জন চিত্ত
সর্ব্বজনৈরভিনন্দিত বৃত্ত॥

হে দেব, হে দয়াময়, হে দীনের আশ্রয়, দেবদুর্লভ বিভূতির জন্য আপনি বরেণ্য। আপনার গাত্রগন্ধ সকল সজ্জনকে বিমোহিত করিত এবং সকল লোক আপনার স্বভাবের অভিনন্দন করিত।

(২)

শক্তিসনাথ-মহেশ্বর লীল
সঙ্কট-কণ্টক-মোচনশীল।
কেলি-কলা-কুতুকৈঃ কৃতহৃষ্টে
স্নেহ-বিমোচন-লোচন দৃষ্টে॥

আপনার লীলা হইতেছে (মন্ত্রমহেশ্বর) শক্তি-সনাথ শিবেরই লীলা। কণ্টকরূপ সঙ্কট হইতে মোচন আপনার স্বভাব।

আপনি যেন খেলিতে খেলিতেই (অর্থাৎ বিনা আয়াসে) নানা দ্রব্য সৃষ্টি করিতেন এবং আপনার নয়নযুগল শিষ্যগণের প্রতি স্নেহ বর্ষণ করিত।

(৩)

বিপ্লবহীন-বিবোধ-সুবৃদ্ধ
শৈশব-সঙ্গত-কৌতুকসিদ্ধ।
রাজস-তামসবৃত্তি-বিমুক্ত
মঙ্গলমণ্ডিত-কর্ম্মণি যুক্ত ॥

আপনি বিচ্ছেদহীন প্রজ্ঞানে সুবৃদ্ধ ছিলেন, (তথাপি শিশুদিগের সঙ্গে) শৈশবোচিত কৌতুকেও পটু ছিলেন। রজো-গুণের বা তমোগুণের কোনও বৃত্তি আপনাতে দেখা যায় নাই; আপনি মঙ্গলমণ্ডিত (সাত্ত্বিক) কর্ম্মেই নিযুক্ত থাকিতেন।

(৪)

জ্ঞানসমুজ্জল ভক্তিসমৃদ্ধ
যোগবিকাশিত-শক্তিভিরিদ্ধ।
ব্রহ্মপদে পরমে সুনিষণ্ণ
নিত্য-সমাধি-পদং প্রতিপন্ন ॥

আপনি জ্ঞানসমুজ্জ্বল ভক্তিতে সমৃদ্ধ এবং যোগ বিকাশিত শক্তিসমূহ দ্বারা দীপ্ত ছিলেন। আপনি পরমব্রহ্মপদে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং অখণ্ড সমাধি (চৈতন্য সমাধি) সম্পন্ন ছিলেন।

(৫)

সংযমদীপ্তচরিত্র-মহিষ্ঠ
শৌচ-সদাচরণাস্থিতনিষ্ঠ।
ধ্যানধনিষ্ঠ-সুকীর্ত্তিগরিষ্ঠ
সুব্রত সুক্রিয় যোগিবরিষ্ঠ॥

আপনার চরিত্র সংযমে দীপ্ত ছিল বলিয়া আপনি অতি মহান্, শুচিতা ও সদাচার নিষ্ঠাযুক্ত, ধ্যানধনে অতিমাত্র ধনী, সুকীর্ত্তিতে গরিষ্ঠ, সুব্রত, সৎক্রিয়াবান্ এবং যোগিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

(৬)

সদ্‌গুরু-গৌরব-শুভ্র-যশস্ক
শিষ্যহিতে সততং সমনস্ক।
যোগকলা-কলিত-গ্রহ-ভোগ
ভোগ-পরিগ্রহ-দূরিত-রোগ॥

আপনার যশঃ সদ্‌গুরুর প্রাপ্য গৌরবে শুভ্র, (কেননা) আপনি শিষ্যগণের হিতে সর্ব্বদা মনোযোগী। যোগকলা (যোগ-জ্যোতিষ) দ্বারা আপনি তাহাদের গ্রহের ভোগ নির্ণয় করিয়া দিতেন এবং তাহাদের রোগের ভোগ স্বয়ং আকর্ষণ করিয়া নিয়া তাহাদিগকে নিরাময় করিতেন।

(৭)

মূর্দ্ধনি সংধৃত-শৈল-হরীশ
বক্ত্রবিলে কৃত-বিশ্ব-বিকাশ।
হিংসিত-বিষ্কির-জীবন-দান-
লব্ধ-বিদেশি-সুধীজন-মান॥

আপনি মস্তকাভ্যন্তরে শিলাময় বিষ্ণু ও শিবকে (শালগ্রাম ও বাণলিঙ্গ) রাখিয়া দিয়াছিলেন এবং নিজ মুখবিবরে (ম, ম, সদাশিব মিশ্রকে) বিশ্বদর্শন করাইয়াছিলেন। একটি নিহত (চটক) পক্ষীকে জীবন দান করিয়া বিদেশীয় সুধীজন (Paul Brunton) হইতে সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

(৮)

নাভি-বিলোত্থ-সনাল-সরোজ-
দর্শন-বিস্মিত-শিষ্য-সমাজ।
ব্যক্ত-দিবাকর-সংশ্রয়-বিত্ত
গর্ববিলাকৃত-মত্যনবত্ত ॥

আপনার নাভিরন্ধ্র হইতে উত্থিত (অপূর্ব্ব) সনাল পদ্ম দর্শন করিয়া শিষ্যগণ বিস্মিত হইয়াছিল। আপনি (তৎপূর্ব্বে অজ্ঞাত) সূর্য্যবিজ্ঞান প্রকাশ করেন। (এত শক্তি সত্ত্বেও) আপনি নিরভিমান ছিলেন বলিয়া আপনি কাহারও নিন্দাভাজন হন নাই।

(৯)

মাং স্মরসীহ নু শিষ্যমধন্যং
তুচ্ছতমং গুণবৎসু ন গণ্যম্।
দুর্ভর-দুষ্কৃতভার-নিপিষ্টং
দোষসমূহহতং হতদিষ্টম্॥

(হে গুরুদেব,) আপনার এই সুকৃতহীন শিষ্য আপনার স্মরণে আছে কি ? (না থাকিবার সম্ভাবনা এই যে) আমি যে অতি তুচ্ছ ব্যক্তি—গুণবান্ শিষ্যদিগের মধ্যে গণ্য নহি। (পূর্ব্বজন্মের)

দুর্ভর পাপভারে নিপিষ্ট আমি (এ জন্মেও) বহু দোষে হত (দুষ্ট), সুতরাং দুর্ভাগ্য।

(১০)

প্রাপ্তকৃপোঽপি ন জাগরমাপ্ত-
স্তামসবৃত্তিবশোঽস্মি সুষুপ্তঃ।
তারয় মাং ভবতারণ তূর্ণং
গৌরবমস্তু তবাত্র চ পূর্ণম্॥

আমি (সদ্‌গুরুর—আপনার) কৃপা প্রাপ্ত হইলেও এখনও জাগি নাই—তামসিক বৃত্তির অধীন হইয়া গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্নই আছি। হে ভবতারণ, শীঘ্র আমাকে ত্রাণ করুন এবং তদ্দ্বারা এক্ষেত্রেও আপনার গৌরব পূর্ণ হউক।

সূচনা

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট

পরমারাধ্যপাদ গুরুদেব শ্রীশ্রীমদ্ বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের পুণ্য স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য ৺কাশীধাম হইতে "বিশুদ্ধবাণী" নামে একখানা গ্রন্থ নিয়মিতভাবে ধারাবাহিক প্রকাশিত করিবার সঙ্কল্প অনেক দিন হইতেই জাগিয়াছিল। কিন্তু নানা অন্তরায়বশতঃ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ইহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। আজ শ্রীগুরুদেবের আশীর্ব্বাদে আমাদের সম্মিলিত সৌভাগ্যের উদয়ে সেই শুভ সঙ্কল্প মূর্ত্তরূপ ধারণ করিয়াছে। তাই এই মঙ্গলময় মুহূর্ত্তে আমরা শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিয়া আমাদের সমুদয় ভ্রাতৃবৃন্দকে সাদরে অভিনন্দন করিতেছি।

'বিশুদ্ধবাণী' বিশুদ্ধ স্মৃতিকে উজ্জ্বল করিয়া ধারণ করিবে ও যথাশক্তি বহন করিবে। যে বিশুদ্ধসত্তা আমাদের জীবনের কর্ণধাররূপে—ভবপারের কাণ্ডারীরূপে—সমাগত, আমরা জানি সেই বিশুদ্ধসত্তাই সমগ্র বিশ্বের একমাত্র কর্ণধার—"মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্ গুরুঃ", যিনি আমাদের গুরু তিনিই বিশ্বগুরু, যিনি বিশ্বগুরু তিনিই আমাদের গুরু। সুতরাং বিশুদ্ধ-স্মৃতি বলিতে আমরা শুধু ব্যক্তিগতভাবে আমাদের গুরুদেবের অধ্যাত্মজীবন সাধন ও সিদ্ধির ইতিহাস, তদুপদিষ্ট তত্ত্ব ও ক্রমনির্দ্দেশ, দেশ ও কাল-বিশেষে তৎপ্রদর্শিত লীলাবিভূতি প্রভৃতির স্মরণ ও আলোচনা

বুঝিব না, কিন্তু সর্ব্বযুগের ও সর্ব্বদেশের ভগবদ্‌ভক্ত, তত্ত্বজ্ঞানী ও কর্মনিষ্ঠ যোগিজনের সাধন, সিদ্ধি ও উপদেশও গ্রহণ করিব। কারণ সর্ব্বত্রই এক বিশুদ্ধ সত্তার খেলাই রহিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, মহাজনগণের অনুমোদিত অনুভবসিদ্ধ ও স্বসংবেদ্য মার্গ বা উপায়ের আলোচনাও আমাদের লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত মনে করিব। মোটকথা, যে কোন আলোচনা মানব মাত্রের হিতকর ও লক্ষ্য-প্রাপ্তির অনুকূল বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহার মধ্যে কোনটির প্রতিই বিশুদ্ধবাণী সমুচিত সমাদর প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠা বোধ করিবে না। চিত্তের অনুদার ভাব হইতেই নিজের অপরিগৃহীত বা অপরিচিত মত ও পথের প্রতি মানুষের অশ্রদ্ধার উদয় হয়। এই সঙ্কোচময়ী দৃষ্টি বিশুদ্ধবাণীর মৌলিক আদর্শের প্রতিকূল। যেখানে সর্ব্বত্র আত্মভাবের প্রসার অভিপ্রেত সেখানে দ্বন্দ্ব ও বিরোধের অবসর কোথায়? জগতে বিরোধ আছে ইহা সত্য—বিচারক্ষেত্র, দর্শনশাস্ত্র ও ব্যবহারভূমি সর্ব্বত্রই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বিরোধের মধ্যে অবিরুদ্ধ সত্যও আছে—বিশুদ্ধবাণী যথাসম্ভব বিশুদ্ধ দৃষ্টিতে সেই অবিরুদ্ধ অংশই দেখিতে চেষ্টা করিবে। কারণ 'অবিভক্তং বিভক্তেষু'—ইহাই বিশুদ্ধ জ্ঞানের লক্ষণ।

পূর্ণের পথে চলিতে হইলে লক্ষ্যটা প্রথম হইতেই পূর্ণের দিকেই রাখিতে হয়। পূর্ণেই সকল বিরোধের সমন্বয় হয়। লক্ষ্য পূর্ণে থাকিলে ব্যবহারক্ষেত্রে গণ্ডীবদ্ধ ভাবের মধ্যেও মুক্ত সত্যের দর্শন পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীগুরুদেবের পাবন স্মৃতিতে সঞ্জীবিত ও রঞ্জিত হইয়া তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া আমরা সমগ্র বিশ্বকে আপন বলিয়া গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিব—'বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্।'

বিশুদ্ধবাণী যোগীর বাণী। ইহার আদর্শ যোগীর আদর্শ। সুতরাং সাধনা, সিদ্ধি ও ভাবের প্রকার ভেদ যতই থাকুক সকলের মধ্যে সমভাবে একই মহা আদর্শ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। জগতের অনন্ত বৈচিত্র্যের মূলে ও অন্তঃস্থলে অভিন্নভাবে যে **এক** রহিয়াছে সেই একে খুঁজিয়া বাহির করা আবশ্যক। তবেই ত বৈচিত্র্যের সার্থকতা সিদ্ধ হয়। কর্ম সত্য, জ্ঞানও সত্য ; সক্রিয় ও সগুণ সত্য, নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণও সত্য ; সাকার সত্য, নিরাকারও সত্য ;—কিন্তু পরম সত্য তাহাই যেখানে কর্ম ও জ্ঞান, সক্রিয় ও অক্রিয়, সাকার ও নিরাকার একই অখণ্ড স্বরূপে প্রকাশমান হয়, শুধু যে একের দুইটি পরস্পর সংস্পৃষ্ট দিক্ বা পৃষ্ঠভূমিরূপে, তাহা নহে—কিন্তু একই অভিন্নরূপে।

বিজ্ঞান দৃষ্টিই সমন্বয় দৃষ্টি। রহস্যভেদ এই দৃষ্টিতেই হইতে পারে। কর্মের দৃষ্টিতে জগৎ সত্য, ভেদ সত্য, প্রতি ব্যক্তির মহিমা সত্য, আবার জ্ঞানের দৃষ্টিতে জগৎ মিথ্যা, ভেদ মিথ্যা, ব্যক্তিত্ব মিথ্যা। কিন্তু বিজ্ঞান দৃষ্টিতে দেখা যায় যে এক সত্যই মহাসত্য। জ্ঞানে যাহা মিথ্যা প্রতীত হয় তাহা তৎ তৎদৃষ্টিতে মিথ্যা হইলেও একেরই স্বাতন্ত্র্য-কল্পিত লীলাময় অনন্ত আত্মপ্রকাশরূপে পরম সত্য। বস্তুতঃ এক ছাড়া ত আর কিছু নাই—লীলাতীতরূপে

যে এক স্থির ও চির শান্ত, লীলারূপে সেই একই অনন্ত প্রকারে অনন্ত সাজে চিরকল্লোলময়। বস্তুতঃ শান্ত ও অশান্তের ভেদের প্রশ্নই সেখানে নাই। সেখানে এক যে এক সে প্রশ্নও যেন উঠিবার অবকাশ পায় না। রহস্যভেদ ও সংশয়ভঞ্জন এই স্থানেই হইয়া থাকে। গ্রন্থিমুক্ত হৃদয় না হইলে এই মহাস্থিতিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায় না।

ইষ্ট, গুরু ও আত্মা এক না হওয়া পর্য্যন্ত ক্লান্তিময় যাত্রার অবসান নাই। চৈতন্যময় গুরুর কৃপাতে ইষ্টলাভ হয়, আনন্দরূপা শক্তির সন্ধান পাওয়া যায় ও কৃপাসহকৃত নিজ কর্মবলে তাঁহার প্রাপ্তি ঘটে। তখন অনিষ্টের নিবৃত্তি হয়, দুঃখের অবসান ঘটে ও নিজের দুর্বলতা ঘুচিয়া যায়। মাতৃস্তন্য-নিঃসৃত অমৃতধারাতে অভিষিক্ত হইলে শক্তিসম্পদে ও ঐশ্বর্য্য-গৌরবে আনন্দময় রাজ্যের সিংহাসন নিজের অধিগত হয়। তাহার পর এমন অবস্থা আসে যখন এই সিংহাসনের গরিমাতেও আর আবদ্ধ থাকা চলে না। তখন সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া অকিঞ্চনের ন্যায় আবার পথে বাহির হইতে হয়। যে পথিক পূর্বে গুরু-নির্দ্দিষ্টপথে তাঁহার কৃপা সম্বল করিয়া মাকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছিল, এবার সে মায়ের সঙ্গে মিলিতভাবে গুরুকে খুঁজিতে বাহির হইল। পূর্ব্বে যে সে গুরুকে পাইয়াছিল তাহা ঠিক গুরুকে পাওয়া নহে। কারণ তাঁহাকে ত সে চায় নাই। চাহিতে না শিখিলে পাইতে পারা যায় না। তিনি দয়া করিয়া তখন তাহার কাছে আসিয়াছিলেন ছদ্মবেশে, স্বরূপে নহে ; তাহাকে ব্যথিত দেখিয়া তাহার ব্যথা দূর করিবার

জন্য আসিয়াছিলেন, আসিয়া আনন্দের বীজ-কণা দান করিয়া আনন্দভূমির পথ—মাকে পাওয়ার পথ—দেখাইয়া দিয়াছেন। আজ সে আনন্দময়—কারণ আনন্দময়ীরূপে মাকে সে পাইয়াছে।

মাই পূর্ণের সাকাররূপ। জগতে যেখানে যত আকার আছে—ইহারই অংশ, ইহারই কলা, ইহারই রশ্মি। সব রূপ এই পরম রূপেরই এক একটি ছটা মাত্র, সব রস এই পরম রসেরই কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র। গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ—যেখানে যা আছে, সব ইহারই বিভূতি। বস্তুতঃ আমরা যে মূর্ত্ত বিগ্রহে চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা বিষয়ের রূপ রসাদি গ্রহণের জন্য নহে—মায়েরই রূপ রসাদি ধারণের জন্য। ভক্ত কবি বলিয়াছিলেন—"হেন কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ যে না পায় সে সম্বন্ধ, তার নাসা ভস্ত্রারই সমান।" বস্তুতঃ মা যে সর্ব্বেন্দ্রিয়বেদ্য তাহা প্রত্যক্ষ অনুভব হয় এই মহাসাকার বিগ্রহের সাক্ষাৎকারে। সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, লাবণ্য, যৌবন, করুণা, বাৎসল্য, স্নেহ, প্রেম, ক্ষমা প্রভৃতি অনন্ত গুণরাশি সেখানে হিল্লোলিত হইতেছে।

দীর্ঘ সংসাররূপী মরু-কান্তার ভ্রমণে ক্লিষ্ট হইয়া প্রাণ প্রেমময়ী জগজ্জননীর সুশীতল অঙ্কে তৃপ্তিলাভ করে। কিন্তু পূর্ণের যাত্রীর পক্ষে এই বিশ্রামও সাময়িক বিশ্রাম মাত্র। তাই ইহাও ত্যাগ করিতে হয়। ঠিক **ত্যাগ** বলা চলে না, কারণ যোগীর ত্যাগ নাই—তবে ইহাকেও ছাড়াইয়া আগে চলিতে হয়।

তখন মা যেন অদৃশ্য হইয়া যান—নিজের আড়ালেই যেন

নিজেকে ঢাকিয়া ফেলেন। যাত্রীর সঙ্গে অভিন্ন রূপে থাকেন, কিন্তু আর পৃথক্ ভাবে দৃষ্টির সম্মুখীন হইয়া দেখা দেন না। তখন যেন সন্তান আর সন্তান নয়, মাও যেন আর মা নন—যেন দুইই এক সত্তা।

এইবারকার যাত্রা বড় কঠিন, পথ বড় দুর্গম—কারণ চৈতন্যময় গুরু নিরাকার নির্গুণ ও নিষ্কল। কর্মের পথে মাকে পাওয়া যায়—তারপর জ্ঞানের আলোকে গুরুকে খুঁজিতে হয়। আনন্দেরও অতীত সত্তা আছে। যাহা চৈতন্যময় জাগ্রৎসত্তা সেখানে নিরানন্দ ত নাই-ই, আনন্দেরও হিল্লোল উঠে না। আনন্দও ত এক প্রকার মোহ—তৃপ্তিমোহ! যেটি শান্ত চৈতন্যময় মহাসত্তা সেইটি গুরু-সত্তা। এ পথে কৃপার বারিবর্ষণ হয় না—কৃপা-শূন্য অসহায় নিঃসম্বল যাত্রীকে একমাত্র নিজের অন্তঃসম্পদের উপর নির্ভর করিয়া অতিকষ্টে পথ অতিক্রম করিতে হয়। যে একদিন মহামায়াতে অধিষ্ঠিত হইয়া পরম ঐশ্বর্য্যময় আসনের অধিকারী হইয়াছিল আজ সেই রাজপুত্র সত্যই পথের কাঙ্গাল। কুবের যাঁহার ভাণ্ডারী ও অন্নপূর্ণা যাঁহার গৃহলক্ষ্মী সেই শিব আজ সত্যই পথের ভিখারী। নিরাকারের ধারণা অতি কঠিন। সাকারের মধ্যে নিরাকার আছে, সাকার রাজ্য অতিক্রম করার পরও সেই নিরাকারই যেন অনন্ত আকাশবৎ বিরাজমান থাকে। স্বয়ং নিরাকার না হইলে সেই নিরাকারের সাক্ষাৎকার হয় না। তখন সেই মহানিরাকার সত্তাতে সন্তান নিরাকার, মাও নিরাকার। ইহাই গুরু প্রাপ্তির একটি প্রধান দিক্। তখন একমাত্র গুরুই নিজের

মহাপ্রকাশে অখণ্ডরূপে বিরাজ করেন—এইটি অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন মহাব্যোমবৎ নিষ্কম্প নিঃস্পন্দ মহাসত্তা। গুরুপ্রাপ্তির পথটি অতি ভয়াবহ—মানস সরোবর হইতে মনোহর তীর্থ পর্য্যন্ত ইহা বিস্তৃত। ইহাই ঊর্দ্ধ মার্গ।

ইহার পর অতর্কিত এক মহাক্ষণে কৃপাশূন্য অবস্থা কাটিয়া যায়—গুরুর মহাকৃপাতে শিষ্য নিজেকে চিনিতে পারে। নিজে কে? স্বয়ম্। যিনি সকলের স্ব—মায়ের স্ব, গুরুর স্ব, যাত্রী শিষ্যেরও স্ব—সেই একই আত্মা সকলের আত্মা। ইহাই বিজ্ঞানের চরম রহস্য। ইহাই প্রকৃত আত্মলাভ। ইহাই স্বভাব। কর্মে মা, জ্ঞানে গুরু, বিজ্ঞানে স্বয়ম্। কর্মে সাকার, জ্ঞানে নিরাকার, বিজ্ঞানে সাকার-নিরাকার উভয়ের অতীত অথচ উভয়াত্মক। মা সাকার, গুরু নিরাকার—মা যখন গুরুর সহিত অভিন্ন তখন মাও নিরাকার, গুরু যখন মার সহিত অভিন্ন তখন গুরুও সাকার, কিন্তু বিজ্ঞান-সূর্য্যের উদয় হইলে আত্মসাক্ষাৎকারের ক্ষণে দেখা যায় আত্মা স্বয়ং সাকার নিরাকার উভয়ের অতীত হইয়াও যুগপৎ সাকার ও নিরাকার উভয় রূপেই প্রকাশমান। বস্তুতঃ আত্মাই গুরু—আত্মাই মা। তখন আত্মা ও নৈরাত্ম্যের দ্বন্দ্বও চিরদিনের জন্য শান্ত হইয়া যায়।

তখন মা, গুরু ও স্বয়ম্—তিনেই এক, একেই তিন। বস্তুতঃ তিনেই এক, একেই তিন। তখন কর্ম, জ্ঞান ও বিজ্ঞান অদ্বয়—মা, গুরু ও আত্মাও অদ্বয়। উপায় ও উপেয় অভিন্ন। দুইটি অদ্বয়তত্ত্ব বস্তুতঃ একই পরমাদ্বয় তত্ত্বাতীত পরমতত্ত্ব।

ইহারও অতীত আছে। যদিও এই স্থিতি নিত্য বর্ত্তমান ও দেশ কালের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, তাই **অতীত** বলা আর চলে না, তথাপি বলিতে হয়। অতীত আছে, অনাগতও আছে—নিত্য বর্ত্তমানেই সেটি ভাসে। এই স্থিতি অব্যক্ত—যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। ইহা বাণীর অতীত—এমন কি **বিশুদ্ধ বাণীও** সেখানে উপনীত হয় না।

বিশুদ্ধ বাণীর কতটা দৃষ্টিক্ষেত্র তাহা ইঙ্গিতে প্রকাশ করা হইল। কিন্তু ইহার প্রসারের মূলে আছে সেই উৎস, যাহা অন্ধকে চক্ষুষ্মান্ করে, মূককে বাচাল করে ও পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করায়। গুরোঃ কৃপা হি কেবলম্। জয় গুরু।

বিশুদ্ধানন্দ মাহাত্ম্য

রায় সাহেব শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, কবিরত্ন, এম-এ

এক শ্রেণীর লোকের কাছে সাধু, বিশেষতঃ কোনও বেশধারী সাধু মাত্রেই যোগী। আর যোগী হইলেই তাহার যে নানা অলৌকিক সিদ্ধি থাকিবেই এ বিষয়েও তাহাদের সন্দেহ প্রায় দেখা যায় না। সেইজন্য সাধুমাত্রেরই কাছে রোগের ঔষধ, মোকদ্দমায় জয়, পুত্রের চাকরী বা সুমতি, কন্যার বিবাহ বা সন্তান লাভ ইত্যাদির সমুচিত ব্যবস্থার আশায় লোকে ভিড় জমায়। সাধক বা সিদ্ধ পুরুষদিগের মধ্যে জ্ঞানী, ভক্ত ও যোগী এই যে শ্রেণীবিভাগ অপেক্ষাকৃত বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ করিয়া থাকেন ইহার তত্ত্ব সাধারণ লোকে বড় জানে না। ঈশ্বরের সহিত যাঁহার যোগ অর্থাৎ সংযোগ আছে সাধারণের ধারণা তিনিই যোগী এবং সেরূপ যোগ একবার স্থাপিত হইলেই ঈশ্বর হইতে অলৌকিক সিদ্ধিসকল আসিয়া পড়িবেই, ইহা সাধারণের কাছে একরূপ স্বতঃসিদ্ধ সত্য। যিনি যত বড় সাধু তাঁহার ক্ষমতা তত অধিক হইবে—ইহাতে কাহারও সন্দেহ প্রায় দেখা যায় না।

ঈশ্বর বা পরতত্ত্বের সহিত সংযোগ স্থাপন যে সাধন মাত্রেরই উদ্দেশ্য ইহা অবশ্যই পণ্ডিতগণও স্বীকার করিয়া থাকেন। তবে তাঁহারা জানেন সাধনেরও প্রকার ভেদ আছে। কেহ বুদ্ধি-প্রদীপ্ত

বিচার দ্বারা, কেহ ভক্তি-প্রণোদিত সেবা দ্বারা, কেহ দেহেন্দ্রিয়-শোধন-সমর্থিত ধ্যান দ্বারা, সেই সংযোগ সাধনের চেষ্টা করেন। এইরূপে মোটের উপর এই ত্রিবিধ সাধন-ধারা অনুসারে জ্ঞানী, ভক্ত ও যোগী এই তিন বিভিন্ন শ্রেণীর সাধুর অর্থাৎ সাধক ও সিদ্ধদের শ্রেণী বিভাগ কল্পিত হইয়াছে।

যেখানে শ্রেণী থাকে, সেখানে কোন্‌টি উচ্চ আর কোন্‌টি নীচ এই তর্কও উঠে। এইরূপ তর্ক নিয়া বিভিন্ন বাদীদের মধ্যে বহু জল্প বাদ বিতণ্ডা হইয়াছে এবং এখনও হয়। বহু গুরুগম্ভীর গ্রন্থ রচিত হইয়াছে যাহা পণ্ডিতেরা ও বিদ্যার্থীরা পড়েন এবং পড়িয়া জল্প বাদ বিতণ্ডার জন্য প্রস্তুত হন।

সাধারণ লোকের বিচারবুদ্ধি একটি মানই মানে। সেটি হইতেছে, যে সাধুর অলৌকিক সামর্থ্য বেশী সেই উচ্চ। এইরূপে তাহারা যেমন সকল সাধুকেই যোগী বলে, তেমনই তাহাদের মধ্যে উক্ত অর্থাৎ পণ্ডিতগণকৃত শ্রেণী বিভাগ অনুসারে যাহারা প্রকৃত যোগী তাহাদিগকেই তাহারা উচ্চতম স্থান দেয়। কেননা যোগীদিগেরই অলৌকিক সিদ্ধি বেশী।

সকল সাধন প্রণালীতেই আদিতে একটা উদ্যোগপর্ব্ব, মধ্যে যুদ্ধ পর্ব্ব বা ক্রিয়া পর্ব্ব, অন্তে শান্তি পর্ব্ব আছে। শ্রদ্ধা বা আস্তিক্য বুদ্ধি ও নিষ্ঠা সকল শ্রেণীরই প্রবেশিকা বলিয়া গণ্য, তারপর মার্গ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন পর্ব্ব অতিক্রম করিতে হয়।

জ্ঞান মার্গের উদ্যোগ পর্ব্বে নিত্য ও অনিত্য বস্তুর মধ্যে

অর্থাৎ আত্মা ও দেহ, ঈশ্বর বা পরমাত্মা ও জগৎ, ইহাদের মধ্যে যে ভেদ আছে তাহার উপলব্ধি, তৎপর ঐহিক ও পারত্রিক ফল-ভোগের প্রতি বৈরাগ্য এবং শম দম ইত্যাদি অনুশীলন করিতে হয়। ইহাতে একটা আনন্দ অবশ্যই আছে, পরন্তু কোনও শক্তির বিকাশ নাই বলিলেই চলে। ক্রিয়া পর্ব্বে বিচার এবং শান্তি পর্ব্বে জ্ঞানের পরিপাক ও অখণ্ড শান্তি ও বৈরাগ্য। শক্তির বা "সিদ্ধির" কথা এখানে বড় উঠে না।

ভক্তি-মার্গে উদ্যোগ পর্ব্বে সেবা আরম্ভ হয় শ্রীমন্দির মার্জ্জন ইত্যাদি দ্বারা, তারপর নাম-কীর্ত্তন। ক্রিয়া পর্ব্বে গভীরতর নাম সাধন, ইষ্টমূর্ত্তির ভোগরাগ, ইষ্টলীলা চিন্তনাদি। তারপর শান্তি পর্ব্বে আসে প্রেম-পরিপাক এবং অখণ্ড লীলা রসাস্বাদ। এখানেও শক্তির কথা উঠে না। ভক্ত সেবাই চান, শক্তি চান না।

যোগমার্গের কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাহার উদ্যোগ পর্ব্ব যেমন দীর্ঘ ও দুরতিক্রম, তেমনই এক একটি ধাপ আয়ত্তির সঙ্গে সঙ্গে অযাচিতভাবে শক্তি আসিতে থাকে। সাধনাবস্থায় যোগী ঐ সকল শক্তিতে সন্তুষ্ট থাকেন না, কারণ তাহাতে অগ্রগতিতে বাধা হয়। কিন্তু শক্তিগুলি থাকেই এবং পরার্থে প্রয়োগও চলে। সাধারণতঃ যোগ অষ্টাঙ্গ বলা হয়। ঐ অঙ্গগুলি একটির পর একটি ক্রমোর্দ্ধ স্তর বলা যায়। সর্ব্ব নিম্নস্তরে "যম" বা বহিরিন্দ্রিয় সংযম; তাহার অর্থ হইতেছে অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ বা ভোগবিলাসাদির দ্রব্যাহরণে অনিচ্ছা। ইহার পরের

স্তরে "নিয়ম" বা অন্তরিন্দ্রিয় সংযম ; তাহার অর্থ শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় (অর্থাৎ যোগশাস্ত্রাধ্যয়ন বা ইষ্টমন্ত্রজপ) এবং ঈশ্বর-প্রণিধান বা সকল কর্ম্ম পরম গুরুতে সমর্পণ। ইহার পর আছে আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার বা ইন্দ্রিয়সমূহের বহির্গতি রোধ। এই পর্য্যন্ত উদ্যোগপর্ব্ব বলা যায়। তৎপর ক্রিয়া পর্ব্বে ধারণা (চিত্তকে একস্থানে স্থাপন), ধ্যান ও সমাধি। শান্তি পর্ব্বে সম্প্রদায় অনুসারে কৈবল্য, ঈশ্বর-সাযুজ্য, "মায়ের কোলে বসিয়া মায়ের লীলা দেখা" ইত্যাদি।

যোগ মার্গে পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক স্তর অতিক্রম বা আয়ত্তীকরণের সঙ্গে সঙ্গে এক একটি অলৌকিক শক্তি আপনা হইতেই আসে। প্রবৃত্ত মাত্র যোগীকেও 'আমি এ সব চাই না' বলিয়া ন্যাকামি করিতে হয় না। অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইলে যোগীর নিকট হিংস্র জন্তুরা হিংসাত্যাগ করিবেই। 'ইহা চাই না' বলিবার অর্থ কি ? সত্যকথনের প্রতিষ্ঠায় বাক্‌সিদ্ধি আসিবেই, যোগীর মুখ হইতে যাহা বাহির হইবে তাহা কার্য্যে অবশ্যই সত্য হইবে। অচৌর্য্যের ফলে সমস্ত ধনরত্ন আপনা হইতে উপস্থিত হইবে ; যোগী অবশ্য নিঃস্পৃহতা পোষণ করিয়াই চলিবেন। ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায় চিত্তের অসাধারণ সামর্থ্য, এবং অপরিগ্রহ প্রতিষ্ঠায় 'আমি প্রাক্তন জন্মে কে ছিলাম, কিরূপ ছিলাম, বর্ত্তমান জন্মেই বা আমার স্বরূপ কি, পরেই বা কি হইব' এই সকল জ্ঞান আপনা হইতে আসিবে। এইরূপ "নিয়মের" এক একটি ধাপ অতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গে সত্ত্ব-শুদ্ধি, সৌমনস্য, একাগ্রতা, ইন্দ্রিয়জয়, আত্মদর্শনযোগ্যতা. অনুত্তম অর্থাৎ যৎপরোনাস্তি সুখলাভ, অণিমা লঘিমা ইত্যাদি

সিদ্ধি, দূরশ্রবণ, দূরদর্শন, ইষ্টদেবতা দর্শন, দেশান্তরে বা কালান্তরে ঘটিত যাহা জানিবার ইচ্ছা হয় তাহা যথার্থভাবে জানা—এই সকল শক্তি আসে। ইহার পর আসন ও প্রাণায়াম —এই দুইটি ব্যাপারে সিদ্ধি লাভ করিতেও বহু প্রযত্নের প্রয়োজন। ইহাতে সিদ্ধির ফল হইতেছে শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহন ক্ষমতা এবং জ্ঞানের আবরক কর্ম্মের ক্ষয়। তৎপর প্রত্যাহার দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের উপর অবাধ ক্ষমতা জন্মে।

এইরূপে দেখা যায় উদ্যোগপর্ব্বেই যোগ মার্গে প্রবৃত্ত সাধকের কতকগুলি শক্তি আসিয়া পড়ে। যে ব্যক্তি ভাগ্যক্রমে উপযুক্ত গুরু লাভ করে, সে যদি গুরুর উপর নির্ভর করিয়া বিপুল প্রযত্ন সহকারে ঐ পথে চলিতে থাকে তবে তাহার ঐ সকল শক্তি অখণ্ডভাবেই আসিবে।

তারপর ক্রিয়ার অবস্থা অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধি— ইহাতে সাফল্যে যে কি না হয় তাহা বলাই কঠিন। এই তিনটি ক্রিয়ার সমষ্টিগত নাম "সংযম"। সংযম দ্বারা জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ প্রাপ্তি ঘটে, যাহা জ্ঞানীর কাম্য হইলেও সব সময়ে অধিগম্য নয়।

এই ধরুন বস্তুর ত্রিবিধ (অর্থাৎ ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা) পরিণামে সংযম করিলে অতীত ও অনাগত জ্ঞান দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়। শব্দ ও অর্থের ভাগ করিয়া তাহাতে সংযম করিলে প্রাণি মাত্রেরই উচ্চারিত শব্দের অভিপ্রায় অবগত হওয়া যায়। সংস্কারে সংযম করিলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বহু জন্মের জ্ঞান হয়। পরচিত্তে সংযমে

তাহা প্রত্যক্ষবৎ হয়, সে কি ভাবিতেছে তাহা জানা যায়। কায়গতরূপে সংযম করিলে দেহকে পরের অদৃশ্য করা যায়। সূর্য্যে সংযম করিলে চতুর্দ্দশ ভুবনের জ্ঞান হয়। ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইহাকেই বলে যোগীর ঐশ্বর্য্য। "ঐশ্বর্য্য" শব্দটি "ঈশ্বর" শব্দ হইতে উৎপন্ন—উহার অর্থ ঈশ্বরত্ব—ঈশ্বরের ভাব বা কর্ম্ম। এইজন্য বলা হয় যোগীই ঈশ্বর ঈশ্বরই যোগী। দেবতাদিগের মধ্যে শিব হইতেছেন ঈশ্বর, মহেশ্বর। তিনি যোগী। ঐশ্বর্য্যের অপর নাম বিভূতি। ঐ শব্দের লৌকিক ভস্ম অর্থ ধরিয়া বলা হয় মহেশ্বরের শরীর সর্ব্বদা বিভূতিতে লিপ্ত থাকে।

বাঙ্গালা দেশ এককালে ছিল শাক্ত যোগীদের দেশ,—তখন মহামহাশক্তিশালী যোগিগণ এই দেশে আবির্ভূত হইয়াছেন। বৌদ্ধ যোগীও বহু ছিলেন। ভক্তিমার্গে যেমন নানা সম্প্রদায় ও শাখা আছে, সেইরূপ যোগমার্গেও বহু প্রস্থান অর্থাৎ সম্প্রদায় বা পথ আছে। সকলের সাধন প্রণালী একই বর্ত্ম ধরিয়া চলে না। কিন্তু সকল প্রস্থানেই শক্তিবিকাশের সুযোগ আছে। বহুকাল পর্য্যন্ত অন্য প্রদেশের সাধুরা বাঙ্গালী সাধুদিগের অলৌকিক শক্তিমত্তায় বিশ্বাস করিত। এখনও এই খ্যাতি সম্পূর্ণ নষ্ট হয় নাই। সম্প্রতি পরলোকগত কঠোর জ্ঞানবাদী সাধক সাধু শান্তিনাথ নিজ জীবন-কথার বিবরণে লিখিয়াছেন, অমরকণ্টকে নির্জন ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু সমাকুল অরণ্যে সাধন করিবার সময় ঐ অঞ্চলে সাধারণ লোকের মনে এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে এই বাঙ্গালী সাধু ব্যাঘ্র হইয়া বনে বিচরণ করে। সেইজন্য তাহারা তাঁহাকে বাঘোয়া বাবা বলিত। অমরকণ্টকের কোনও

কোনও সাধুও যে ঐ ধারণা হইতে মুক্ত ছিল না তাহারও বিবরণ শান্তিনাথ স্ব-জীবন-কথায় দিয়াছেন।

সে যাহা হউক, চৈতন্য মহাপ্রভুর আদর্শে বাঙ্গালাদেশে যোগ সাধনের স্থলে ভাবের বন্যা ও দলবদ্ধভাবে নাম কীর্ত্তনের নেশা আসিয়া পড়ে এবং ক্রমে যোগসিদ্ধির পরিবর্ত্তে অশ্রু, স্বেদ, কম্প ইত্যাদি সাত্ত্বিক বিকার আধ্যাত্মিক উন্নতির মান বলিয়া পরিচিত হয়। এমন কি জ্ঞান মার্গও অরসজ্ঞ কাকের আস্বাদ্য নিষ্ফল বলিয়া নিন্দিত হইতে থাকে।

কিন্তু দেখা গিয়াছে ভক্তিপথে প্রবৃত্ত কোনও কোনও মহাপুরুষের মধ্যে দুই একটি শক্তির কাদাচিৎক পরিচয় পাওয়া গেলে, যোগবিভূতির নিন্দাকারী তদীয় ভক্তগণ তাহাই পুনঃ পুনঃ ফলাও করিয়া প্রচার করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না।

আধুনিক কালে বাঙ্গালা দেশে যোগী কম আবির্ভূত হইলেও, অনেক যোগী আছেন এবং যোগীদিগের স্বভাব অনুসারে প্রায়শঃ তাঁহারা প্রচ্ছন্ন ভাবেই থাকেন। সম্প্রতি পরলোকগত বরদাচরণ মজুমদার ইঁহাদের একজন। মৃত্যুর পর তাঁহার কথা একখানি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হওয়া পর্য্যন্ত, তিনি সকলের নিকট প্রায় অজ্ঞাতই ছিলেন। প্রচ্ছন্ন যোগিগণের নাম কদাচিৎ কোনও ঘটনাসূত্রে প্রকাশ হইয়া পড়ে। কাহারও কাহারও নাম তিরোভাবের পরে প্রকাশ পায়।

তিন জন বাঙ্গালী মহাযোগীর নাম একান্তই প্রচ্ছন্ন থাকিবার যোগ্য ছিল না বলিয়া তাঁহাদের জীবদ্দশায় খুব ব্যাপকভাবে না

হইলেও প্রকাশ হইয়াছিল। ইঁহারা কেহই আত্ম-প্রচার ইচ্ছা বা অনুমোদন করিতেন না। এই তিন জন হইতেছেন— (১) কাশীর শ্যামাচরণ লাহিড়ী, (২) বারদির লোকনাথ ব্রহ্মচারী, ও (৩) বর্দ্ধমানের ও পরে কাশীর বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস।

ইঁহাদের মধ্যে এক শ্রীশ্রীবাবা বিশুদ্ধানন্দকেই দেখিয়াছি। অন্য দুইজনকে দেখিবার সৌভাগ্য হয় নাই। লাহিড়ী মহাশয়ের প্রচ্ছন্ন যোগী শিষ্য দুই একজনের নাম শুনিয়াছি। লাহিড়ী মহাশয় ও লোকনাথ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সম্পর্কেও অল্প কথাই এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। তবে তাঁহারা যে অত্যুন্নত যোগী ছিলেন ইহা বাবা বিশুদ্ধানন্দের মুখে শুনিয়াছি। অবাঙ্গালীদের মধ্যে তিনি গোরক্ষপুরের গম্ভীরনাথ ও কাশীর তৈলঙ্গ স্বামীকে যোগিরূপে মান্য করিতেন।

বাবা বিশুদ্ধানন্দের যে কত শক্তি ছিল তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তাহার কারণ তিনি ১৪ বৎসর মাত্র বয়স হইতে সুদীর্ঘ ২২ বৎসর কাল তিব্বতে জ্ঞানগঞ্জ নামক বহু প্রাচীন একটি যোগাশ্রমে শত শত বর্ষজীবী যোগিগণের শিক্ষা ও পরিচালনাধীন থাকিয়া স্ব-সম্প্রদায়ে প্রচলিত (অনেকগুলি অন্য সম্প্রদায়ে অজ্ঞাত) সকল প্রকার যোগক্রিয়া আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তদুপরি সূর্য্য-বিজ্ঞান নামে এক অতি প্রাচীন ও অতি রহস্য (এবং অন্য সম্প্রদায়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত) বিজ্ঞান শুধু শিক্ষাই করেন নাই, সে বিষয়ে জীবনব্যাপী গবেষণাও করিয়া গিয়াছেন। সর্ব্বসাধারণকে তাহার অমৃতময় ফল বিতরণ করিবার তাঁহার যে ইচ্ছা ছিল, বিধাতার ইচ্ছায় তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই।

সূর্য্যবিজ্ঞান দ্বারা সকল শক্তির মধ্যে সুদুর্লভ সৃষ্টিশক্তি লাভ করা যায়। একখানি লেন্‌স্ (lens) এর সাহায্যে সূর্য্যবিজ্ঞান দ্বারা বাবা বিশুদ্ধানন্দ যে কত বিচিত্র রকমের বস্তু প্রায়ই চক্ষের নিমেষে সৃষ্টি করিতেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না, ভাবিয়া অবাক্ হইতে হয়। তাঁহার শিষ্য মাত্রেই, এবং অশিষ্যও অনেকে, এমন কি জার্ম্মাণ, মার্কিণ, ও ব্রিটিশ ভ্রমণকারী বা সাংবাদিকেরাও, উহার কিছু কিছু দর্শন করিয়াছেন। শেষোক্ত ব্যক্তিগণ পুস্তকে বা সংবাদ পত্রে তাহা প্রকাশও করিয়াছেন।

এই যে সৃষ্টি-ক্ষমতা ইহা ঐশ্বরিক ক্ষমতা—প্রকৃত ঐশ্বর্য্য। বাগ্মিতাবলে চিত্তরঞ্জক ভাবে ধর্ম্মকথা খ্যাপন, বিদ্যাবলে গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ, ভাবের প্রাচুর্য্যে কীর্ত্তনে নর্ত্তন বা গান গাহিয়া লোককে মাতান উহার তুলনায় নগণ্য, যদিও ইহার কোনও কোনওটি সাধুত্বের নিদর্শন বলিয়া গণ্য হয় এবং দীক্ষার্থীও আকর্ষণ করে। তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারের রীতিতে demonstration করিতে কাহাকে দেখা যায়? যোগ-শাস্ত্রের "সর্ব্বং সর্ব্বাত্মকম্" এ তত্ত্ব সকলেই শুনিয়াছেন, অনেকে যুক্তি দ্বারা ব্যাখ্যাও করিয়াছেন ও করেন, কিন্তু হাতে হাতে একটা গোলাপ ফুলকে জবায়, একটা জবাকে প্রবালে, একটা বেলফুলকে স্ফটিকগোলকে পরিণত করিয়া কয় জন দেখাইয়াছেন? অথচ বাবা বিশুদ্ধানন্দ ইহা হরদম করিতেন। তিনি একদিন কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "বাপু, একটা ঘাসের ডগা নির্ম্মাণ করিতে পারে এরূপ একটি লোক আমাকে দেখাও না।" তিনি ইচ্ছাশক্তি দ্বারা জাম গাছে, ভেরেণ্ডা গাছে আঙ্গুর ফলাইয়াছেন, একটা

জবাগাছকে চিরদিনের মত গোলাপ গাছে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। একটি মার্কিণ সাংবাদিককে বিস্ময়-বিমুগ্ধ করিয়া লেন্সের সাহায্যে একটা শুক্না কাঠের অর্দ্ধাংশ মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রস্তরে পরিণত করিয়াছিলেন, অন্য এক য়ুরোপীয় দর্শকের স্বহস্ত-নিহত চড়াই পাখীকে পুনর্জীবন দিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ লিখিয়াছেন,—"অণিমা ও মহিমা বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে একদিন আঙ্গুল মোটা করিয়া দেখাইয়াছিলেন। * * * হীরক, সুবর্ণ, মুক্তা, প্রবাল প্রভৃতি শত শত প্রকারের বস্তুর নির্ম্মাণ-ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়াছি। জীবের মধ্যে মাছি, চামচিকা প্রভৃতি জীবজন্তু তৈয়ার করিতে দেখিয়াছি।"

তাঁহার বিভূতির সীমা পরিসীমা ছিল না বলিলেই চলে। শ্রীকৃষ্ণ স্বমুখ-বিবরে যশোদাকে বিশ্ব দর্শন করাইয়াছিলেন, ইহা পুরাণে আছে। বাবা বিশুদ্ধানন্দ কথা-প্রসঙ্গে স্বল্প-পরিমাণ স্থানে বিশ্ব-দর্শনের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে সংশয়াপন্ন পুরীর পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় সদাশিব মিশ্রকে স্বমুখ-বিবরে বিশ্ব দর্শন করাইয়া তাঁহার সংশয় অপনোদন করিয়াছিলেন। বিষ্ণুর পদ্মনাভ নাম পুরাণ-প্রসিদ্ধ। তাঁহার নাভি হইতে উদ্গত সনাল পদ্ম মধ্যে পুরাণানুযায়ী ব্রহ্মার চিত্র বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। সকলেরই নাভিতে যে পদ্ম আছে তাহা বাবা বিশুদ্ধানন্দ একাধিক দিন স্ব-নাভি বিস্ফারিত করিয়া তাহা হইতে সনাল পদ্ম বাহির করিয়া শিষ্যগণকে দেখাইয়াছেন। ইহাই তাঁহার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারের রীতিতে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা। ইহাতে বেশী বাগ্‌বৈচিত্র্যের প্রয়োজন হয় না, ভাবে গলিয়া শ্রোতাকে গলাইবার

প্রয়োজন নাই; অথচ দর্শক ও জিজ্ঞাসু সংছিন্ন-সংশয় হইয়া যায়।

আশ্চর্য্যের বিষয়, এত সকল অপরিমেয় শক্তি সত্ত্বেও বাবাজী প্রচ্ছন্ন থাকিতে ভালবাসিতেন এবং অনেকটা ছিলেনও প্রচ্ছন্নভাবে। তিনি আশ্রমে কৌতূহলী দর্শকের আনাগোনা পছন্দ করিতেন না। অধিকারী ভিন্ন সকলকে ধর্ম্মকথা শুনাইয়া বাক্‌শক্তির অপচয় করিতেন না। আশ্রমে ঘটা করিয়া কীর্ত্তন বা দরিদ্র-ভোজনের আয়োজন করিয়া লোক আকর্ষণ করিতেন না। কেবল শিষ্যগণের কল্যাণে তিনি আশ্রমে নানা পর্ব্বে কুমারী ভোজনের ব্যবস্থা করিতেন এবং তদুপলক্ষে আহুত অনাহুত শত শত কুমারী সেবা পাইতেন। তিনি সাক্ষাৎ দেখিতেন এবং শাস্ত্রেও ইহার সমর্থন আছে যে, কুমারী কন্যারা জগতের অসঙ্গা আদিজননীরই প্রতিনিধি।

অনেকেরই ধারণা আছে জ্ঞানীরা নীরস প্রকৃতির এবং যোগীরা কঠোর প্রকৃতির লোক; কেবল ভক্তেরাই রসে ভরপূর। বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণ ভগবানের মাধুর্য্য চিন্তায় সর্ব্বদা মস্‌গুল থাকেন বলিয়া তাঁহাদের প্রকৃতিও মধুর হইয়া যায়। বৈষ্ণবগণের এই খ্যাতির যথার্থতা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ প্রকাশ না করিয়াও নিঃসংশয়ে বলা যায় যে জ্ঞানীকে নীরস এবং যোগীকে কঠোর হইতেই হইবে এরূপ কোনও নিয়ম নাই। জ্ঞানমার্গে সাধককে হর্ষামর্ষ উভয়ই ত্যাগের উপদেশ দেওয়া হয় বটে, কিন্তু সুন্দরের সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইতে হইবে না বা দয়া পরোপকার-প্রবৃত্তি প্রভৃতি হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি সমূলে উৎপাটিত করিতে হইবে,

এরূপ কোনও বিধি নাই—সবই জ্ঞান-প্রদীপ্ত ভাবে করিতে হইবে, কেবল চিত্তচঞ্চলকারী ভাবের আবেগে নয়, ইহাই তাহাদের শিক্ষণীয় ও আচরণীয়। যোগী সম্বন্ধেও উহাই বলা যায়। পরম-তত্ত্ব অরূপ অথচ বিশ্বরূপ, নিরাকার অথচ সর্ব্বাকার। তাহাতে সর্ব্বরসের সমন্বয় রহিয়াছে। রসো বৈ সঃ। যিনি তাঁহাকে নিবিড়-ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন তিনিও সকল রসে নিষ্ণাত হইবেন। যোগীর ঐশ্বর্য্যে অর্থাৎ ঈশ্বরত্বে বা তত্তুল্যতায় কি ঈশ্বরের মাধুর্য্যের স্থান নাই? যোগী যে ঈশ্বরবৎ পূর্ণ, তাঁহাতে কোনও রূপ অপূর্ণতা থাকিবে কি করিয়া? তবে মাধুর্য্যের যে একটা অর্থ বৈষ্ণব সমাজে প্রচলিত তাহার অসংযত চর্চ্চায় গ্রাম্যধর্ম্মের দিকে প্রবণতা আসিতে পারে এবং বহু স্থলে আসিতেও দেখা গিয়াছে। বিষয়টির অধিক বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। যোগী বা জ্ঞানী ঈশ্বর সম্পর্কেও সেরূপ মাধুর্য্য চর্চ্চার সমর্থন করেন না। কেননা পথটা পিচ্ছিল। প্রকৃত ভক্তেরা ঈশ্বর সম্পর্কেই সেরূপ মাধুর্য্য চর্চ্চা নিবদ্ধ রাখেন। অন্য ক্ষেত্রে উহার নিন্দা বৈষ্ণবশাস্ত্রেও প্রসিদ্ধ। তবে পথের পিচ্ছিলতা সম্বন্ধে ভাবপ্রবণ সাধকের সর্ব্বদা সাবধান থাকা কঠিন, এ বিষয়ে বোধ করি সকলে সম্যক্ সতর্ক নহেন।

সে যাহা হউক, আমরা শ্রীশ্রীবাবা বিশুদ্ধানন্দ সম্পর্কে আলোচনা করিতে বসিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি এই মহাযোগী যদিও অনেক সময়ে শিষ্য-পরিবেষ্টিত হইয়াও নীরবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থাকিতেন এবং শিষ্যদিগকে নীরবে সচ্চিন্তা করিবার সুযোগ দিতেন, তথাপি প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে প্রচুর হাস্যরস ও

অন্যান্য রস অবতারণ ও বিতরণ করিতেন। তিনি ষড়্রসে রসিক ছিলেন। তাঁহার হাস্যরস যেমন ছিল শিষ্যগণের মনোরঞ্জনার্থ, তেমনই ক্রোধও ছিল তাহাদের কল্যাণার্থ। তিনি যেমন অতি অল্প কথায় লোককে হাসাইতে পারিতেন তেমনই অতি অল্প কথায় ক্রোধ প্রকাশ করিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করিতেন। আর তাহার ফল তিক্ততাবর্জ্জিত ছিল বলিয়া তাঁহার ক্রোধ রসাঙ্গই ছিল। তিনি চল্‌তি ভাষায়ই কথা বলিতেন, তাহাতে কৃত্রিমতাও যেমন থাকিত না, গ্রাম্যতাও তেমনই থাকিত না। তাঁহার কোনও আচরণেই কৃত্রিমতার বা লোক-দেখানো ভাবের লেশমাত্রও ছিল না।

কঠোরতা যোগের অপরিহার্য্য দোষ নয়। কোনও যোগীতে যদি কঠোরতা দেখা যায়, তবে বুঝিতে হইবে উহাতে তাঁহার ব্যক্তিগত প্রকৃতির ছাপ রহিয়াছে অথবা যাহা আরও অধিক সত্য হওয়া সম্ভব, উহা প্রয়োজনাধীনরূপে কৃত্রিম। যোগী কখনও দয়া মায়াহীন হইতে পারেন না। বাহিরের কঠিন আবরণের অন্তরালে প্রচুর করুণা ও সহানুভূতি তাঁহাতে থাকিবেই। কেননা চিত্তের পরিকর্ম্ম বা পরিমার্জ্জন বা মলাপনয়নের সাধনরূপে তাঁহাকে যে পরের সুখ দেখিয়া ঈর্ষ্যার পরিবর্ত্তে মৈত্রী, দুঃখ দেখিয়া করুণা, পুণ্য দেখিয়া মুদিতা (হর্ষ), এবং পাপ দেখিয়া ঘৃণা বা বিদ্বেষের পরিবর্ত্তে উপেক্ষা অভ্যাস করিতে হইয়াছে। বাবা বিশুদ্ধানন্দে এ সকলই প্রচুর পরিমাণে দেখা গিয়াছে। তাঁহার হৃদয় ছিল অতি কোমল। মুখে ঔদাসীন্য এমন কি বিরক্তি প্রকাশ করিলেও শিষ্যের দুঃখে, রোগে, কষ্টে সমুচিত

ব্যবস্থা অবলম্বন তিনি অনেক সময়ে তাহার অজ্ঞাতসারেই করিতেন, অনেক সময়ে অযাচিত হইয়াও করিতেন। তিনি বহু বহুবার রোগীর রোগ নিজে টানিয়া নিয়া তাহাকে রোগমুক্ত করিয়াছেন বা তাহার ক্লেশের প্রচুর লাঘব করিয়াছেন। বস্তুতঃ ঐভাবে তিনি নিজ জীবনই দান করিয়াছেন। চরিত্রের ঔদার্য্য মাধুর্য্য ইহা অপেক্ষা অধিক কি কল্পনা করা যায়? শিষ্যেরা ছিল তাঁহার প্রাণ। 'আমি সমস্ত জগদ্বাসীর উপকার করিতেছি', এমন ছেঁদো কথা তিনি কখনই বলিতেন না। কিন্তু তাঁহার জীবন ছিল জগতের শিক্ষার স্থল। বহু লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করুক এরূপ আকাজ্ক্ষা তিনি কখনও করেন নাই। অথচ তাঁহার কৃপার টানে উচ্চ নীচ, ধনী নির্ধন শত শত লোক তাঁহার নিকট মন্ত্রদীক্ষা পাইয়াছে। তিনি রাজা রাণীর দীক্ষাপ্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের প্রার্থনায় উৎসাহ প্রকাশ করেন নাই এবং শেষ পর্য্যন্ত দীক্ষা দেনও নাই। তাঁহার শিষ্যগণ মধ্যে ধনী ও মানী এবং অত্যুচ্চ শিক্ষিত লোক ত ছিলই, বরং মধ্যবিত্ত ও অল্পবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত ও অল্পবিত্ত লোকই অধিক ছিল।

তাঁহার চরিত্রের এক মধুর ধর্ম্ম এই ছিল যে, তিনি অতিশয় গুণগ্রাহী ছিলেন। শিষ্য হউক, অশিষ্য হউক, গুণীর আদর করিতে তিনি কখনই ত্রুটি করিতেন না। উদাহরণ দিতে গেলে প্রবন্ধ আরও বেশী দীর্ঘ হইবে। শিষ্যদের যৎসামান্য গুণ তিনি অতি আদরের চক্ষে দেখিতেন এবং তাহাদিগকে উৎসাহ দিতে কার্পণ্য করিতেন না।

বালক বালিকারা ছিল তাঁহার অতি প্রিয়। তাহাদের সঙ্গে তিনি কত হাসি কৌতুকই না করিতেন। ইহাতেও সময় সময় তাঁহার ঐশ্বর্য্য প্রকাশ হইত। একটি ৮।৯ বৎসরের কুমারী একদিন তাঁহাকে বলে, "বাবা, কাল রাত্রিতে স্বপ্নে দেখিয়াছি আপনাকে যেন কোলে নিয়াছি।" এই কথা শুনিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে তাহাকে একটু অন্তরালে নিয়া সোলার মত হাল্‌কা হইয়া তাহার কোলে উঠেন। কিছুক্ষণ পরে সেই লঘুত্ব সংহার করিতে আরম্ভ করিলে বালিকাটি তাঁহাকে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া সকলের নিকট আসিয়া সেই কথা বলে। বস্তুতঃ মাধুর্য্য যে ঐশ্বর্য্যেরই অঙ্গ একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মাধুর্য্য, সামর্থ্য, জ্ঞান, প্রেম সব নিয়াই ঐশ্বর্য্য, যাহা যোগীর বিশিষ্ট লক্ষণ বলিয়া স্বীকৃত।

শ্রীশ্রীবাবা বিশুদ্ধানন্দের সকল মাহাত্ম্যের সমুচিত বর্ণনা বা বিশ্লেষণ আমার সামর্থ্যের অতীত। আর একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার চেষ্টাও বাতুলতা মাত্র। আমি দিঙ্‌মাত্র প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিলাম। পাঠকগণ আমার অযোগ্যতা ও ধৃষ্টতা ক্ষমা করুন।

দেহ ও কর্ম

(প্রথম প্রস্তাব)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট

শ্রীশ্রীগুরুদেব বলিতেন, "শরীরং কেবলং কর্ম শোকমোহাদি-বর্জিতম্।" কর্ম হইতে শরীর হয় ইহা যেমন সত্য, তদ্রূপ কর্মের জন্যই শরীর ইহাও তেমনি সত্য। শরীর ব্যতীত কর্মও হয় না, ভোগও হয় না। প্রারব্ধ কর্মের ফল ভোগ করিবার জন্য শরীর গ্রহণ করিতে হয় এবং যতদিন শরীর দ্বারা ঐ ভোগ সমাপ্ত না হয় ততদিন শরীর-ধারণ আবশ্যক হয়। ভোগ-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শরীর-পাত ঘটিয়া থাকে। জাতি, আয়ু ও ভোগ এই তিনটি প্রারব্ধের ফল। দেহ-সম্বন্ধই জাতি বা জন্ম এবং এই সম্বন্ধ-বিচ্ছেদই মৃত্যু। উভয়ের অন্তরালবর্ত্তী সময়টি উক্ত সম্বন্ধের স্থিতিকাল। উহাকেই প্রচলিত ভাষাতে আয়ু বলা হয়। সুখ ও দুঃখ, যাহা নিজের নিয়ত-বিপাক প্রাক্তন কর্মবশতঃ আপতিত হয় তাহা বিনা বিচারে ভোগ করিয়া যাইতে হয়। তবেই উহা কাটিতে পারে। নতুবা ভোগকালেও অভিনব কর্মবীজ সঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

যে দেহ দ্বারা কর্ম করা হয় তাহা কর্মদেহ, যে দেহ দ্বারা কর্মফল সুখ-দুঃখ ভোগ করা হয় তাহা ভোগদেহ, এবং যে দেহে একই সঙ্গে কর্মও হয় ভোগও হয় তাহা মিশ্রদেহ। সাধারণতঃ

কামধাতুর দেবাদির, তির্য্যগাদির, প্রেতযোনির, অসুরাদি ও নরকবাসী জীবের দেহ ভোগদেহ। মানুষের দেহ কর্মদেহ ও ভোগদেহ উভয়ই। কর্ম করিয়া অর্থাৎ পুরুষকার প্রয়োগ করিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইবার যোগ্যতা একমাত্র মানুষেরই আছে—অন্য প্রাণীর সে সামর্থ্য নাই। তাই মানুষের এত গৌরব। তত্ত্ববিদ্‌গণ সেইজন্য নরদেহের এত বেশী মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব ও মহাপুরুষ-সংশ্রয়—এই তিনটিকে জীবনের দুর্লভ সম্পৎ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভক্ত রামপ্রসাদও

"মনরে, তুমি কৃষিকাজ জান না,—
এমন মানব জমিন রইল পতিত,
আবাদ করলে ফলত সোনা,"

বলিয়া তাঁহার অমর সঙ্গীতে মনুষ্য-দেহেরই উৎকর্ষ খ্যাপন করিয়াছেন। এই যে 'কৃষিকাজের' কথা বলা হইয়াছে ইহারই নাম কর্ম—মানব দেহকে আশ্রয় করিয়া মনের দ্বারা ইহা সম্পন্ন করিতে হয়, তাই মানব দেহের এত মহত্ত্ব। প্রকৃতির নিয়মে ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া জীব সর্ব্বশেষে মনুষ্য-দেহই প্রাপ্ত হয়। তখন সে কর্মের অধিকারী হয় ও অধ্যাত্ম-যাত্রার পথে অগ্রসর হইবার সুযোগ লাভ করে। তাই হংস গীতাতে আছে—"গুহ্যং ব্রহ্ম তদিদং বো ব্রবীমি, ন মানুষ্যাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ"। অবিবেকের বশে ভোগ-বাসনা দ্বারা চালিত মানুষ অসংযত জীবন যাপন করিয়া দীর্ঘকাল কৃত কর্মের ফলভোগের জন্য অনুরূপ ভোগদেহ প্রাপ্ত হয় এবং এইভাবে অধঃ, ঊর্দ্ধ ও মধ্যলোক ভ্রমণ

করিতে করিতে কদাচিৎ ভোগকালের অবসান মুখে ভাগ্যবশতঃ বিবেকের উদয়ে বিশুদ্ধ কর্ম করিতে সমর্থ হয়। যোগরূপ কর্মই বিশুদ্ধ কর্ম জানিতে হইবে। শুক্ল, কৃষ্ণ ও মিশ্র. এই তিন প্রকার কর্ম হইতে তদনুরূপ বিভিন্ন প্রকার গতিলাভ হয়। শুক্ল কর্মই পুণ্য—যাহার ফলে দেবলোকে দেবদেহ ধারণ করিয়া বাসনানুসারে আনন্দভোগের অধিকার জন্মে। তদ্রূপ কৃষ্ণ কর্ম বা পাপের ফলে অধোলোকে গতি হয় ও দুঃখভোগ হয়। মিশ্র কর্মে মধ্যলোকে মনুষ্য-দেহ লাভ হয়। কিন্তু যতক্ষণ অশুক্ল ও অকৃষ্ণ কর্ম অনুষ্ঠিত না হয় ততক্ষণ মানব-দেহের সার্থকতা সম্পন্ন হয় না। পুণ্য বা পাপের জন্য নরদেহ গ্রহণ করা হয় নাই—পুণ্য-পাপের অতীত শুদ্ধ আত্মকর্মের জন্যই এ দেহ ধারণ করা হইয়াছে। যতদিন তাহা না হইবে ততদিন লোক লোকান্তরে ভ্রমণ করিলেও স্থূল মানবদেহের প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না।

মনুষ্যদেহই কর্ম্মানুযায়িনী গতির সূত্র। এইখান হইতে ঊর্দ্ধেও যাওয়া যায়, অধঃতেও যাওয়া যায়, বিশ্বের সর্ব্বত্র যাওয়ার পথ পাওয়া যায়। আবার ভাগ্য থাকিলে এইখান হইতেই কর্ম-প্রভাবে এমন পথ পাওয়া যায় যাহা আশ্রয় করিলে আত্মজ্ঞানের বিকাশ হইয়া পূর্ণত্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়।

“যোনেঃ শরীরম্”—যোনি হইতে শরীর উদ্ভূত হয়। নরযোনি শ্রেষ্ঠ যোনি—নরদেহ শ্রেষ্ঠ দেহ। এই দেহ একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ। যাহা কিছু বাহ্য জগতে আছে তাহা সবই মানুষের দেহে আছে। অতি গভীর পাতাল-রাজ্যের নিম্নস্থ গাঢ়তম অন্ধকার হইতে ঊর্দ্ধতম মহাব্যোমের পরিস্ফুট চিদালোক পর্য্যন্ত

এই দেহে বিরাজ করিতেছে—কিছুরই অভাব নাই। পৃথিবীর দেহ মাটীর দেহ, তাহা সত্য, তথাপি ইহাতে প্রকৃতির সকল তত্ত্বই নিগূঢ়ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। আত্মার বা পুরুষের ভোগ ও সেবার জন্য এবং কর্মের জন্য যাহা আবশ্যক সবই দেহে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। দেহকে ক্ষেত্র বলা হয়—কারণ মন ও প্রাণের দ্বারা ইহাকে যথাবিধি কর্ষণ করিয়া ইহাতে গুরুদত্ত বীজ বপন করিতে পারিলে ইহা হইতে কল্পবৃক্ষের উৎপত্তি হয় যাহা যথাসময়ে অমৃত ফল প্রসব করে।

চেতন ও অচেতন উভয় সত্তার সংঘর্ষে দেহ উৎপন্ন হয়। লিঙ্গ ও যোনির পরস্পর সন্নিকর্ষ হইতে ইহা জাত হয়। লিঙ্গ অলিঙ্গের চিহ্ন মাত্র। মহালিঙ্গ ও মহাযোনি মূলতঃ এক হইলেও ব্যক্তভাবে লিঙ্গে ও যোনিতে তারতম্য আছে এবং এই তারতম্য-মূলক ক্রমিক উৎকর্যসম্পন্ন ৮৪ লক্ষ স্তর ও তদনুরূপ ৮৪ লক্ষ দেহ বিদ্যমান আছে। বিশুদ্ধ অহংভাবের বিকাশের জন্য প্রকৃতির বিশাল বিজ্ঞানশালাতে এই বিবর্ত্তনের কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। মূল অব্যক্ত সত্তা হইতে শক্তির স্পন্দনে অন্নময় সত্তার আবির্ভাব হয়। অন্নময় সত্তা হইতে প্রাণময় সত্তার বিকাশ ও প্রাণময় সত্তা হইতে মনোময় সত্তার অভিব্যক্তি এই বিবর্ত্তনের অন্তর্গত। সঙ্গে সঙ্গে দেহেরও ক্রমবিকাশ জানিতে হইবে।

মানবদেহের বিকাশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রাকৃতিক প্রেরণা হইতেই আপনা আপনি বিকাশ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। "God made Man after His own Image" যে বলা হয় তাহার তাৎপর্য্য এই যে মনুষ্যদেহই ভগবৎ স্বরূপের প্রতীক বা আভাস।

মনুষ্যত্বের পূর্ণতা হইতেই পূর্ণ ভগবত্তার অভিব্যক্তি হয়। নররূপী আধার ভিন্ন অন্য কোন আধারে অর্থাৎ পশু আদির আধারে দিব্যশক্তির আবির্ভাব সম্ভবপর নহে। অবতারাদির ব্যাপার অন্যরূপ। ভক্ত রামপ্রসাদ যাহাকে কৃষিকার্য্য বলিয়াছেন তাহা একমাত্র এই নরদেহেই সম্ভবপর হয়, কারণ এই দেহেই অহং-ভাবের প্রথম স্ফূর্ত্তি হয় এবং এই দেহেই অহং-ভাবের পূর্ণতা সিদ্ধ হয়। সমস্ত জড় ও জীব জগতের সমষ্টি-সত্তা ঘনীভূত হইয়া মানবদেহ রচিত হয়। মনের ও অহং-ভাবের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে বাক্‌শক্তি বৈখরীরূপে এই দেহেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। বলা বাহুল্য, ইহাই প্রজ্ঞার বীজ। বর্ণাত্মক শব্দের ক্রিয়া এবং বর্ণাত্মক শব্দের বিলয়ন ব্যাপার উভয়ই এই দেহেই হইয়া থাকে। নাদ ও জ্যোতি যে বিন্দু হইতে ফোটে তাহার প্রথম সূচনা মানবদেহেই পাওয়া যায়। এই দেহেই বন্ধন বোধ হয় বলিয়া এই দেহেই মুক্তি সম্ভবপর। কুণ্ডলিনীর স্থিতি এই দেহেই আছে। সুষুম্না নাড়ী ও ষট্‌চক্রের অবস্থান মানবেতর যোনিতে যথাবৎ পাওয়া যায় না। ব্রহ্মচর্য্যের অভ্যাস অন্য দেহে সম্ভবপর নয়। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি পশু প্রভৃতিতেও হইয়া থাকে, কিন্তু তুরীয় ও তুরীয়াতীত একমাত্র মানবেই সম্ভবে। এইজন্য কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিরূপ যোগের অভ্যাসও শুধু এই মানবদেহেই হইতে পারে।

প্রকৃত দিব্যদেহ যাহা তাহা মানবদেহেরই বিকাশ মাত্র। মানবদেহই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে ভগবদ্‌দেহরূপে পরিণত হইয়া থাকে। এই পরিণতি-সাধনে যে উপায় অনুসৃত হয় তাহারই নাম কর্ম।

দেহে চৈতন্য ও জড় সত্তা মিলিতভাবে বিদ্যমান। মানবেতর দেহেও যেমন, মানবদেহেও ঠিক তেমনি। কিন্তু নিম্নদেহে অহং-ভাবের অবয়বরূপ রশ্মিপুঞ্জ ক্রমবিকাশের নিয়মে পরিস্ফুট হয় না। এই সকল রশ্মি দেহস্থ কমলের দলে দলে আপন স্বরূপ প্রকটিত করে। এই সকল বিকীর্ণ রশ্মিকে পৃথক্ পৃথক্ ফুটাইয়া একত্র করিতে পারিলেই জ্ঞানজ্যোতির বিকাশ হয় ও দিব্যনেত্র উন্মীলিত হয়। ষট্‌চক্রভেদের ইহাই তাৎপর্য্য। আভাস অহং ক্রমশঃ বিশুদ্ধ অহংএ পূর্ণতা লাভ করে। মানবজীবনের সফলতা তাই আত্মসাক্ষাৎকার প্রাপ্তি বলিয়া জানিতে হইবে।

রশ্মিসকল মানবদেহে তেজঃ ও কায়াগ্নিরূপে জাগ্রৎ হয়। পূর্ণভাবে জাগিলে ইহারাই সম্মিলিতভাবে ঋষিগণের বর্ণিত ব্রহ্ম-বর্চসরূপে উপলব্ধ হয়। বিজ্ঞানবিৎ যোগিগণ ইহাকে তাড়িত শক্তি বা বিদ্যুৎ নামে অভিহিত করেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মানবদেহে সকল তত্ত্বই বিদ্যমান আছে। আপাততঃ ৩৬ তত্ত্ব না ধরিয়া প্রচলিত ২৪, ২৫ বা ২৬ তত্ত্বই ধরা যাউক। তবে ইহাদের মধ্যে পার্থিব দেহে পৃথিবী তত্ত্বের প্রাধান্য আছে। বলা বাহুল্য, পঞ্চভূতই স্থূল দেহের উপাদান রূপে বিদ্যমান থাকিলেও পার্থিব দেহে পৃথিবীরই প্রাধান্য। পৃথিবীর অংশ অন্যান্য ভূত বা তত্ত্বের অংশের সহিত মিলিতভাবে বিদ্যমান আছে। এই মিলনের বা সংঘাতের মূলে আছে সংস্কারোপহিত শক্তিরূপী চৈতন্যের সংহনন শক্তি। চিৎ ও অচিতের মিলনেই সৃষ্টি—ইহা মনে রাখিতে হইবে। যোগী বা কর্ম্মী যখন আত্মকর্মে প্রবৃত্ত হয় তখন তাহার ক্রিয়মাণ কর্ম্মের প্রভাবে এই সংঘাতটি ভাঙ্গিয়া যায়—অবশ্য

ক্রমশঃ। ফলে চৈতন্যাংশ মুক্ত হয় ও জড়াংশ পৃথক্ হয়। এই পৃথক্করণটি বিবেকের ক্রিয়া।

দুগ্ধ বা দধি মন্থন করিলে যেমন মাখন উত্থিত হয়, যেমন গম ভাঙ্গিলে তাহা হইতে আটা বাহির হয়, তিল ও সর্ষপ ঘানিতে পিষিলে যেমন তৈল বাহির হয়, তদ্রূপ কর্মরূপ মন্থন-ক্রিয়ার প্রভাবে পার্থিব দেহ হইতে দেহস্থ চিদুজ্জ্বল সত্ত্বাংশ তাড়িত শক্তি রূপে পৃথক্ হয়। ক্রমশঃ জলীয় ও অন্যান্য ভৌতিক অংশ হইতেও সত্ত্বাংশ পৃথক্ হইয়া যায়। স্থূলদেহের সমস্ত সত্ত্বাংশ যতক্ষণ পৃথক্ না হয় ততক্ষণ মন্থন-ক্রিয়ার প্রয়োজন থাকে। তাহার পরে আর ঐ ক্রিয়া আবশ্যক হয় না। তিলে যে পরিমাণ তৈল নিহিত থাকে তাহার সবটুকু বাহির হইলে আর পেষণের প্রয়োজন থাকে না, কারণ অবশিষ্টাংশ তৈলহীন অসার পিণ্ড মাত্র। তদ্রূপ স্থূলদেহে যে পরিমাণ চৈতন্য শক্তি আবদ্ধ ছিল তাহার সমস্তটা মুক্ত হইলে স্থূল দেহের ক্রিয়ার অবসান স্বভাবতঃই হইয়া থাকে। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। অনন্তকাল বিবেক-ক্রিয়া চলে না। বিবেকমূলক জ্ঞানের উদ্ভব হওয়াই কর্মের উদ্দেশ্য।

ঐ উদ্ভূত তেজঃ বা শক্তি স্থূল দেহের অন্তঃস্থ অপঞ্চীকৃত ভূত ও অন্যান্য তত্ত্বের অভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বিগলিত করে ও স্থায়ী আকারে পরিণত করে। সূক্ষ্মতত্ত্ব সকল সূক্ষ্ম দেহের অবয়ব—কিন্তু ঐ সকল তত্ত্ব হইতে স্থায়ী আকার গঠন এতদিন হয় নাই। তাই প্রকৃত সূক্ষ্মদেহ সাধকের ততদিন প্রাপ্তি ঘটে না যতদিন তাহার স্থূল দেহের কর্মের অবসান না হয়। ঐ সকল তত্ত্ব উপাদান হিসাবে প্রতি মানবেই আছে এবং নিজ নিজ কার্য্য

করিতেছে, কিন্তু স্থায়ী দেহ রূপে কার্য্য করে না। দেহরূপে উহারা যখন পরিণত হয় তখন স্থূল শরীরের অভিমানী পুরুষ স্থূলে অভিমান-রহিত হইয়া ঐ সূক্ষ্ম শরীরে অভিমানী হয় ও আপন ইচ্ছানুসারে স্থূল পিণ্ড ত্যাগ করিয়া বাহির হইতে পারে ও ফিরিতে পারে। যোগী ভিন্ন সাধারণ মানুষ ইহা পারে না। তাহার একমাত্র কারণ, স্থায়ী রচনারূপে সূক্ষ্ম শরীর তাহার নাই ও তাহাতে তাহার অভিমানও ক্রিয়াশীল নহে। প্রকৃতির নিয়মে ও প্রেরণাতে সূক্ষ্মাদি অবস্থাতে সকলেরই সূক্ষ্ম শরীরের গতি ও সঞ্চরণ দৃষ্ট হয়, ইহা সত্য। কিন্তু তাহা বাসনাদিবশতঃ প্রকৃতির প্রভাবে হয়, স্বেচ্ছাতে হয় না। পূর্ব্বে যাহা বলা হইল তাহা সম্পন্ন হইলে স্বেচ্ছাতে যেমন স্থূল জগতে স্থূলদেহ লইয়া ব্যবহার করা যায়, তদ্রূপ নিজের ইচ্ছা অনুসারে সূক্ষ্ম জগতেও সূক্ষ্মদেহ লইয়া বিচরণ করা যায়।

অনাত্মাতে আত্মবোধরূপ অভিমান যখন স্থূল শরীর অবলম্বন করিয়া কার্য্য করে তখন এই অভিমান হইতেই স্থূল দেহের কর্ম প্রসূত হয়। কিন্তু যখন পূর্ব্বলিখিত নিয়মে একদিকে স্থূল দেহের কর্ম সমাপ্ত হইবে ও অপরদিকে স্থায়ী সূক্ষ্ম দেহ সূক্ষ্ম সত্তার উপাদানে অভিব্যক্ত হইবে তখন ঐ অভিমান স্বভাবতঃ স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম দেহকে আশ্রয় করিবে। তখন ঐ সূক্ষ্ম দেহকেই 'আমি' বলিয়া মনে হইবে ও স্থূলদেহে 'আমি'-বোধ আভাস মাত্র হইয়া যাইবে। কারণ স্থূলদেহ চৈতন্যের অপগমের ফলে তখন শববৎ হইবে। অভিমানশীল সূক্ষ্মদেহ তখন এই শববৎ স্থূল দেহকে নিজের অধীন করিয়া আসনে পরিণত করিবে।

ইহাই প্রকৃত শবাসন—পূর্ণ যোগীর যোগ-ক্রিয়ার পরিপুষ্টির জন্য এই আসনই উপযোগী হয়। তখন স্থূল-নিরপেক্ষ অথচ শবাসনীকৃত স্থূলে অধিষ্ঠিত সূক্ষ্ম দেহে কর্ম আরম্ভ হয়।

যদি প্রারব্ধ ভোগ পূর্ব্বেই সমাপ্ত হইয়া যায় ও স্থূল দেহের কর্ম-সমাপ্তির পূর্ব্বেই স্থূল দেহের অন্ত ঘটে তাহা হইলে অবশিষ্ট কর্ম করিবার জন্য মৃত্যুর পর আবার স্থূলদেহ গ্রহণ করিতে হয়। বলা বাহুল্য, আত্মকর্মই এখানে কর্ম শব্দের লক্ষ্য। আত্মকর্ম না হইয়া অন্য কর্ম হইলে সুখ দুঃখ ভোগের জন্য পুনঃ পুনঃ জন্মান্তরের আশঙ্কা থাকে। পক্ষান্তরে যদি কাহারও স্থূল কর্মের শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রারব্ধও সমাপ্ত হয় ও তাহার ফলে স্থূলদেহ ত্যাগ হয়, তাহা হইলে উহাকে শবাসনরূপে পরিণত করিবার ও তাহাকে অধিষ্ঠান করিয়া সূক্ষ্মদেহে কর্ম করিবার সুযোগ এ জীবনে ঘটে না।

স্থূল কর্ম প্রভাবে যেমন স্থূল ভৌতিক সত্তা হইতে চৈতন্যের নিষ্কর্ষ হয় ও সেই চৈতন্য-শক্তিরূপী অগ্নির তাপে সূক্ষ্ম সত্তা বিগলিত হইয়া আকার ধারণ করে ও স্থায়ীরূপে পরিণতি লাভ করে, তদ্রূপ সূক্ষ্মদেহে অভিমান উদয়ের পরে সূক্ষ্মদেহে অনুষ্ঠিত কর্মের প্রভাবে সূক্ষ্ম সত্তাতে নিহিত অবিবিক্ত চৈতন্য-শক্তির বিবেচন হয় ও সেই চৈতন্যশক্তি পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতিতে উত্থিত হইয়া কারণ সত্তাকে বিগলিত করে, যাহার ফলে কারণ সত্তা প্রকৃত কারণদেহরূপে পরিণত হয়। যতদিন সূক্ষ্ম সত্তা হইতে তন্নিহিত সমগ্র চৈতন্য বা তেজঃ সমাহৃত না হয় ততদিন সূক্ষ্ম দেহের কর্মের অবসান হয় না। মৃত্যুর পূর্ব্বে যদি সূক্ষ্ম দেহের দ্বারা অনুষ্ঠেয় আত্মকর্ম পরিসমাপ্ত হয় তাহা হইলে সূক্ষ্ম দেহটিও পূর্ব্ববৎ স্থূলের

ন্যায় শবরূপে পরিণত হয় ও অভিমান সূক্ষ্মকে ত্যাগ করিয়া কারণ-দেহকে আশ্রয় করে। 'আমি'টি তখন কারণদেহকে আশ্রয় করিয়া স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুইটি শবাসনের উপর অধিষ্ঠিত হয় ও কারণ-দেহের কর্ম পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। সূক্ষ্মদেহের কর্ম এক আসনের কর্ম, কিন্তু কারণদেহের কর্ম দুই আসনের কর্ম।

কিন্তু যদি সূক্ষ্মের কর্ম পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বেই মৃত্যু ঘটে তাহা হইলে কারণ দেহের অনুষ্ঠেয় কর্ম অনারব্ধ থাকিয়া যায়। স্থূল দেহের কর্ম পূর্ণ না হইয়া দেহপাত হইলেও তদ্রূপ সূক্ষ্মের কর্ম অনারব্ধ থাকে। স্থূলাভিমান থাকিতে থাকিতে স্থূলকর্ম বন্ধ হইলে আবার স্থূলকে গ্রহণ করিবার জন্য মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিতে হয়। কিন্তু স্থূলাভিমান নিবৃত্ত হওয়ার পর বা সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটিলে সাধারণতঃ মাতৃগর্ভে আসিবার প্রয়োজন হয় না। তখন সূক্ষ্মদেহ শবাসনে উপবিষ্ট হইয়াছে। তাই ঐ মৃত্যু প্রকৃত মৃত্যু নহে। সূক্ষ্মাভিমানী শবীভূত স্থূলে উপবিষ্ট যোগী তথাকথিত মৃত্যুর পরেও আসন ত্যাগ করে না—সূক্ষ্ম শরীরে থাকিয়া সে কার্য্য করিতেই থাকে। তাহার কর্মে বাধা হয় না। তবে জীবিত অবস্থাতে থাকিয়া কর্ম করিতে পারিলে কর্ম সমাপ্ত হয় অল্প সময়ে—কারণ ঐ কর্ম কালের কর্ম। উহা ক্ষিপ্র গতিতে অগ্রসর হয়। কিন্তু স্থূল কর্ম সমাপ্ত না করিয়া মৃত্যু ঘটিলে শবাসন লাভ হয় না বলিয়া পুনরায় মাতৃগর্ভে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হয়। অন্য কোন উপায় নাই। অন্ততঃ একটি শবাসন লাভ করিতে পারিলেও যোগী আসনে বসিতে পারে বলিয়া গর্ভযন্ত্রণা ও কালরাজ্যে প্রবেশের উপদ্রব হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে। মৃত্যুর

ভিতর দিয়াই অমরত্বের মার্গ রহিয়াছে জানিতে হইবে। পশুর মৃত্যুতে অমরত্ব আসে না—পশু "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি," পুনঃ পুনঃ জঠর-যন্ত্রণা ভোগ তাহার পক্ষে অনিবার্য্য। কিন্তু স্থূলদেহের আবশ্যকীয় কর্ম পূর্ণ করিতে পারিলে ও স্থূলদেহকে শবরূপে আসন করিয়া নিজে তাহাতে অধিষ্ঠিত হইতে পারিলে জন্ম-মৃত্যু বর্জিত হইয়া যায়। কিন্তু কর্মের পূর্ণতা হয় নাই বলিয়া কর্ম বর্জিত হয় না, মহাজ্ঞানও আসে না। আপেক্ষিক খণ্ড জ্ঞান অবশ্য আসে।

প্রশ্ন হইতে পারে—যোগী তখন কোথায় ও কি ভাবে থাকিয়া কর্মের ক্রমিক বিকাশ সম্পন্ন করেন? এই প্রশ্নের বিস্তারিত আলোচনা বারান্তরে করিতে চেষ্টা করিব ইচ্ছা রহিল। তবে এই স্থানে ইহাই বলিয়া রাখি যে আত্মকর্মের গতিরোধ হয় না ও একবার শবাসন প্রাপ্ত হইলে জন্ম-মৃত্যুর অতীত, কালের অতীত, নির্মল ভূমিতে যোগী আত্মকর্ম পূর্ণ করিতে থাকেন। তবে ঐ কর্ম পূর্ণ করিতে সময় অধিক লাগে। কালের রাজ্যে বিকাশ যত দ্রুত হয় অমর দেহে তত দ্রুত হইবার সম্ভাবনা নাই।

যাহা হউক, আমাদের লক্ষ্য বর্ত্তমান জীবনে কর্ম সমাপ্ত করা ও অভিনব অনন্ত কর্মের ধারাতে প্রবেশ করা। প্রকৃতি হইতে পুরুষকে পৃথক্ করিয়া প্রকৃতি-জন্য কারণদেহ পর্য্যন্ত আয়ত্ত করিতে না পারিলে এই মহালক্ষ্যে উপনীত হইবার আশা নাই। অভিমান কারণদেহকে আশ্রয় করিয়া কারণদেহে কর্মের সূচনা করে। সূক্ষ্মের কর্ম শেষ হওয়ার পর ও সূক্ষ্মদেহ শবাসন হইয়া কারণে অধিষ্ঠিত হওয়ার

পর যোগী কারণদেহকেই আশ্রয় করিয়া **আমি** বলিয়া নিজেকে অনুভব করেন। আত্মকর্ম চলিতেই থাকে এবং কারণ সত্তা বা মূল প্রকৃতিতে নিহিত গুপ্ত চৈতন্য বিবিক্ত হইতে থাকে। যখন প্রকৃতি-রূপা কারণ সত্তা হইতে চিৎশক্তি বিবিক্ত হয় তখন যোগীকে একটি অনির্বচনীয় স্থিতির সম্মুখীন হইতে হয়। এই অবস্থাতেই জীবাত্মা বা পুরুষের স্বরূপ-জ্ঞান জাগে। পুরুষ যে চতুর্বিংশতি তত্ত্বময়ী প্রকৃতি হইতে বিবিক্ত তাহা তখন স্বচক্ষে দর্শন হয়। এই সময় যদি পরমেশ্বরের মহাকৃপা লাভ না ঘটে তাহা হইলে পুরুষ এই স্বরূপ-জ্ঞানে প্রকাশমান নিজ সত্তাতে স্থিত হয় ও কৈবল্য লাভ করে। মায়াতেও প্রায় এই জাতীয় অবস্থারই উদয় হয়। দুই আসনের ক্রিয়ার ফলে এই পর্য্যন্ত সিদ্ধি ঘটে।

কিন্তু ইহাকে আমি মহাসিদ্ধি বলি না—যদিও ইহাও কম নহে। প্রকৃতি হইতে পৃথক্ হইলেই ত চলিবে না—প্রকৃতিকেও, ঠিক প্রকৃতিকে নহে কিন্তু কারণ দেহকেও, আসন করিতে হইবে। তাহা না করিতে পারিলে প্রকৃতি-মুক্ত পুরুষের কৈবল্যই প্রাপ্তি।

কারণদেহকে আসন করিতে হইলে অভিমানকে বিসর্জ্জন না করিয়া জাগাইয়া রাখিতে হয়। এক হিসাবে দেখিতে গেলে অভিমানের পূর্ণাহুতির সময় আসিয়াছে,—স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, তিন দেহ রচিত হইয়াছে, তিন দেহেই অভিমান সমভাবে কার্য্য করিয়াছে, ফলে তিন দেহেরই কর্ম সমাপ্ত হইয়াছে। তাই প্রকৃতির কর্ম সমাপ্ত হইয়াছে এবং চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সহিত সঙ্কীর্ণভাবে অবস্থিত বদ্ধ চিৎসত্তা মুক্ত হইয়া স্বয়ং পুরুষরূপে

আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—সুতরাং কর্ম্মের ফলে জ্ঞান বা আত্মজ্ঞান উদিত হইয়াছে। এখন কৈবল্য স্বতঃপ্রাপ্ত—আর তাহাতে অভিমানের স্থান নাই, প্রয়োজনও নাই। কারণ, করণীয় কর্মও আর অবশিষ্ট নাই। তাই ইহাই অভিমানের পূর্ণাহুতির সময়।

কিন্তু মহাযোগী এখানেও শেষ দেখেন না। পূর্ণাহুতি অভিমানের হয় বটে, কিন্তু অগ্নি নির্ব্বাণ হয় না। অথবা নির্ব্বাণের মধ্যেও অনির্ব্বাণ অগ্নি জাগাইয়া রাখা হয়—তদ্রূপ অভিমান সমাপ্ত হইলেও একটি বিশুদ্ধ অভিমানরূপে তাহাকে রাখা হয়। কারণ, মহাকর্ম ত বাকী আছে।

অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপী নির্মল সত্তাতে ঐ অভিমানের যোগ হয়। বলা বাহুল্য, পুরুষ এখন পরমপুরুষ বা মহাপুরুষপদে অভিষিক্ত। প্রকৃতির কর্ম শেষ করিয়া তিনটি শবাসনের উপরে আসীন হইয়া যোগী বিশুদ্ধ সত্ত্বময় আধারে স্থিত হইয়াছেন। ঐ আধারটি তখন মহাকারণদেহরূপী জানিতে হইবে। এইটি যোগীর বিশুদ্ধ অভিমান বা আমিত্ব। এই আসনে আসীন হইয়াই যোগী বিশ্বকর্মের মহাক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হন।

তখন তাঁহার ব্যক্তিগত প্রয়োজন থাকে না—সমস্ত জীব জগতের প্রয়োজনই তখন তাঁহার প্রয়োজন। ভগবান্ ব্যাসদেব যোগসূত্রের ভাষ্যে ঈশ্বর সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"তস্য আত্মানুগ্রহাভাবেঽপি ভূতানুগ্রহ এব প্রয়োজনম্"। তাঁহার একমাত্র প্রয়োজন ভূতানুগ্রহ— জীবের কল্যাণ সাধন,—অন্য কোন প্রয়োজন তাঁহার নাই। যোগীও তখন বিশুদ্ধসত্ত্বময় আধারে স্থিত হইয়া ভূতানুগ্রহ বা জীবসেবাতে নিরত হন। ইহাই পরার্থ কর্ম।

গীতাতে ভগবান্ বলিয়াছেন—"উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম চেদহম্"—ইহা সেই জাতীয় কর্ম।

এইখানে একটি গভীর রহস্যের কথা বলা আবশ্যক। মনুষ্য জীবিত অবস্থায় যদি এই ভূমি পর্য্যন্ত উত্থিত হইতে পারে, অর্থাৎ তিন আসনের কর্ম সম্পন্ন করিতে পারে অথবা প্রকৃতির চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হইতে চৈতন্য সত্তাকে পৃথক্ করিয়া প্রকৃতিকে ও মায়াকে স্বায়ত্ত করিয়া বিশুদ্ধ অভিমান সহকারে মহামায়ার মুক্তক্ষেত্রে আধিকারিক পুরুষরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রভাব বিশ্বসংসার অনুভব করিয়া ধন্য হয়। তাহার প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত দেহ তখন এক হয়—উহাই মহাসিদ্ধদেহ নামে পরিচিত হয়।

প্রকৃতির বিজ্ঞানশালাতে এই বিরাট্ অনুষ্ঠানের আয়োজন চলিতেছে। বাহ্য জগৎ তাহার কোনও সন্ধান রাখে না, রাখিতে পারেও না।

আমরা যাহাকে মৃত্যু বলিয়া থাকি তাহা অনেক নীচের ব্যাপার। কিন্তু নীচের হইলেও তাহা অপরিহার্য্য। স্থূলদেহ হইতে মানবের সূক্ষ্ম সত্তা পৃথক্ হইলেই আমরা তাহাকে মৃত্যু বলিয়া বর্ণনা করি। কিন্তু যদি স্থূলের কর্ম অর্থাৎ স্থূল যোগ্য আত্মকর্ম সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে এই ঘটনা ঘটে তাহা হইলে জীবকে অবশিষ্ট আত্মকর্ম করিবার জন্য পুনরায় স্থূলদেহ গ্রহণ করিতে হয় বা জন্ম নিতে হয়। যতদিন আত্মকর্ম পূর্ণ না হইবে ততদিন এইরূপই চলিবে। কারণ স্থূল মানব দেহ ধারণ ব্যতীত আত্মকর্ম করার উপায় নাই। অজ্ঞানজ কর্মের ফলে যদি শুদ্ধ বা মলিন ভোগদেহের

প্রাপ্তি ঘটে তবে উহা কালক্ষেপ জানিতে হইবে। কারণ মানবদেহ হইতে একবার চ্যুত হওয়াও অত্যন্ত দুর্ভাগ্য—যে হেতু উহা ক্রম-বিকাশের পথে মহা অন্তরায়। মানবদেহে শুধু প্রারব্ধ ভোগ না হইয়া যদি অজ্ঞানবশে নবীন কর্ম উদ্ভূত হয় তাহা হইলেও উহা সঞ্চিত কর্মের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয় এবং উহা নিয়ত-বিপাক হইলে ও ভাবী প্রারব্ধের রচনাতে অঙ্গীভূত হইলে বিপচ্যমান হইয়া অনুরূপ সুখ-দুঃখরূপ ভোগ দানের জন্য ব্যাপৃত হয়। ইহা কর্ম-জগতের দৈনন্দিন ব্যাপার। ইহার আলোচনা এই স্থলে অপ্রাসঙ্গিক।

যদি স্থূলের আত্মকর্ম পূর্ণ হয়, কিন্তু তৎক্ষণেই প্রারব্ধ ভোগও পূর্ণ হয় বলিয়া মৃত্যু ঘটে এবং ঐ অবস্থাতে স্থূল দেহকে শবাসন করিবার অবসর না পাওয়া যায় তাহা হইলে খাঁটি সূক্ষ্ম শরীর রচিত হইয়াছে (স্থূলের আত্মকর্ম দ্বারা) বলিয়া মানুষ ভৌতিক সত্তার ঊর্দ্ধে কৈবল্য লাভ করে। তাহাকে আর ভৌতিক জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। কিন্তু তখন এই অসুবিধা থাকে যে আসন প্রাপ্তির অভাবে পরলোকে নিরালম্ব অবস্থা হয় বলিয়া নিষ্ক্রিয় ভাব থাকে—সূক্ষ্মদেহোপযোগী আত্মকর্মের সূত্রপাত হয় না। কৈবল্য হইলেও ইহা [illegible] কৈবল্য নহে, কারণ লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম দেহ বিদ্যমান থাকে—শুধু কর্ম করিতে পারে না মাত্র। সে স্থূল জগতে আসে না—তাই সে এক হিসাবে মৃত্যু-বর্জিত। কিন্তু তাহারও ভাবী মৃত্যু আছে। কারণ সূক্ষ্মদেহ যখন আছে তখন তাহার কর্মও কখন না কখন করিতেই হইবে এবং পরে তাহারও বর্জন হইবে (যদি দ্বিতীয় শবাসন করিতে না পারা যায়)। সূক্ষ্মদেহের মৃত্যুও মৃত্যু বটে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে স্থূলের আত্মকর্ম সমাপ্ত ও প্রারব্ধভোগ সমাপ্ত হওয়ার পর অভিমান সূক্ষ্মে যোজিত হইয়া স্থূলকে শবরূপী আসনে পরিণত করিতে পারিলে ঐ পূর্ব্বোক্ত নিরালম্ব অবস্থার নিষ্ক্রিয়ত্ব ঘটে না। কারণ তখন আসন লাভ হইয়াছে ও কর্ম আরব্ধ হইয়াছে। ইহারই জন্য অমল ভূমির দ্বার মুক্ত হয়—সেখানে কর্মের ক্রমোন্নতি ঘটে। তবে তাহা দীর্ঘকালের ব্যাপার। কারণ কালের প্রভাবের বাহিরে অমর জগতে কর্ম ক্ষিপ্র গতিতে অগ্রসর হয় না।

স্থূল শরীর সাধারণতঃ প্রারব্ধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রারব্ধ অতি জটিল তত্ত্ব—বারান্তরে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে অবসর নিবার ইচ্ছা আছে। কর্ম, অনুগ্রহ, সংস্কার (প্রাক্তন) প্রভৃতি বহু বিভিন্ন শক্তির একত্র সংঘটনে প্রারব্ধ রচিত হয় এবং ইচ্ছার উৎকটতা হইতে উহার সৃষ্টি হয়। তাই এক দৃষ্টিতে আয়ু নিয়ত বলিয়া অকাল মৃত্যু নাই—ইহা সত্য। আবার আয়ুর বৃদ্ধি-হ্রাস উভয়ই সম্ভবপর—ইহাও সত্য। এই বৃদ্ধি-হ্রাস শক্তির সংযমের বা অপচয়ের ফলে হইতে পারে—অথবা বাহির হইতে শক্তির অনুপ্রবেশাদি কারণ হইতেও হইতে পারে।

যে কোন কারণেই হউক এই দেহটি বজায় থাকিতে থাকিতেই যোগী নিজের সমস্ত আত্মকর্ম সমাপ্ত করিতে ইচ্ছা করেন। এই দেহে থাকিতেই যদি ভৌতিক দেহকে শব করিয়া নিজে সূক্ষ্ম শরীরে—তাহা আভাসময় ভাবদেহই হোক বা জ্ঞানদেহই হোক—অভিমান করিয়া সূক্ষ্মের আত্মকর্ম করা যায় তাহা হইলে এই দেহে থাকিয়াও অমল ভূমিতে অবস্থান করা যায়। তবে নিম্নস্তরে।

জ্ঞানগঞ্জের তত্ত্ব আলোচনা-প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে নিজের অনুভব ও বোধ অনুসারে অমল ভূমির রহস্যের সম্মুখীন হইতে চেষ্টা করিব। গুপ্ত রহস্যের উদ্‌ঘাটন ব্যক্ত জগতে অসম্ভব। তবে অধিকারিগণের কৃপা হইলে কাহারও কাহারও ভিতরে মহালোকের ক্রিয়াতে কিছু কিছু প্রকাশের খেলাও ঘটিতে পারে।

লৌকিক-অলৌকিক

শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব, ডি, এস-সি

(১)

বর্ত্তমান বৎসর (সন ১৩৬০) এক হিসাবে খুব সুবৎসর। আমার গণনা অনুসারে এই বৎসরেই শ্রীশ্রীবাবার এক শত বর্ষ পূর্ণ হইল। আমার মতে তাঁহার জন্ম সন ১২৬০, ২৯শে ফাল্গুন। এই বৎসরটি তাঁহার জন্ম বৎসর ধরিলে অনেক কিছুই বেশ ভাল ভাবে মিলিয়া যায়। শ্রীযুক্ত অক্ষয় দাদা তাঁহার বহিতে যে জন্ম বৎসর নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন—অর্থাৎ ১২৬২ সাল—তাহা একাধিক কারণে ঠিক বলিয়া মনে হয় না। শ্রীশ্রীবাবার জন্ম বৎসর কি তাহা নির্দ্ধারণ করা খুব কঠিন নয়। ঐ বৎসর কয়েক মাস পূর্বে তাঁহার পিতৃদেব পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কাজে কাজেই একটু চেষ্টা করিলে ঐ বৎসরটির সঠিক উদ্ধার হইতে পারিবে।

আর একটি তারিখ সম্বন্ধে এইখানে একটু আলোচনা করিতেছি। তাহা হইল গুষ্করায় তাঁহার আগমনের সময়। পরলোকগত যজ্ঞেশ্বর চোঙ্গদার মহাশয়ের সহিত এ সম্বন্ধে আমার কিছু আলোচনা হইয়াছিল। ইহার ঐতিহাসিক মূল্য আছে বলিয়া এই আলোচনাটির সারাংশ এখানে দিতেছি। শ্রীশ্রীবাবা যেদিন প্রথমে গুষ্করায় আসেন—সর্ব্ব প্রথমে তাঁহার দেখা হয় যজ্ঞেশ্বর চোঙ্গদার মহাশয়ের সঙ্গে। ষ্টেশন হইতে নামিয়া তিনি

চোঙ্গদারদের বাটীতে যাইতেছিলেন। পথে একটি শিশু বালককে দেখিয়া ঐ বাটী কোন্ দিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এই শিশুটিই হইলেন যজ্ঞেশ্বর চোঙ্গদার। যজ্ঞেশ্বর তাঁহাকে পথ দেখাইয়া তাঁহাদের বাড়ীতে লইয়া যান। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—তখন আপনার বয়স কত ছিল। তিনি উত্তর করিয়াছিলেন—দশ বৎসর। যজ্ঞেশ্বর চোঙ্গদারের জন্ম হইয়াছিল ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে (এইটি অসমর্থিত)। কাজে কাজেই ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীবাবা গুষ্করায় আগমন করিয়াছিলেন। যজ্ঞেশ্বর চোঙ্গদারের নিকট অনেকগুলি কথার মধ্যে এই একটি কথা শুনিয়াছিলাম যে শ্রীশ্রীবাবার বিবাহ হইয়াছিল তাঁহার গুষ্করা থাকা কালে। যজ্ঞেশ্বর চোঙ্গদার মহাশয় নাকি বরযাত্রী হইয়া সঙ্গে গিয়াছিলেন।

গুষ্করায় আসিবার বোধ হয় বছর দুই আগে শ্রীশ্রীবাবা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তখন তাঁহার বয়স বোধ হয় ৩৫ বছর ছিল। এইটি শ্রীযুক্ত অক্ষয় দাদা মোটামুটি ঠিক ধরিয়াছেন। গুষ্করায় শ্রীশ্রীবাবা বিশ বছর বাস করিয়াছিলেন। ১৯১১ সালে যদি গুষ্করা ত্যাগ করিয়া থাকেন তবে তাঁহার গুষ্করার আগমন ১৮৯০ সালেই হওয়া উচিত।

এই বৎসর তাই এক হিসাবে আমাদের পক্ষে খুব সুবৎসর। শ্রীশ্রীবাবা এই মর্ত্ত্যধামে আসিবার পর এই বৎসর এক শতাব্দী পূর্ণ হইল। এই বৎসর একটি ভাল করিয়া উৎসব করিলে খুব ভাল হইত। আমরা উৎসব না করিলেও উৎসব যে হইবে না তাহা নহে—খুব ভাল করিয়াই হইবে। কোন কোন ভাগ্যবান্ তাহা দেখিবার সৌভাগ্যও লাভ করিবেন বলিয়া মনে করি।

(২)

শ্রীশ্রীবাবার জীবনটি ছিল লৌকিক ও অলৌকিক ব্যাপারে পরিপূর্ণ। অতি শিশু অবস্থা হইতেই অলৌকিক ব্যাপার তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া ঘটিতে দেখা গিয়াছে। কোনও কোনও ঘটনা এত অদ্ভুত রকম অলৌকিক যে আশ্চর্য্য হইতে হয়—অবিশ্বাস হয় যে তাহা কিভাবে সম্ভব হইতে পারে। তাঁহাকে নূতন কাপড় দেওয়া হইল। তিনি শিশু-সুলভ চাপল্য বশতঃ তাহাকে ফালি ফালি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। তাহার পর যখন তাড়িত হইলেন তখন সে বস্ত্রখণ্ডগুলিকে একমুঠা করিয়া ধরিয়া ছাড়িয়া দিলেন। দেখা গেল যে কাপড়টা যেমন আস্ত ছিল তেমনিই আবার আস্ত হইয়া গিয়াছে। এইরূপ ঘটনা তাঁহার শিশু অবস্থা হইতেই সংঘটিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা যেন তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক অবস্থার মত ছিল। ইহার জন্য তাঁহাকে কিছুমাত্র আয়াস স্বীকার করিতে হইত না। সাধনা করিয়া ইহাকে লাভ করিবার চেষ্টা তাঁহাকে করিতে হয় নাই। বরং হয়ত পরবর্ত্তিকালে চেষ্টা করিয়া ইহার প্রকাশ নিরুদ্ধ করিতেই হইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়—তাঁহার প্রতি কাজেই অলৌকিক এত বেশী পরিমাণ আবির্ভূত হইত যে তাহাকে ঠেকাইয়া রাখা দায় হইত। খুব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যদি বোকার মত আচরণ করিতে চেষ্টা করে তবে সেই বোকামীও ঠিক বোকামী হয় না—অতিরিক্ত বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় দেয়। ইহাও যেন কতকটা সেইরূপ। লৌকিক ও অলৌকিকে এইরূপ সংমিশ্রণ অন্য কাহারও জীবনে এত সহজভাবে মিশিয়া যাইতে বড় একটা দেখা যায় না।

(৩)

এই লৌকিক ও অলৌকিক এর ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত জীবনটির মধ্যে যে কয়েকটি প্রধান পরিবর্ত্তন দেখা যায় তা আপাতদৃষ্টিতে একটি অতিশয় অশুভ লৌকিক ঘটনা অবলম্বন করিয়াই ঘটিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই জীবনটির মধ্যে সত্যকারের conscious আধ্যাত্মিক চেতনার আরম্ভ হয় এক ক্ষিপ্ত কুকুরের দংশনের ভিতর দিয়া। যে সালে তিনি দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করেন ক্ষেপা কুকুর তাঁহাকে সেই বৎসরই দংশন করে। ১২৭১ সালে রচিত—গীত-রত্নাবলীতে সংগৃহীত—প্রথম গানটিতে এই আধ্যাত্মিক সূচনার ইঙ্গিত স্পষ্ট রহিয়াছে। এই গানগুলি কুকুরে কামড়াইবার পর রচিত হইয়াছিল বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। পূজ্যপাদ নীমানন্দ পরমহংস তাঁহাকে আরোগ্য করিবার অছিলায় একটি মন্ত্র দিয়া যান। তাহা এই কুকুরে কামড়াইবার দুর্ঘটনাকে অবলম্বন করিয়াই হইয়াছিল। বার বৎসর বয়সে এইভাবে আধ্যাত্মিক জীবনের বাহ্যিক সূত্রপাত হইয়া তীর্থস্বামিত্ব লাভ করেন সম্ভবতঃ ৩৮ বৎসর বয়সে—তাহার ২৫।২৬ বৎসর পরে। তখন তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন। দারপরিগ্রহের পরীক্ষায় সফল হইয়াছেন। সন্ন্যাসীর জীবনের বড় ট্রাজেডী সংসারকে স্বীকার করা—তাঁহাকে তাহা করান হইয়াছে। বিবাহের পরই আবার তাঁহাকে একটি জাতসাপ দংশন করে। (পরে ইহা বিস্তারিতভাবে বলিতেছি।) অন্য কেহ হইলে পরিত্রাণ লাভ সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। কিন্তু তখনও তিনি পরমহংস হন নাই। তিনি পরমহংস পদ প্রাপ্ত হন ১৯১০

সালে অর্থাৎ তাঁহার ৫৬ বৎসর বয়সে ও পরমপূজ্যপাদ মহাতপা মহারাজের তাঁহাকে দীক্ষাদানের প্রায় ৪২ বৎসর পরে। এই সময় তাঁহার ২০ বৎসরের কর্ম্মস্থল গুস্করা তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু এখনও অধ্যাত্ম-জীবনের সাধনার কিছু বাকী ছিল। ১৯১৪ সালে * পূজ্যপাদ অভয়ানন্দ তাঁহাকে চিঠিতে জানাইয়াছিলেন যে তখনও আরও চারি বৎসর রহিয়াছে তাঁহার ক্রিয়া পূর্ণ হইতে। ১৯১৯ সালে দেখিতে পাই তাঁহার লৌকিক জীবনের কি প্রচণ্ড তুর্বৎসর ! ঐ বৎসর তাঁহার মাতাঠাকুরাণীর দেহান্ত হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সংসারে যেন মড়ক আসিয়া লাগে। ইচ্ছা করিলেই ইহার প্রতিকার করা তাঁহার করায়ত্ত ছিল। কিন্তু প্রতিকার করার প্রয়োজন তাঁহার ছিল না। যাহা ঘটিবার ঘটিল। তাঁহাকে বলা হইয়াছিল প্রতিকারের বিষয়, কিন্তু তাহা তিনি কানেও স্থান দিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। শেষ সমাপ্তির পরীক্ষায় তাঁহার অটল দৃঢ়তা অতিশয় লৌকিকভাবে হইলেও সেইরূপই অলৌকিকত্বের সূচনা করে। তাঁহার দীক্ষাপ্রাপ্তির ৫১ বৎসরে তাঁহার "ক্রিয়ার" সমাপ্তি হইল। শ্রীশ্রীবাবার জীবনে তাই ১২ বৎসর, ৩৮ বৎসর, ৪২ বৎসর ও ৫১ বৎসর লৌকিক দৃষ্টিতে যেমন অশুভ, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে তেমনই শুভ।

* শ্রীমৎ অভয়ানন্দ পরমহংস দেবের মূল পত্রখানা আমার নিকট আছে। ইহাতে কোন সন তারিখের উল্লেখ নাই। সুতরাং ইহা যে ১৯১৪ সালে লিখিত তাহা বলা চলে না। আমার মতে এই পত্রখানা ১৯০৬ সালে লিখিত। যে ৪ বৎসরের কথা উহাতে বলা হইয়াছে তাহা শ্রীগুরুদেবের পরমহংসপদপ্রাপ্তি লক্ষ্য করিয়া মনে হয়। —সম্পাদক

তাঁহার জন্ম-কুণ্ডলী আমি দেখি নাই। ছিল বলিয়া জানি, কারণ বাল্যকালেই তাঁহার জন্ম-কুণ্ডলী বিচারে জানা গিয়াছিল যে তাহাতে তাঁহার পরমায়ু মাত্র ২২ বৎসর রহিয়াছে। এই কুণ্ডলীতে এই বৎসর গুলির সময় কোন্ কোন্ গ্রহের অশুভ প্রভাব ছিল তাহার বিচার করা একটি ভাল অবসর-বিনোদনের ব্যাপার হইবে সন্দেহ নাই।

এইখানে আমাদের জন্য অনেকগুলি ভাবিবার বিষয় রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। শ্রীশ্রীবাবার জীবনটি আমাদের কি পরিমাণে শিক্ষণীয় বিষয় তাহা আমরা অল্পই অনুধাবন করি। জ্ঞানগঞ্জের পরমহংসগণের চিঠিতে তাঁহার অতিশয় উগ্র সাধনার কথা বার বার উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই উগ্র সাধনা করিয়াও ৫০ বৎসরেরও অধিক লাগিয়াছিল তাঁহার "ক্রিয়ার" সমাপ্তিতে। তাহা ছাড়া কোথাও তাঁহাকে উতলা হইতে দেখা যায় নাই। বরং সব সময়েই তিনি অত্যন্ত নির্ভরতার ভাব লইয়া, যেন আত্ম-সমাহিত হইয়াই, থাকিতেন। শ্রীশ্রীবাবা যখনই কাহাকেও কোনও চিঠি দিতেন একটি কথা সেখানে প্রায়ই থাকিত—"কোনও বিষয়ে কিছু চিন্তা করিবে না। যে ক্রিয়া দিয়াছি সাধ্য মত তাহা করিতে চেষ্টা করিবে। সময়ে আপনিই সব ঠিক হইয়া যাইবে।" এই উপদেশটি তিনি তাঁহার নিজ জীবনে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়াই এমন অক্লান্তভাবে বিতরণ করিতেন বলিয়া মনে করি।

(৪)

শ্রীশ্রীবাবার বয়স তখন ছয়, সাত কি আট বৎসর হইবে। জ্ঞানগঞ্জের ও মনোহর তীর্থের পরমহংসগণের দৃষ্টি তখনই তাঁহার

উপর পতিত হইয়াছিল। তাঁহাকে "অপহরণ" করিবার ফন্দি বোধ হয় তখন হইতেই তাঁহারা আটিতেছিলেন। পরমপূজ্যপাদ জ্যাঠাগুরুদেব শ্রীমৎ অভয়ানন্দজী বণ্ডুলের শ্মশান-ভূমিতে আসিয়া আসন লইয়া বসিলেন। ভাবটি কিন্তু ধরিলেন অতিশয় উগ্র। যে কেহ নিকটে যাইত তাহার প্রতি ক্ষেপিয়া হুলস্থূল বাধাইতেন। তাঁহার ক্ষিপ্ত ভাব নিকটস্থ শিশু ও বালকদের কৌতূহলের কারণ হইল, কিন্তু ক্ষেপা সন্ন্যাসীটি যেন বালকদের প্রতি আরও বেশী উগ্রভাব ধারণ করিলেন। তাই কাহারও তাঁহার কাছে ঘেসিবার সাহস হইল না।

প্রায় দুই মাইল দূরে বণ্ডুলে বালক মহলে রটিয়া গেল যে শ্মশানে একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছে—সে অতিশয় ভীষণ আর তাহার কাছে কেহ যাইতে সাহস পায় না, সে মারিতে দৌড়ায় ও ভীষণ গালাগালি দেয়। ইহা শুনিয়াই বালকদলের একটি বলিয়া উঠিল "আমি যাইব।" সঙ্গীদল তাহাকে বার বার নিষেধ করিল, কিন্তু এই বালকটি তাহার সঙ্কল্প ছাড়িতে রাজী হইল না। তবে বলিল যে তাদের মধ্যে কেউ যদি সাহস ক'রে তার সঙ্গে যাইতে পারে ত যাবে। শেষ পর্য্যন্ত দুইজন অপর বালকও এই বালকটির সঙ্গে যাইতে রাজী হইল। ঠিক হইল যে দুই তিন দিন পরে তাহারা যাইবে এবং রাত্রিকালে যাইবে।

যাওয়া স্থির করিয়া বালকটি এক আনা খরচ করিয়া একটি বড় কাঁঠাল সংগ্রহ করিল। শ্রীশ্রীবাবা গল্প করিতে করিতে কাঁঠালটিরও বর্ণনা দিয়াছেন। সেটি ছিল একটি খুব বড় কাঁঠাল এবং সুপক্ক। একজন লোকের পক্ষে সেটিকে তুলিতে পারা শক্ত

ছিল। শ্রীশ্রীবাবা অত অল্প বয়সেও অতিশয় শক্তিশালী ছিলেন এবং এই অর্দ্ধমন ওজনের কাঁঠাল অবলীলাক্রমে বহন করিবার সামর্থ্য রাখিতেন। এই কাঁঠালটি কিনিয়া তিনি তাঁহাদের গোয়াল ঘরের চালায় সন্তর্পণে লুকাইয়া রাখিলেন। পাকা কাঁঠালের সময় ছিল বলিয়া সে সময়টা বোধ হয় গ্রীষ্মকাল ছিল বলিয়াই মনে হয়। যাহা হউক, যাওয়ার সব ব্যবস্থা করিয়া সঙ্গী দুইটির সঙ্গে যাওয়ার সময় ঠিক করিয়া শ্মশানে সন্ন্যাসী দর্শনের জন্য সময়ের বা রাত্রির প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সে দিন আবার শ্রীশ্রীবাবার মাতাঠাকুরাণী যেন ঘুমাইতেই চাহেন না। শ্রীশ্রীবাবা বিছানায় শয়ান—চক্ষে ঘুম নাই। মাতা-ঠাকুরাণী নানান্ কাজে বিছানায় শুইতে আসিতেছেন না। বাবা মাঝে মাঝে ডাকিতেছেন—"মা এস—না এলে আমি ঘুমাইব না।" মা আর যেন আসেন না। অবশেষে যখন মা আসিলেন—তিনি ঘুমাইতেও যেন চান না। শ্রীশ্রীবাবার পরিচর্য্যা করিতেই সময় কাটিতেছে। এদিকে শ্রীশ্রীবাবা মনে করিতেছেন—কতক্ষণে মা শুইবেন ও ঘুমে জড়াইয়া পড়িবেন। যাহা হউক, শেষ পর্য্যন্ত মা'ত ঘুমাইয়া পড়িলেন। আর তাঁহার দুর্দ্দান্ত সন্তানটি সন্তর্পণে উঠিয়া গোয়াল ঘরের দিকে চলিলেন। অন্ধকারেই চালা হইতে প্রকাণ্ড কাঁঠালটি নামাইলেন ও সঙ্গী দুইটির জন্য পথে গিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু তাহাদের কেহই আর আসিল না। তখন শ্রীশ্রীবাবা একাকীই রওয়ানা হইলেন।

প্রায় দুই মাইল গ্রাম্য বন্ধুর পথ একাকী পদব্রজে অতিক্রান্ত করিবার পর বণ্ডুলের শ্মশানভূমি দৃষ্টিগোচর হইল। আর দৃষ্টি-

গোচর হইল একটি জ্বলন্ত আগুনের পিণ্ড। তিনি দূর হইতে লক্ষ্য করিলেন যে একটি গাছের নীচে যেন একটা প্রকাণ্ড আগুন জ্বলিতেছে। যে বালক গভীর রাত্রিকালে এইভাবে শ্মশানে একাকী আসিতে সাহস পায় এই আগুন দেখিয়া তাহার কি ভয় হইবে? সাধারণতঃ একলক্ষ বালকের মধ্যে একটিও হয় ত এইভাবে শ্মশানে আসিতে গেলে রাস্তার মধ্যেই ভয় পাইয়া না পলাইয়া থাকিতে পারিবে না। তিনি আরও নিকটবর্ত্তী হইতে গেলে দেখিলেন যে সে আগুনটি প্রকৃত আগুন নহে, একটি মানুষের গা হইতে তাহা বাহির হইতেছে। ইহা দেখিয়াই তিনি স্থির করিলেন যে ইনিই বোধ করি সেই সন্ন্যাসী হইবেন। তিনি আরও আগাইয়া গেলেন।

এদিকে সন্ন্যাসীটি এই ছেলেটিকে আসিতে দেখিয়া নিজ রুদ্র মূর্ত্তি ধরিলেন। উচ্চ স্বর ও বড় বড় দুইটি পাথর লইয়া তাঁহার দিকে তাড়া করিয়া আসিলেন। শ্রীশ্রীবাবা তখন তাড়াতাড়ি কাঁঠালটি মাটিতে রাখিয়া একটি বড় বাঁশ এদিক্ ওদিক্ হইতে সংগ্রহ করিয়া মনে মনে ভাবিলেন যে এ যদি আমাকে মারিতে আসে তবে এই বাঁশ দিয়া তাহা আমি নিরুদ্ধ করিব। উচ্চৈঃস্বরে সন্ন্যাসীটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তুমি কেন এইরূপ খারাপ ব্যবহার করিতেছ?" সন্ন্যাসীটি ছেলেটির এইরূপ বাঁশ লইয়া রুখিয়া উঠিতে দেখিয়া যেন একটু শান্ত ভাব লইল এবং বাবাকে বাঁশটি ফেলিয়া দিতে বলিল। শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন—"তা' হলে তুমি তোমার হাতের পাথরগুলি ফেলিয়া দাও।" সন্ন্যাসীটি বাবার কথা শুনিল, ও বলিল, "তবে

তুমিও বাঁশটি ফেল।" এই বলিয়া সে পাথরটি দূরে নিক্ষেপ করিল। বাবাও বাঁশটি ফেলিয়া দিলেন, কিন্তু দূরে ফেলিলেন না, নিকটেই রাখিলেন—কি জানি বাপু যদি ও আবার তেড়ে আসে। তিনি মনে মনে বিচার করিলেন যে সন্ন্যাসীটি বোকার মত কাজ করিল। যাহা হউক, এইরূপ সন্ধি স্থাপিত হইবার পর তিনি তাঁহার আনীত কাঁঠালটি উপহার দিতে চাহিলে সন্ন্যাসীটি তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রহণ করিল এবং সেইখানে বসিয়াই সেই প্রকাণ্ড কাঁঠালটি দুই হাত দিয়া চিরিয়া অল্পক্ষণের মধ্যে সবটা খাইয়া ফেলিল।

খাওয়া শেষ হইলে শ্রীশ্রীবাবা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ছেলেদের প্রতি তিনি এত খারাপ আচরণ করেন কেন। উত্তরে সন্ন্যাসীটি বলিলেন যে ছেলেগুলি অতিশয় বদ। তবে তিনি ইহাদের মত নহেন, তাই শুধু তাঁহাকেই নিকটে আসিতে দিয়াছেন। সন্ন্যাসী তখন অনেক শান্ত মূর্ত্তি লইয়াছেন এবং শ্রীশ্রীবাবার সঙ্গে অনেক রকম ছেলেমানুষী বাক্যালাপও করিলেন। শ্রীশ্রীবাবা তাঁহার কথাবার্ত্তা ও কার্য্যকলাপ দেখিয়া তাঁহার সঙ্গে যাইতে চাহিলেন, কিন্তু তিনি বাবাকে নিতে রাজী হন নাই। বলিয়াছিলেন, "পরে আবার দেখা হইবে।" ইতিমধ্যে ঘুমন্ত মা জাগিয়া উঠিয়া শয্যায় ছেলেকে না দেখিতে পাইলে কি রকম হুলুস্থূলু বাধাইবেন মনে হওয়াতে শ্রীশ্রীবাবা ফিরিতে চাহিলেন—তখন দেখিলেন যে রাত্রি প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে। প্রায় রাত্রি তিনটায় তিনি তাঁহার পরবর্ত্তিকালের গুরুভ্রাতা স্বামী অভয়ানন্দজীর নিকট বিদায় লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

গৃহে ফিরিয়া অত্যন্ত স্বস্তির সহিত দেখিলেন যে তাঁহার মা তখনও তেমনই অঘোরে ঘুমাইতেছেন। তাঁহার রাত্রিকালের দুর্দ্দান্ত অভিযানের কোনও খবরই তাঁহার নাই।

চৌদ্দ বছর বয়সে জ্ঞানগঞ্জে যখন তিনি যান তখন এই সন্ন্যাসীটিকে সেখানে সন্ন্যাসী-সংঘট্টের মধ্যে দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছিলেন। "আর সেও আমাকে দেখিয়া সেই শ্মশানের রাত্রির ঝগড়া ও মারামারির কথা মনে করিয়া বোধ হয় হাসিতেছিল।"

(৫)

এইরূপ একটা প্রসিদ্ধি আছে যে ঠিকুজীর হিসাবে শ্রীশ্রীবাবার আয়ু ২২ বৎসর পর্য্যন্ত ছিল। তাঁহার ১২ বৎসর বয়সে যে একটা বড় ফাঁড়া ছিল তা দেখিতে পাই। সেই সময়ে তাঁহাকে ক্ষিপ্ত কুকুরে কামড়াইয়া ছিল। প্রায় ৯০ বৎসর পূর্ব্বে ফরাসী বৈজ্ঞানিক লুই পাস্তর ক্ষেপা কুকুর বা শৃগাল কামড়াইলে তাহার চিকিৎসার সূত্রটি আবিষ্কার করেন নাই। সে সময় গোঁদলপাড়াই (চন্দননগর) ছিল এইরূপ চিকিৎসার কেন্দ্র। কিন্তু ক্ষেপা শৃগাল বা কুকুরে কামড়াইলে তখন অতি সামান্য শতকরাই পরিত্রাণ পাইত—নির্ঘাৎ তাহাদের জলাতঙ্কের লক্ষণ প্রকাশ পাইত। শ্রীশ্রীবাবার সম্ভবতঃ জলাতঙ্কের লক্ষণ কখনও হয় নাই। তবে দংশন অতি তীব্র ছিল এবং তাহাতে যথেষ্ট কষ্টও পাইয়াছেন সন্দেহ নাই। ঠিক ইহারই পরবর্ত্তী কালে লিখিত তাঁহার গান-গুলিতে তাঁহার এই সময়ের জীবনের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। আত্মীয়-স্বজন সকলেই প্রতিমুহূর্ত্তে ভয় করিতেছিল যে কখন তাঁহার জলাতঙ্ক রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়—কিন্তু

শ্রীশ্রীবাবা তাহার জবাবে লিখিয়াছেন—"ভোলানাথ বলে—কচু হবে। বাঁচব শ্যামা মায়ের জোরে।" ঠিকুজীর ২২ বৎসরে বোধ হয় কোনও ঘটনা ঘটে নাই—ঘটিয়া থাকিলে তাহা অবশ্য প্রকাশ থাকিত।

২২ বৎসরে না ঘটিলেও তাঁহার ৩৮ বৎসর বয়সে তাঁহাকে আবার এক অতি ভয়াবহ দংশনের কবলে পড়িতে হইয়াছিল। এ গল্পটি শুনিয়াছি। শ্রীশ্রীবাবার বিবাহ হয় ফাল্গুন মাসে। বৈশাখ মাসে তিনি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে আনিতে মন্তেশ্বরে তাঁহার শ্বশুর আলয়ে যান। তাঁহার বিবাহের সময়ই তাঁহার অলৌকিক শক্তির কথা বেশ ছড়াইয়াছিল এবং বিবাহের বাসরে তিনি কিছু কিছু শক্তির ক্রীড়া প্রকাশ করিয়া তাঁহার নূতন আত্মীয়দের ও এই বিচিত্র উৎসবটির গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। পুরাকালের শিবের বিবাহের একটি নূতন সংস্করণ যে হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সম্বন্ধে কাহারও মনে কোনও স্মৃতি থাকিলে তাহা গল্পাকারে প্রকাশ করিলে অনেকের আনন্দের বিষয় হইবে।

এইবার বর্ণনীয় বিষয়টির অবতারণা করি। গল্পটি ক্ষুদ্র, কিন্তু ক্ষুদ্র হইলেও ঘটনা হিসাবে ইহার মূল্য রহিয়াছে। বোধ হয় ৩৮ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। এই ঘটনাটিও তাহা হইলে তাঁহার ৩৮ বৎসর বয়সেই ঘটিয়াছিল ধরিয়া লইতে হয়। মন্তেশ্বরে শ্বশুরালয়ে গিয়াও তাঁহার নিত্য-স্নান বাদ যাইত না। প্রতিদিন অপরাহ্ণে তিনি তাঁহার এক সম্পর্কিত শ্যালককে লইয়া নিকটস্থ এক পুষ্করিণীতে স্নানে যাইতেন। পুষ্করিণীটিতে ঝাঁঝি ও পানায় ভর্ত্তি ছিল। একদিন স্নানে নামিয়াই জলে থাকা কালীন

শ্রীশ্রীবাবা বুকে দংশনের যন্ত্রণা অনুভব করিলেন। দংশনের সঙ্গে সঙ্গে কি বস্তুতে তাঁহাকে কামড়াইল তাহাও বুঝিতে পারিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে জল হইতে উঠিয়া আসিলেন। তখন তাঁহার বুকের ক্ষত স্থান হইতে রক্ত পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। তাঁহাকে এই ভাবে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিতে দেখিয়া তাঁহার শ্যালকও উঠিয়া আসিলেন ও ব্যাপার দেখিয়া ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন।

শ্রীশ্রীবাবা তাঁহাকে বলিলেন যে তাঁহাকে জাত সাপে কামড়াইয়াছে। কিন্তু এ কথা বাহিরে যেন প্রকাশ না করা হয়। তিনি তাঁহার শ্যালককে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ওখানে নিকটে কোনও প্রতিষ্ঠিত শিব-মন্দির আছে কিনা। তাঁহার শ্যালক তাঁহাকে বলিলেন যে প্রতিষ্ঠিত শিব-মন্দির পুষ্করিণীটির অতি নিকটেই আছে এবং সেখানে নিত্য পূজাও হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীবাবা তাড়াতাড়ি মন্দিরটির দিকে চলিলেন ও মন্দির সমীপে পৌঁছিয়াই তাঁহার শ্যালককে বলিলেন, "আমি এই মন্দিরে ক্রিয়া করিতে ঢুকিলাম। এর দরজা যেন আমার বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত কেহ খুলিতে চেষ্টা না করে।" এই বলিয়া তিনি ভিতরে যাইয়া মন্দিরের অর্গল বন্ধ করিয়া দিলেন। তাঁহার শ্যালকটি অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু বাবার যোগক্রিয়ার প্রসিদ্ধিও জানিতেন। শ্বশুরবাড়ীর সকলেই তাঁহার বিবাহের রাত্রেই তাঁহার অলৌকিক যোগ-বিভূতির পরিচয় পাইয়াছিলেন। এই সব কারণে তিনি শ্রীশ্রীবাবা তাঁহাকে যেরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন সেইরূপ করিতেই মনঃস্থ করিলেন। বাড়ী আসিয়া তিনি প্রচার করিলেন যে তাঁহাদের শিবতুল্য জামাতা বাবাজী স্নান

করিতে করিতে হঠাৎ উঠিয়া শিব-মন্দিরে ঢুকিয়া পড়িয়াছেন এবং সেখানে যোগ-সাধনা করিতেছেন। তিনি যতক্ষণ না বাহির হন তাঁহাকে যেন বিরক্ত করা না হয়। শ্বশুর বাড়ীতে এ কথা খুব আশ্চর্য্য বোধ হইল না—কারণ তাঁহাদের জামাতা যে ঠিক সাধারণ জামাতা নহেন এ উপলব্ধি তাঁহাদের ছিল।

শ্রীশ্রীবাবা সেই মন্দির মধ্যে বোধ হয় সারারাত্রি ছিলেন এবং সকালে দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার চক্ষু-যুগল তখন ঘোর রক্তবর্ণ, সমস্ত শরীর অন্যূন ১৪ ঘণ্টার যোগক্রিয়ার ফলে অসাধারণ রূপে অভিষিক্ত। বিষের চিহ্নমাত্র আর তখন তাঁহার শরীরে ছিল না, তবে ক্ষত স্থান ঠিকই ছিল। এই ক্ষতটি, অর্থাৎ দুইটি দাঁত ফুটাইবার চিহ্ন, তাঁহার শরীরের অঙ্গরূপে শোভা পাইত, যেমন শোভা পাইত শ্রীকৃষ্ণের বুকে ভৃগু-পদ-চিহ্ন।

(৬)

এই কাহিনীটির পরিশিষ্টরূপে একটি কথা মনে হইতেছে। শ্রীশ্রীবাবার বিবাহ-বাসরে তাঁহার অলৌকিক বিভূতির কিছু প্রকাশ দেখান তাঁহার শ্বশুরবাড়ীর লোকদের তাঁহার সম্বন্ধে বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য হইয়াছিল! তাঁহার যে শ্যালকটি তাঁহার সঙ্গী হইয়া তাঁহার সর্পদংশনের সাথী হইয়াছিলেন তাঁহার অন্তরে শ্রীশ্রীবাবা সম্বন্ধে কোনও রূপ দৃঢ় বিশ্বাস উৎপন্ন না থাকিলে কখনই এরূপভাবে তাঁহাকে একাকী মন্দিরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিতে দেওয়া সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে অথচ দরজা খুলিতেছে না—

ইহাতে সাধারণ মানুষ তাহার মানুষী বুদ্ধিতে ইহাই স্থির করিত যে মন্দিরের ভিতরে যিনি প্রবেশ করিয়াছেন সর্পের বিষে তাঁহার আর উঠিবার ক্ষমতা নাই এবং এইজন্যই দরজা খুলিতেছে না। সমস্ত ঘটনাটি পার্থিব জগতের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া বিচার করিলে শ্রীশ্রীবাবার এই শ্যালকটি অলৌকিকভাবেই তাঁহার বিশ্বাসকে বজায় রাখিয়াছিলেন, ইহাই বলিতে হয়। শ্রীশ্রীবাবার বিভূতিগুলি জগতের এইরূপ মহান্ উপকারের জন্যই প্রকাশ পাইত, এই কথা স্বতঃই মনে আসে। আমরা রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ নহি। কর্ম্মসূত্র অতি জটিল ব্যাপার। তাহা হইতে আরও জটিল ব্যাপার মহাপুরুষদের কর্ম্মাচরণ। তবু এই কথা কেবলই মনের মধ্যে আসিয়া পড়ে যে মহাপুরুষদের জীবনে বিভূতির খেলা জগৎকেই বিভূতিসম্পন্ন করিয়া তুলে, জগতের জড়ত্ব ঘুচায় মানুষকে মানুষীবুদ্ধি হইতে পরিত্রাণ করে।

(৭)

শ্রীশ্রীবাবা এই মানুষী বুদ্ধির কবলে কদাচিৎ পড়িয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। তাঁহার সমস্ত জীবনের ঘটনাগুলি তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিয়াও তাঁহাকে কোথাও এই মানুষীবুদ্ধির কবলিত হইতে দেখি নাই। ভয়, লোভ, সংশয়, অধৈর্য্য ইত্যাদি কখনও তাঁহাকে কর্ত্তব্য হইতে চ্যুত করিতে সমর্থ হইয়াছে এমন ঘটনা তাঁহার জীবনে ঘটে নাই। শুধু তাহাই নহে, মানুষের স্বাভাবিক বিচারশক্তি নিয়ন্ত্রিত হয় তাহার নিজ স্বভাবের দ্বারা। বাবার এই স্বাভাবিক বিচার শক্তি এত অন্তর্মুখীন ছিল যে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ১২।১৩ বৎসরে রচিত তাঁহার গানগুলি—গীত-রত্নাবলীতে

সংগৃহীত—তাহার সাক্ষ্য দেয়। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত পাইয়াছি যেখানে দেখা যায় রেশমাত্র মানুষীবুদ্ধি তাঁহার বিচার বুদ্ধি ও আচরণকে স্পর্শ করিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। আমাদের মত জড়, পরিপূর্ণ বহির্মুখ ও স্থূল সত্তার সঙ্গ করিবার জন্য আমাদের মত মানুষের আচরণের আভাস একটু দেখাইয়াছিল, ইহাও হয়ত বলা যায়। ঘটনাটি আমার কাছে তাই খুব মধুর লাগে।

শ্রীশ্রীবাবাকে যখন আমাদের পূজ্যপাদ পরমগুরুদেবের নির্দ্দেশে সংসারে ফিরিতে হইল তখন তাঁহাকে জ্যাঠাগুরুদেব অনেক কথাই বলিয়া দিয়াছিলেন। এমন কি কোথায় তাঁহার বিবাহ হইবে, সেখানকার নাম ধাম ইত্যাদি সবই জানাইয়াছিলেন। আমাদের মাতাঠাকুরাণীরও পরিচয় শ্রীশ্রীবাবা অনেক পূর্ব্বেই জানিতেন। বিবাহ-সম্বন্ধ যখন স্থির হইল তখন শ্রীশ্রীজ্যাঠাগুরু-দেবের কথাগুলি এইভাবে মিলিয়া যাইতে দেখিয়া তাঁহার মনে নিশ্চয়ই আনন্দ হইয়াছিল। অবশ্য ইহা আমার অনুমান মাত্র, কারণ আমাদের মানুষীবুদ্ধি পরিপূর্ণ জীবনে এইভাবে কিছু মিলিয়া গেলে আমাদের খুবই ভাল লাগে। যাহা হউক, বিবাহের পর দ্বিরাগমন। বৈশাখ মাসে দ্বিরাগমন করিয়া আমাদের শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে লইয়া শ্রীশ্রীবাবা বগুলে আসিলেন। কিন্তু গৃহে ফিরিয়া তাঁহার সংসারের নির্লিপ্ততা পূর্ব্ববৎ অটুটই রহিল।

আমাদের ঠাকুরমাতা ঠাকুরাণী অর্থাৎ শ্রীশ্রীবাবার মাতাঠাকুরাণী তাঁহার শিবতুল্য পুত্রের আচরণে ব্যথিত হইলেন। শ্রীশ্রীবাবার নির্লিপ্ততার পিছনে একটি রহস্য ছিল এবং তাহা শ্রীশ্রীবাবাই

নিজমুখে প্রকাশ করিয়াছিলেন—গল্পচ্ছলে। আমাদের পূজ্যপাদ মাতাঠাকুরাণী পূর্ব্বজন্মে অতিশয় নিম্নশ্রেণীর ঘরে জন্মিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ বা কোনও উচ্চবর্ণের ত ছিলেনই না—এমন ঘরের ছিলেন যাহার জলও অচল ছিল। ইহা ছিল পূর্ব্ব জন্মের ব্যাপার। বাবা এইটি জানিতেন। এইজন্য অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক তিনি একটু আল্‌গা আল্‌গা থাকিতেন। এদিকে আমাদের ঠাকুরমাতাঠাকুরাণী অনেকদিন কি করিবেন কিছু স্থির করিতে না পারিয়া অবশেষে একদিন মনে মনে শ্রীশ্রীজ্যাঠাগুরুদেবকে স্মরণ করিলেন। তাঁহার স্মরণমাত্রেই পূজ্য-পাদ শ্রীশ্রীজ্যাঠাগুরুদেব সেখানে আবির্ভূত হইলেন ও তাঁহাকে বলিলেন যে তাঁহার চিন্তা অপনোদনের ব্যবস্থা করিতেছেন।

সেইখানেই অতঃপর শ্রীশ্রীবাবার ডাক পড়িল। ডাক শুনিয়াই বাবা সব ব্যাপার বুঝিলেন ও অবনত মস্তকে ধীরে ধীরে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে তাঁহার মাতাঠাকুরাণীর সহিত তাঁহার দাদাগুরুদেব তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি তখন তাঁহার দাদাগুরুদেবকে দণ্ডবৎ করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাঁহার আদেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

তাঁহাকে দেখিবামাত্র তাঁহার দাদা-গুরুদেব পূজ্যপাদ শ্রীমৎ ভৃগুরাম স্বামীজী মহারাজ একটি প্রশ্ন করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কাহার সংস্কার বড়—একজন উচ্চবর্ণে থাকিয়া সাধনা করিয়া আরও উচ্চ হইয়াছে ও অপর জন অতি নিম্ন শ্রেণীতে থাকা সত্ত্বেও পর জন্মে উচ্চবর্ণে উঠিয়া তাঁহার মত স্বামী লাভ

করিতে সমর্থ হইয়াছে ?” এই বলিয়া তিনি মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাবা অবশ্য বাক্য দ্বারা কোনও উত্তর প্রদান করিলেন না—যেরূপ নীরবে ছিলেন সেইরূপ নীরবেই রহিলেন। পূজ্যপাদ জ্যাঠাগুরুদেব তখন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে তাঁহার আর চিন্তার প্রয়োজন নাই—সব ঠিক হইয়া যাইবে। যদি ইহার পরেও তাঁহার চিন্তার কোনও কারণ ঘটে তাঁহাকে স্মরণ করিলেই তিনি আবার উপস্থিত হইবেন এবং তাহার প্রতিকার করিবেন। এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে তিনি অন্তর্দ্ধান করিলেন।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী পূজ্যপাদ ভৃগুরাম স্বামীজী মহারাজের এইরূপ আবির্ভাবে বিস্মিত ও যারপর নাই আহ্লাদিত হইলেন। বিশেষ করিয়া তাঁহার চিন্তার কারণ আর থাকিবে না এই ভরসা পাওয়াতে তাঁহার আহ্লাদ আরও বহুগুণ বর্দ্ধিত হইল।

(৮)

উপরকার সুন্দর ঘটনাটি ঘটিয়াছিল শ্রীশ্রীবাবার গুষ্করা থাকার প্রথম দিকে। এইবার যে ঘটনাটি বলিতেছি তাহা ঘটিয়াছিল তাঁহার গুষ্করা থাকার একেবারে শেষের দিকে বা গুষ্করা ত্যাগ করার পর, অর্থাৎ ১৯১১ সালের পর। এই সময় বণ্ডুলে ৺হরহরি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহার মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, নিয়মিত পূজাদির ব্যবস্থা হইয়াছে, তাঁহার মহিমারও কিছু কিছু আভাস লোক-সমাজ পাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

শ্রীশ্রীবাবা তখন স্বয়ং বণ্ডুলে উপস্থিত রহিয়াছেন। তখনও তাঁহার স্নান বন্ধ হয় নাই। তিনি প্রত্যহ প্রত্যূষে স্নান করিতে

নিকটস্থ পুকুরে যাইতেন ও স্নান ইত্যাদি সমাপনান্তে একটু আলো হইতে হইতে বাড়ী ফিরিতেন। শ্রীশ্রীবাবা যখন বাড়ী ফিরিতেন তখন তাঁহার গ্রামের অন্য সকলের উঠিয়া পুকুরে যাইবার সময় হইত। আমাদের মাতাঠাকুরাণীও সেই সময় উঠিয়া গ্রামের অন্যান্য সমবয়সী সখীদের লইয়া স্নানাদি সারিতে যাইতেন।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর পান খাইবাব অভ্যাস ছিল। সকালে উঠিয়া মুখে একগাল পান লইয়া সখীদের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে পুকুর পাড়ে যাওয়া তাঁহার একরূপ নিত্য কর্ম্মের মধ্যে ছিল। একদিন এইভাবে পান চিবাইতে চিবাইতে এবং গল্প করিতে করিতে অন্যমনস্কভাবে তিনি পানের পিক ফেলিলেন। সেই পিকটি কিন্তু গিয়া লাগিল ৺হরহরির মন্দিরের সংলগ্ন প্রাচীরের গায়ে এবং সেইখানেই তাহা লালরঙের রূপ ধরিয়া নূতন পরিষ্কার দেওয়ালের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে থাকিল।

শ্রীশ্রীবাবা স্নান সারিয়া বাড়ী ফিরিবার পথে মন্দিরের দেওয়ালে এই লালরঙের ছোপটি দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে এইটি কাহার কীর্ত্তি এবং মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেন। বাড়ী ফিরিয়াই তিনি তাঁহার মাতাঠাকুরাণীকে ডাকিয়া মন্দিরের দেয়ালের গায়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন এবং বলিলেন, এইরূপ আর কখন যেন না হয় ও এই কথা যেন তাঁহার বধূমাতাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হয়। তাহা না হইলে ৺শিবের কোপে পতিত হইতে হইবে।

আমাদের ঠাকুরমাতাঠাকুরাণী মাতাঠাকুরাণীর ফিরিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মাতাঠাকুরাণী ফিরিতেই তাঁহাকে

সব কথা বলিলেন ও পানের দাগটিকে পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া ফেলিতে বলিলেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী নিজের কৃত কর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নিশ্চয় লজ্জায় অধোবদন রহিলেন এবং তৎক্ষণাৎ জল লইয়া খুব যত্ন সহকারে দাগটি তুলিয়া ফেলিয়া অন্য কাজে হাত দিলেন। কিন্তু ঘটনার সমাপ্তি এখনও হইল না। শ্রীশ্রীবাবা অবশ্য মন্দির-গাত্র পরিষ্কার হইয়াছে জানিয়া খুশী হইলেন।

শ্রীশ্রীবাবা তখন গভীর রাত্রে মহানিশার ক্রিয়াতে রত থাকিতেন। সে রাত্রেও সেই ভাবেই একান্তে নিজ মন্দির মধ্যে রহিয়াছেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী বাটীর অন্দরে নিজ গৃহে ঘুমাইতেছেন। শিশুরা তাঁহার সঙ্গে শুইয়া ঘুমাইতেছে। মধ্য-রাত্রে শ্রীশ্রীমাতাঠ্যকুরাণী হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখেন যে ঘরের মধ্যে কে একজন দাঁড়াইয়া তাঁহার দিকে কট্‌মট্ করিয়া তাকাইয়া রহিয়াছে। তাহার চেহারা যেমন ভয়ঙ্কর, তেমনই রুক্ষ। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল—হাতে একটা প্রকাণ্ড লাঠি এবং এই লাঠি ঠুকিয়া ঠুকিয়া সে তাঁহাকে শাসাইতেছে। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ভীষণ ভয় পাইলেন ও শ্রীশ্রীবাবাকে ডাকিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাবা তখন সেখানে আগমন করিলেন এবং সেই ব্যক্তিটিকে চলিয়া যাইতে বলিলেন। সে যেন শ্রীশ্রীবাবার কথা শুনিয়াও শুনিতে চাহে না—বার বার বলিতে থাকে 'আবার প্রাচীর অপরিষ্কার করিলে রক্ষা রাখিব না।' যাহা হউক, সে অবশেষে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইল ও বাবাও সেখান হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন। শ্রীশ্রীবাবাকে দেখিয়া মাতাঠাকুরাণীর যেন ধরে প্রাণ আসিল এবং

সাহসে ভর করিয়া ছেলেরা ঠিক আছে কিনা দেখিয়া শুইয়া পড়িলেন ও ভয়ে ভয়ে বাকী রাতটুকু কাটাইলেন।

শ্রীশ্রীবাবা এই ব্যাপারটি পরদিন শুনিয়া বলিয়াছিলেন যে শিবের ভৈরব ভীষণ চটিয়াছিল এবং তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ফিরাইতে বাধ্য না করিলে সে না জানি কি করিয়া বসিত। বলা বাহুল্য, শ্রীশ্রীবাবা মহানিশার ক্রিয়াতে রত থাকা অবস্থাতেই ভৈরবের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। বাহির হইতে অন্দরে লৌকিকভাবে আসিলে বাড়ীর সকলেই জাগ্রত হইত—কিন্তু তাঁহার আগমন কেহই জানিতে পারে নাই, কোনও দরজাও কেহ খুলে নাই।

শ্রীশ্রীবাবা এই গল্পটি এত রসাইয়া রসাইয়া বলিতেন যে সকলের মুখে হাসি ধরিত না। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী সম্পূর্ণতঃ গ্রামের মানুষ ছিলেন। কথাবার্ত্তাতে তাঁহার গ্রাম্যতা অতিমাত্রায় ছিল। শ্রীশ্রীবাবা মাতাঠাকুরাণীর গ্রাম্য ভাষার অনুকরণে যখন তাঁহার কথাগুলি বলিতেন তখন হাস্য কলরোলে ঘর মাতিয়া উঠিত। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী পরদিন সকালে তাঁহার সখী-মহলে রাত্রের ঘটনা বর্ণনা করিয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে কোনও ডাকাত টাকাত আসিয়াছিল। ৺ভৈরব বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই। তাই গল্প করিয়াছিলেন—"মিন্‌ষে দুর্গার বাবাকে দেখেও যাইতে চাহে না, কেবল লাঠি ঠক্‌ঠকায় আর আমার দিকে কট্‌মট্ করিয়া চায়। শেষে দুর্গার বাবা ধমক্ দিয়া চলিয়া যাইতে বলিলে ভয়ে ভয়ে চলিয়া গেল, আর আমি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।"

(৯)

শ্রীশ্রীবাবা এ জগতের লোক নহেন। তাঁহার আবির্ভাব এ জগৎকে অলৌকিক করিয়াছে ও অগ্রগতির পথে আগাইতে সাহায্য করিয়াছে। এক দৃষ্টিতে তাই তাঁহার সমগ্র জীবনটাই এক অলৌকিক ব্যাপার। তাহা সত্ত্বেও তিনি এই জগতেরই মানুষ। কারণ তাঁহার অঙ্গের অংশরূপে তাঁহার কৃপা-প্রাপ্ত জীবগুলি এখনও পূরাপূরি মানুষই। এই লৌকিক ও অলৌকিক সমন্বয় অন্য কাহারও জীবনে এত সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিতে দেখি নাই। তাঁহার যোগদর্শনও তাই প্রচলিত যোগ-দর্শনের সহিত সব স্থলে ঠিক মিলে না। এখানেও ঠিক সেই সমন্বয় রহিয়াছে যাহার দ্বারা জীবের আধারে ভগবৎ-শক্তির ক্রিয়া অনায়াসে হয়। আমরা তাঁহাকে এক খণ্ড-মূর্ত্তির মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া দেখিতে অভ্যস্ত হইতেছিলাম। ইহা তাঁহার স্বরূপের পরিপন্থী ছিল। কাজে কাজেই আমাদের চক্ষের সামনে সে ভুলটি তিনি ভাঙিয়াছেন। তিনি নিজ খণ্ড-মূর্ত্তি ধরিয়াও আজ সর্ব্ব-ব্যাপী সত্তা। এই সর্ব্বব্যাপী সত্তার বোধ যখন আমাদের জাগিবে তখন আবার তাঁহার মূর্ত্তরূপ আমাদের নিকট প্রকাশ পাইবে। অন্ততঃ এই আশাই জাগিয়া রহিয়াছে এই ক্ষুদ্র জীব সত্তাটির প্রাণের ক্রন্দনে।

নমস্তে সতে সর্বলোকাশ্রয়ায়,
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়,
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়॥

তদেকং স্মরামস্তদেকং জপামঃ,
তদেকং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং,
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ ॥

জয়তি পরগুরুঃ শ্রীশৈলজা-যুক্তদেহো
রজনিরমণ মৌলির্যোগিরাজাধিরাজঃ।
জয়তি চ নরমূর্ত্তির্দেবদেবঃ স এব
বিতত-বিপুল-ভূতিঃ শ্রীবিশুদ্ধাভিধানঃ ॥

আরোপ সাধন

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট

(১)

সাধনা বহু প্রকার আছে এবং সাধকের অধিকার অনুসারে প্রত্যেকটি সাধনার সার্থকতা আছে। সাধকের যেমন যোগ্যতার তারতম্য আছে, তেমনি তদনুসারে সাধনের ফলগত তারতম্যও আছে। যাঁহারা সাধনার ইতিহাস আলোচনা করেন তাঁহারা তটস্থ দৃষ্টিতে তারতম্য, অনুভব করিয়া থাকেন। কিন্তু সাধক নিজে তটস্থ দৃষ্টি গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া ইহা ধারণা করিতে পারে না। রুচি ও শক্তির বিকাশ অনুসারে যে সাধক যে মার্গ অবলম্বন করিয়া সাধন পথে চলিতে থাকে তাহার নিকট তৎকালে সেই মার্গের লক্ষ্যই সাধনার চরম সিদ্ধি বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। অন্য মার্গের সহিত তুলনা করিয়া তারতম্য বিচার করার সামর্থ্য তাহার থাকে না। ইহাই সাধারণ নিয়ম এবং ইহা স্বাভাবিক। তবে স্থিতি বিশেষে ইহার ব্যভিচারও যে দৃষ্ট হয় না তাহা নহে।

আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধে আরোপ-সাধন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। আমি যাহা বলিব তাহা যদিও কোন বিশিষ্ট ধারা অবলম্বন করিয়াই বলিব তথাপি তাহার মধ্যে যে গভীর তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে তাহা অবস্থা বিশেষে অন্যান্য সাধন-পদ্ধতিতেও আংশিকভাবে লক্ষিত হইতে পারে। আরোপ-সাধন

যোগি-সমাজেও অত্যন্ত নিগূঢ় সাধন রূপে স্বীকৃত হয়—ভাগ্যবান্ ভক্ত ভিন্ন অপর কেহ ইহার রহস্য অবগত নহে। প্রচলিত অধিকাংশ সাধন আত্মদর্শনের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়,—আত্মদর্শন হইলেই সিদ্ধিলাভ হইয়াছে মনে করিয়া অগ্রিম পথে আর কেহ অগ্রসর হয় না। এই আত্মদর্শন প্রাথমিক আত্মদর্শন, পূর্ণ আত্ম-দর্শন নহে। প্রকৃতি হইতে পৃথক্‌ভাবে আত্মাকে দর্শন করাই প্রাথমিক আত্মদর্শনের উদ্দেশ্য। এই প্রারম্ভিক আত্মদর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত আরোপ-সাধনের সূত্রপাতই হয় না। আরোপ-সাধনের ফলে যে পূর্ণ আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ হয় তাহা অদ্বৈত আত্ম-স্বরূপে অবস্থিতি। তাহা বহুদূরবর্ত্তী আদর্শ। কিন্তু প্রাথমিক আত্মদর্শনও সাধন পথে অতি উচ্চ অবস্থার সূচনা করিয়া থাকে। যাহা হউক, আরোপ-সাধনের বৈশিষ্ট্য ইহা হইতে কিয়দংশে অনুমিত হইতে পারে।

দীক্ষার সময় গুরু শিষ্যের দক্ষিণ কর্ণে ইষ্টমন্ত্র দান করিয়া থাকেন, ইহা সকলেই জানেন। বস্তুতঃ গুরু যে বাহির হইতে সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় শিষ্যকে শব্দ-বিশেষ শুনাইয়া দেন তাহা নহে—তিনি দীক্ষার সময় অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া অন্তর্যামি-রূপে শব্দব্রহ্মময় জ্ঞান দান করেন। এই জন্যই দীক্ষাদাতা গুরুকে জ্ঞানদাতা রূপে শাস্ত্রকারগণ বর্ণনা করিয়া থাকেন। এই জ্ঞান পরোক্ষ জ্ঞান, কারণ ইহা শব্দ হইতে উত্থিত হয়।

জ্ঞান দুই প্রকার। একটি শব্দজ অর্থাৎ উপদেষ্টা গুরুর উপদেশ-বাণী হইতে শিষ্যের হৃদয়ে পরোক্ষরূপে উদ্ভূত। ইহাকে আগমোত্থ অথবা আগমজন্য জ্ঞান বলা হয়। কেহ কেহ ইহাকে

ঔপদেশিক জ্ঞান বলিয়া থাকেন। দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞান শব্দ হইতে উত্থিত হয় না অর্থাৎ গুরু বাক্য হইতে জন্মে না, কিন্তু শিষ্যের বিবেক হইতে আপনা আপনি উদ্ভূত হয়। ইহাকে বিবেকজ জ্ঞান বলে—প্রাতিভ জ্ঞান ইহার নামান্তর। ইহা অনৌপদেশিক। কারণ ইহা অন্যের মুখ-নিঃসৃত উপদেশ-বাণী হইতে উৎপন্ন হয় না। এইটি প্রত্যক্ষ জ্ঞান। সদ্‌গুরুর বিশিষ্ট কৃপার উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত এই দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞান আবির্ভূত হয় না। বস্তুতঃ এই জ্ঞানই তারক জ্ঞান—ইহার অবিষয় কিছুই থাকে না। ইহাতে একই ক্ষণে অতীত অনাগত ও বর্ত্তমান সকল পদার্থের সর্ব্ববিধ জ্ঞান বিদ্যমান থাকে। এই জ্ঞানে ক্রম থাকে না, দেশগত অথবা কালগত ব্যবধানের প্রশ্ন থাকে না,—সর্ব্বজ্ঞত্ব ইহারই নামান্তর। গুরুর মৌখিক উপদেশ হইতে এই প্রকার প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে না। এই মহাজ্ঞানের সঞ্চার-কালে সদ্‌গুরু বাহ্যতঃ কোন বাক্য প্রয়োগ করেন না, কিন্তু মৌনী থাকেন, অথচ ইহার এমনি প্রভাব যে ইহাতে যাবতীয় সংশয় ছিন্ন হইয়া অখিল কর্মবন্ধন ক্ষীণ হয় এবং হৃদয়ের মর্ম্ম-প্রবিষ্ট গ্রন্থি সকল ছিন্ন হয়। "গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যস্তু ছিন্নসংশয়ঃ।"

পরোক্ষ জ্ঞান লাভ করার পর সাধকের চিত্তে যতদিন পর্য্যন্ত ইষ্ট-সাক্ষাৎকারের জন্য ব্যাকুলতা না জন্মে ততদিন সদ্‌গুরুর কৃপার উদয় হয় না এবং অপরোক্ষ জ্ঞানের আবির্ভাব হইতে পারে না। কঠোর তপস্যা, কৃচ্ছ্র সাধন, অভাবের বেদনা, লাঞ্ছনা, আধি ও ব্যাধি এবং নানা প্রকার পরীক্ষা অতিক্রম করিতে না পারিলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের জন্য উৎকট তৃষ্ণা জন্মে না। গুরুর মঙ্গলময়

ইচ্ছাতে সাধককে বহু প্রকার অবস্থা-বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হয়। কেহ কেহ এই সকল অবস্থাকে প্রারব্ধের ফল-ভোগ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। নানা প্রকার প্রলোভন এবং পরীক্ষা দ্বারা সাধকের চিত্ত প্রকৃত সত্যের অন্বেষণের পথে জাগ্রত থাকে। অনেক সাধকের বিশ্বাস ও ধৈর্য্যের পরীক্ষা এই সময়েই হইয়া থাকে। যাহার চিত্তে যে অংশে দুর্ব্বলতা তাহার সেই অংশেই সাধারণতঃ পরীক্ষা হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য ভক্ত mystic গণের বর্ণনা অনুসারে এই সময়টীকে Dark Night of the Soul, এমন কি Dark Night of the Spiritও, বলা যাইতে পারে। ইহা সত্যই গভীর অমানিশার ন্যায় অন্ধকারময় ও আতঙ্কপ্রদ। প্রবল উৎকণ্ঠা, গুরুর আদেশানুসারে যথাশক্তি সাধনার চেষ্টা, নৈতিক জীবনের মহান্ আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখা এবং অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও ধৈর্য্য ও সহনশীলতার দ্বারা নিজের চিত্তকে সংযত ও স্থির রাখিতে চেষ্টা করা এবং সর্ব্বোপরি অবশ্যম্ভাবী গুরু-কৃপার উপর অটল শ্রদ্ধা রাখিয়া তাহার জন্য একান্ত-মনে প্রতীক্ষা করা—ইহাই এই সময়ের একমাত্র কর্ত্তব্য। এই অবস্থার মধ্যে অতর্কিতভাবে সদ্‌গুরুর মহাকরুণা আত্মপ্রকাশ করে এবং সাধকের তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে শান্তি ও আনন্দময় চৈতন্যের উজ্জ্বল জ্যোতি ফুটিয়া উঠে। অত্যন্ত উত্তাপময় গ্রীষ্ম ঋতুর অবসানে নব বর্ষার সূত্রপাত হইলে তাপ-ক্লিষ্ট জীব-জগৎ যেমন উৎফুল্ল হয়, ঠিক সেই প্রকার দীর্ঘকালের অবসাদ ও নৈরাশ্যের পর গুরু-কৃপার আবির্ভাব হইলে সাধকের চিত্তও সর্ব্বপ্রকার সংশয় ও চঞ্চলতা হইতে মুক্ত হইয়া একটি

শান্ত ও স্থির আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অবস্থার নাম প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উদয়—যে জ্ঞানে সংশয় অথবা বিকল্পের স্থান নাই। সূর্য্যের উদয় হইলে তিমির-রাশি যেমন ঐ কিরণের দ্বারা বিদীর্ণ হইয়া অপসারিত হয়, তদ্রূপ অপরোক্ষ জ্ঞানের উদয় হইলে চিত্তস্থিত অনাদিকালের সঞ্চিত আবর্জ্জনা রাশি মুহূর্ত্ত মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। শব্দব্রহ্ম হইতে শব্দাতীত পরব্রহ্মের অধিগম এই প্রকারেই হইয়া থাকে।

এই পরব্রহ্মরূপী আত্মা বা সাক্ষী নির্ম্মল চৈতন্যস্বরূপ। ইনি মানবের দেহে ও বিশ্বে সর্ব্বত্র অসঙ্গভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, দেশ কাল ও আকৃতির বন্ধন ইহাতে নাই। তাই সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ও সর্ব্ব আকারের মধ্যে ইনি সমরূপে বিরাজ করেন। কিন্তু এমনই অদ্ভুত রহস্য যে ইনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও সদ্‌গুরুর কৃপা ব্যতিরেকে কাহারও দৃষ্টিগোচর হন না। এক খণ্ড লৌহকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া দীর্ঘকাল পর কুণ্ড হতে উঠাইয়া লইলে যে অগ্নিময় লৌহ-খণ্ড দৃষ্টিগোচর হয় তাহাতে একাধারে যেমন অগ্নিও আছে ও লৌহও আছে, উভয়ই পরস্পর মিশ্রিত ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, তদ্রূপ একই আধারে দেহ ও আত্মা দুই-ই বর্ত্তমান রহিয়াছে, কিন্তু অপৃথক্‌ভাবে বা মিশ্রভাবে, কারণ দেহ হইতে আত্মাকে অথবা আত্মা হইতে দেহকে পৃথক্ করিয়া গ্রহণ করা যায় না। একমাত্র গুরূপদিষ্ট কর্ম্ম-কৌশলে এই আত্ম-বস্তুকে দেহ হইতে বা প্রকৃতির অংশ হইতে পৃথক্ করিয়া দর্শন করা যায়। ইহাই বিবেক-জ্ঞানের উদয়, যাহা এক হিসাবে আত্মদর্শন নামে সাধক-সমাজে পরিচিত। সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমভাবে যাহা বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহা তাহারই

সাক্ষাৎকার। ইহারই নাম জ্ঞান-চক্ষুর উন্মীলন। এই সময়ে দীক্ষা-কালে প্রাপ্ত পরোক্ষ জ্ঞান সাক্ষাৎ অপরোক্ষ জ্ঞানরূপে পরিণত হয়। আরোপ সাধক যোগিগণ এই সাক্ষিস্বরূপ চিন্ময় সত্তাকে তাঁহাদের সরল ভাষায় 'বর্ত্তমান' নামে অভিহিত করেন। এই 'বর্ত্তমান' প্রকৃত প্রস্তাবে নিরাকার ও সাকার উভয় সত্তার একমাত্র সমন্বয়-ভূমি। গীতোপদিষ্ট উত্তম পুরুষে বা পরমাত্মাতে যেমন ক্ষর ও অক্ষর উভয় সত্তার সমন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে তদ্রূপ এই নিত্য বর্ত্তমানে নিরাকার ও সাকার উভয় সত্তাই বিরাজ করিতেছে। তাই আরোপ সাধক বলেন—

'সাক্ষিভূত বর্ত্তমান দাঁড়ায়ে সাক্ষাতে,
নিরাকার ও সাকার এই দুই দেখ তাতে।'

এই বর্ত্তমানের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের কার্য্য সমাপ্ত হইয়া যায়, কারণ এই বর্ত্তমানই জ্ঞেয় অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় ও ইহাকে অভিব্যক্ত করাই জ্ঞানের উদ্দেশ্যে। কর্ম যেমন জ্ঞানের উদয়ে সার্থক হয়, তদ্রূপ জ্ঞানও জ্ঞেয় আবিভূর্ত হইলে সার্থক হয়। জ্ঞেয়ই ইষ্ট, সুতরাং কর্ম ও জ্ঞানের প্রভাবে ইষ্টের আবির্ভাব হইলে সাধক উভয়ের অতীত এক অভিনব উন্নত স্তরে প্রবেশ লাভ করেন। যে সাধক এইখানেই নিবৃত্ত হন তাঁহার পক্ষে পরবর্ত্তী অবস্থার প্রাপ্তি সম্ভবপর হয় না। এই অবস্থা আত্মদর্শন হইলেও ইহা যে পূর্ণ আত্মদর্শন নহে এবং এ অবস্থাতে স্থিতি যে অখণ্ড আত্মস্বরূপে স্থিতি নহে তাহা বলাই বাহুল্য।

(২)

এইবার সাধকের জীবনে প্রেমের কার্য্য আরম্ভ হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুদেব বলিতেন কর্ম হইতে জ্ঞান হয়, জ্ঞান হইতে ভক্তি হয় এবং ভক্তি হইতে প্রেম হয়। বাস্তবিক পক্ষে জ্ঞানের কার্য্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত রস-সাধনার সূত্রপাত হইতে পারে না। রস-সাধনার জন্য ভাবের বিকাশ আবশ্যক এবং ভাবের বিকাশের জন্য তৎপূর্ব্বে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উদয় আবশ্যক, কিন্তু শুধু প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মিলেই ভাবের উদয় হইতে পারে না, তাহার জন্য আনুষঙ্গিক সাধনা আবশ্যক। এইবার আমরা সেই আনুষঙ্গিক সাধনার পরিচয় দিতে যথাশক্তি চেষ্টা করিব। আমরা যাহাকে আরোপ-সাধনা বলিয়াছি পূর্ব্বোক্ত আত্মজ্ঞান লাভের পরেই তাহার অনুষ্ঠান সম্ভবপর হয়, এবং এই আরোপ সাধনার ফলেই পূর্ণ আত্মস্বরূপে স্থিতি, আত্মারাম অবস্থা লাভ, নিত্য লীলার আস্বাদন প্রভৃতি মনুষ্যের পরাৎপর পুরুষার্থ সকল সিদ্ধ হয়।

সিঁড়ি অবলম্বন করিয়া ছাদে উঠিতে পারিলে ঐ সিঁড়ির প্রয়োজন যেমন আর থাকে না, তেমনি কর্ম্ম ও জ্ঞান অবলম্বন করিয়া জ্ঞেয়কে প্রাপ্ত হইলে কর্ম্ম ও জ্ঞানের প্রয়োজন আর থাকে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জ্ঞেয়ই ইষ্ট—ইনি সদা ও সর্ব্বত্র বর্ত্তমান পুরুষোত্তম। কৃষ্ণ-উপাসকের ইনি নিত্য কৃষ্ণ এবং রাম-উপাসকের ইনি নিত্য রাম। সকল উপাসকেরই আপন আপন ইষ্টরূপে ইনিই একমাত্র উপাস্য।

দীক্ষাকালে যে শব্দ মন্ত্রদাতা গুরুর মুখ হইতে শিষ্যের কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছিল সদ্‌গুরুর কৃপায় সেই শব্দই আজ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অবস্থায় জ্ঞেয়রূপে অথবা চিন্ময় ইষ্টরূপে প্রকাশমান হইয়াছে। বৈখরী বাক্ আজ পশ্যন্তী ভূমিতে আরূঢ় হইয়াছে। ক্রিয়া, মন্ত্র,

জপ প্রভৃতি সার্থক হইয়াছে, কারণ যে বস্তু এতদিন শুধু শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত ছিল আজ তাহা নেত্রের বিষয়ীভূত হইয়াছে, অর্থাৎ শ্রবণ-জাত জ্ঞান সাক্ষাৎ দর্শনে পরিণত হইয়াছে। এখন আর পৃথক্‌ভাবে ক্রিয়াদির প্রয়োজন নাই। কারণ আত্মভাবে নিষ্ঠা জন্মিলে সাধকের সকল চেষ্টা অর্চ্চনাতে পরিণত হয় এবং সকল বাক্যই মন্ত্র-জপের তুল্যতা লাভ করে।

এই বর্ত্তমান রূপই আরোপ সাধকগণের পরিভাষাতে '**শ্যামবিন্দু**' নামে পরিচিত। জগতের অনন্ত রূপ, অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান ত্রিবিধ কাল, দুর ও নিকট যাবতীয় দেশ, সবই এই নিত্য বর্ত্তমানে অভিন্নভাবে স্থিত রহিয়াছে। এই রূপের উদয় হইলেই জগৎ আলোকিত হয় এবং ইহার তিরোভাবের ফলে জগৎ আচ্ছন্ন হয়।

এইরূপটি অতি গুপ্ত এবং গুহ্য। যদিও ইহা সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই পূর্ণরূপে প্রকাশমান রহিয়াছে, তথাপি আবরণে আবৃত বলিয়া সকলের চক্ষে ইহা ভাসে না। দ্রষ্টার চক্ষুতেও আবরণ আছে, আবার বস্তুর স্বরূপেও স্ব-কল্পিত আবরণ আছে। অখণ্ড সত্তার প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত আবরণ থাকা স্বাভাবিক। আত্মদর্শনের পর এই দৃষ্টিগোচর আত্মস্বরূপকে নিয়ত ভজন করা আবশ্যক। ইহা কর্ম্মের অঙ্গভূত উপাসনারূপ ভজন নহে, ইহা নিত্য ভজন—ইহাতে দিক্, দেশ ও কালের কোন নিয়ন্ত্রণ নাই। ইহাতে দশাগত, বর্ণগত, পরিমাণগত এবং লিঙ্গগত কোন ভেদ নাই। ইহা চিন্ময়, সর্ব্বরূপ ও সর্ব্বাকার। সাধকগণ ইহাকে নিষ্ক্রিয় ভজন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

ইহা সর্ব্বাকার হইলেও সাধক স্বয়ং মনুষ্যরূপী বলিয়া নিজের ইষ্টকে পাইলেই তাঁহার ভজনের অনুকূলতা জন্মে। সেইজন্য সাধকের কল্যাণ কামনায় তাঁহার জ্ঞেয় বা ইষ্ট মনুষ্যাকার হইয়া প্রকাশিত হন। মনুষ্য-আকারের বৈশিষ্ট্য এই যে সাধক নিজে মনুষ্য বলিয়া এই ইষ্ট আকার প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার নিজেরই আকার অথবা নিজের সহিত অভিন্ন আকাররূপে প্রতিভাসমান হয়। তখন ভক্ত সাধকের নিজ দেহের প্রতি যে সেবা বা পরিচর্য্যা করা হয় তাহা তাঁহার ইষ্টের পরিচর্য্যারূপে পরিণত হয়। ভক্তের রূপ ও তাঁহার ভজনীয়ের রূপ পৃথক্ হইয়াও তখন অপৃথক্‌ভূত, উভয়ই তখন সমসূত্র। ইষ্ট তখন ভক্তের সঙ্গে যোগে থাকিয়া অনুরাগে অনুষ্ঠিত ভক্ত-সেবা গ্রহণ করিয়া থাকেন। পরব্রহ্ম তখন মনুষ্যাকার বা নররূপী। ভক্ত মনুষ্য, তাই ভগবান্ মনুষ্য, উভয়ে কোন ব্যবধান নাই।

এই নিত্য বর্ত্তমানের দর্শন অপরিসীম ভাগ্যের কথা, গুরু কৃপার পরাকাষ্ঠা এই দর্শনেই জানিতে হইবে। পূর্ব্বে বলিয়াছি নিত্য বর্ত্তমানে ত্রিকালই ভাসে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ত্রিকাল কোথায়? একমাত্র বর্ত্তমানই ভূত-ভবিষ্যৎকে আক্রমণ করিয়া নিজের অসম প্রভাবে বিরাজ করিতে থাকে। এইজন্যই সাধক যে কোন অবস্থাতে এই স্থিতি লাভ করেন ঐ অবস্থা তাঁহার পক্ষে আর অবস্থা থাকে না, উহা নিত্য বর্ত্তমানরূপে প্রকাশিত হয়। তাই ভজনের প্রভাবে ঐ অবস্থা বা দশা বিকার-রহিত হইয়া নিত্য অথবা চিরস্থায়ী রূপ ধারণ করে। তখন উহা কালের দশারূপে পরিগণিত হয় না—উহা কালাতীত হয়। এটিকে নিত্য

দেহ বলে। যে দেহ যে বয়সে যে রূপে ভজন করে তাহাই নিত্য দেহরূপে প্রকট হইয়া থাকে।

(৩)

আরোপ সাধনা অভ্যাস-সাপেক্ষ। এই অভ্যাসের ক্রম আছে। স্থূলভাবে এই ক্রমের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে চেষ্টা করিতেছি।

(ক) সাক্ষিভূত সম্মুখস্থিত বর্ত্তমানে নিরাকার ও সাকার উভয় সত্তা দেখিতে অভ্যাস করা আবশ্যক।

(খ) মনের উৎকণ্ঠা এবং প্রাপ্তির লালসা যাহাতে ক্রমশঃ অধিকতর তীব্র হয় তাহার জন্য চেষ্টা করা উচিত। বিষয় ও বিষয়ীর সংসর্গ যথাসম্ভব পরিহার করিয়া চলা উচিত, কারণ ইহা ভজনের অন্তরায়-স্বরূপ। আকাঙ্ক্ষা যাহার যত তীব্র হইবে প্রাপ্তি তাহার তত নিকটবর্ত্তী জানিতে হইবে। সুতরাং আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিয়া হৃদয় হইতে আশার কণিকা পর্য্যন্ত বর্জ্জন করিতে হইবে, অর্থাৎ আশা না রাখিয়া শুধু আকাঙ্ক্ষাকে বাড়াইতে হইবে।

(গ) একান্ত-বাস এই সাধনের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। যত অধিক সময় সম্ভবপর হয় নির্জ্জন স্থানে অবস্থানের চেষ্টা করা উচিত। লোক-সংসর্গ যথাশক্তি বর্জ্জনীয়, কারণ উহাতে শক্তি-ক্ষয় হয়। একান্ত স্থানে থাকিবার সময় এমনভাবে অবস্থান করিবে যাহাতে কেহ দেখিতে না পায়। দেহটিকে যে কোন প্রকারেই হউক স্থির রাখার অভ্যাস করা উচিত। প্রোথিত

স্তম্ভ যেমন নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান থাকে দেহকে তাহার অনুরূপ-ভাবে স্থির রাখিতে চেষ্টা করা উচিত।

(ঘ) দেহ-স্থিতির সঙ্গে সঙ্গেই মনকে সর্ব্বদা যথাশক্তি ভ্রূমধ্যে ধারণ করিবার চেষ্টা করা উচিত। ইহারই সহকারিরূপে নিমেষ ও উন্মেষ বর্জ্জিত অবস্থা প্রাপ্ত হইবার জন্য চক্ষুর পলক যাহাতে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত না পড়ে সেইদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। ইহার নাম 'নিমেষ-বর্জ্জন'। পক্ষান্তরে অভ্যাসের সময় তন্দ্রা ও নিদ্রার আবেশ যাহাতে না হয় যে সম্বন্ধে অবহিত হওয়া আবশ্যক। নিমেষপাত ও ক্ষণমাত্রের জন্য তন্দ্রার উদয় আদর্শ-প্রাপ্তির অন্তরায় স্বরূপ। নিমেষ বা পলক পড়িবার আশঙ্কা হইলে চক্ষুকে শিথিল করিয়া রাখা উচিত। দীর্ঘকাল অভ্যাসের ফলে ইচ্ছানুরূপ নিমেষ-বর্জ্জন আয়ত্ত হয়। ইহা একটি উচ্চ অবস্থা। এইভাবে মন স্থির হয়, বায়ু স্থির হয়, এবং অপ্রার্থিত হইলেও সিদ্ধি সকল আয়ত্ত হয়। আরোপ সাধক কৃত্রিম ভাবে প্রাণায়াম বা কুম্ভকাদির অভ্যাস করেন না—তাঁহার প্রাণ স্বাভাবিক রীতিতে উপশম প্রাপ্ত হয়। তজ্জন্য হঠ-যোগাদি-সাধ্য প্রাণায়াম ক্রিয়ার আবশ্যকতা হয় না।

(৪)

মন, বায়ু ও দৃষ্টি স্থির হওয়ার কথা পূর্ব্বে বলা হইল। যখন এই স্থিতি লাভ সম্পন্ন হইবে তখনই পরবর্ত্তী সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তৎপূর্ব্বে নহে! ইহার নাম 'লক্ষ্য-বেধ'। লক্ষ্য কাহাকে বলে? সাধকের হৃদয়নিষ্ঠ গুরুদত্ত ইষ্টরূপই লক্ষ্য। এই অন্তঃস্থিত রূপকে চক্ষুর্দ্বয়ের বাহিরে আকর্ষণ করিয়া

আনিতে হইবে এবং সম্মুখে স্থান-বিশেষে স্থাপন করিতে হইবে। যাহা হৃদয়-আকাশে গুপ্তরূপে নিহিত ছিল তাহাকে বাহির করিয়া বহিরাকাশে ব্যক্তরূপে স্থাপন করিতে হইবে। হৃদয়-আকাশ* ও বহিরাকাশের যেটি সন্ধি তাহাই লক্ষ্য-প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত স্থান বা কেন্দ্র। এই প্রসঙ্গে স্পষ্টভাবে অধিক রহস্য প্রকাশ করা উচিত মনে করিলাম না। সন্ধির ওপারে স্থির বায়ু এবং এপারে চঞ্চল বায়ু। চঞ্চল বায়ুর সীমার বাহিরে স্থির বায়ুর প্রান্ত ভূমিতে লক্ষ্যকে স্থাপন করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে ভ্রূ-মধ্যে স্থিরীভূত মনকেও ঐস্থানে বসাইবে। নিমেষ ত্যাগ করার অভ্যাস পূর্ব্বে সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া এবার দৃষ্টিকে নিমেষ-বর্জ্জন পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত লক্ষ্যস্থানে সন্ধান করা আবশ্যক। ইহার ফলে মন, নেত্র ও লক্ষ্য এক হইয়া প্রকাশিত হইবে। ইহার নাম লক্ষ্য-বেধ†। লক্ষ্যবেধের সময় মনে যাহাতে অন্য ভাব না থাকে এবং দৃষ্টিতে অন্য কিছু না ভাসে তাহার জন্য অবহিত থাকা আবশ্যক।

---

*ইহা যোগিগণের পরিচিত লক্ষ্যত্রয়ের অন্তর্গত বহির্লক্ষ্যের প্রকার ভেদ মাত্র।

†মুণ্ডকোপনিষদে প্রকারান্তরে লক্ষ্যবেধের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। দেহ সাধকের ব্রহ্মই লক্ষ্য, আত্মাই শর এবং প্রণবই ধনুঃ। প্রণব দ্বারাই ব্রহ্মে আত্মাকে প্রবিষ্ট করাইতে হয়। লক্ষ্যবেধের নিদর্শন সূতসংহিতাকার এইভাবে দেখাইয়াছেন –

লক্ষ্যং সর্বগতং চৈব পরোক্ষং সর্বতোমুখম্।
বেদ্ধা সর্বগতশ্চৈব বিদ্ধং লক্ষ্যং ন সংশয়ঃ॥

(৫)

লক্ষ্যবেধ ক্রিয়া ঠিক ঠিক নিষ্পন্ন হইলে সাধকের হৃদয়স্থিত রূপ দৃষ্টির সম্মুখে বাহিরে প্রকাশিত হয়। রূপ নয়নগোচর হইলেই ঐ রূপের প্রত্যেকটি অঙ্গ দর্শন করা আবশ্যক। সাধক-সমাজে ইহার জন্য একটি বিশিষ্ট প্রক্রিয়ার বিধান রহিয়াছে। প্রথমতঃ ঐ বহিরাকাশস্থিত মূর্ত্তির পদতল হইতে ক্রমশঃ উর্দ্ধদিকে এক একটি অঙ্গের উপর অভিনিবেশ সহকারে দৃষ্টি স্থাপন করিতে হয়। এই প্রকারে মস্তকের অগ্রভাগস্থিত কেশান্ত পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ আবশ্যক। ইহার নাম অধঃ-উর্দ্ধক্রম। ইহার পর উর্দ্ধ হইতে অধোদিকে অর্থাৎ কেশান্ত হইতে পদতল পর্য্যন্ত ক্রমশঃ এক এক অঙ্গের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে হয়। এই ভাবে একবার অনুলোমে এবং একবার বিলোমে পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করা আবশ্যক। চক্ষুকে কোমল ও সরল ভাবে রক্ষা করিয়া দৃষ্টি সন্ধান আবশ্যক। উদ্দেশ্য এই, বাহ্য রূপের প্রতি অঙ্গই যেন দৃষ্টির সম্মুখে নিরন্তর ভাসিতে থাকে। অভ্যাসের সময় ক্রম অবলম্বন করিয়া এক অবয়বের পর অপর অবয়ব নিরীক্ষণ করিতে হয়, ইহা সত্য। কিন্তু অভ্যাস ঠিক ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে সকল অঙ্গই যুগপৎ দৃষ্টিগোচর হয়, ক্রমিক দর্শনের আবশ্যকতা আর থাকে না। যদি কখনও কোন কারণে কোন অঙ্গ দৃষ্টির সম্মুখে না ভাসে তাহা হইলে ঐ অঙ্গে পুনর্ব্বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করা উচিত। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সর্ব্ব অঙ্গ একসঙ্গে উদ্‌ভাসিত না হইবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই প্রকারেই অভ্যাস করিতে করিতে অগ্রসর হইতে হইবে। এই রূপ-সন্ধান ব্যাপারে

কালাকাল অথবা শুচি-অশুচির কোন বিচার নাই। ইহা সর্ব্বদাই করা উচিত— শয়নে, উপবেশনে, চলনে, স্থিতিকালে, সব সময়ে ইহা করণীয়। কোন সময় বাদ দেওয়া উচিত নয়।

দীর্ঘকালের অভ্যাসের ফলে বাহ্য রূপের সর্ব্বাঙ্গ একই সময় দৃষ্টিতে ভাসিবে। তখন অখণ্ড মণ্ডলাকারে সমস্ত শরীর প্রকাশিত হইবে এবং শরীরটি প্রাণযুক্ত অর্থাৎ জীবন্তরূপে প্রতিভাসমান হইবে। এই অবস্থায় সাধকের নয়নের সহিত সাধ্য-রূপের নয়নের মিলন ঘটিবে। এই চারি চক্ষুর মিলনই শুভদৃষ্টি বলিয়া জানিতে হইবে। এই সময় হইতে সাধক ও সাধ্য বা ইষ্ট উভয়ের জন্য উভয়ের অস্থিরতা অথবা চাঞ্চল্য উৎপন্ন হইবে। ইষ্ট প্রাণময় না হওয়া পর্য্যন্ত এই প্রকার চাঞ্চল্য জন্মে না। বস্তুতঃ উপাস্য মূর্ত্তিতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইলে এইরূপই হইয়া থাকে। ইহা না হইলে, মূর্ত্তি মূর্ত্তিমাত্র, উহা মৃন্ময়, শিলাময়, দারুময় অথবা জ্যোতির্ম্ময় হউক তাহাতে কিছু আসে যায় না। বাহ্যরূপ প্রাণময় না হওয়া পর্য্যন্ত উহা সাধকের ভাবানুসারে সাড়া দিতে সমর্থ হয় না।

(৬)

ইহার পর ভাবের উদয় হয়। সাধক তখন আনন্দে আত্মহারা হইয়া নিজের কায়, মন ও বাক্য, এমন কি তাহার সর্ব্ব-স্ব অর্থাৎ তাহার চতুর্বিংশতি তত্ত্বময় শরীর ইষ্টকে সমর্পণ করে এবং তখন হইতে তাঁহার শরণ গ্রহণ করে। ইহার ফলে সাধক ঐ জীবন্ত ইষ্টরূপ সর্ব্বদাই দেখিতে পায়। বেদে আছে, 'সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।' ইহা কোন কোন অংশে তাহারই অনুরূপ অবস্থা।

যতক্ষণ রূপে প্রাণ-প্রতিষ্ঠার পর সাধকের হৃদয়ে ভাবের জাগরণ না হয় ততক্ষণ ঐ রূপ ঠিক ঠিক চেতন রূপ নহে এবং উহা সর্ব্বদা দৃষ্টিগোচর হয় না। কখনও উহা দৃষ্টিগোচর হয়, আবার কখনও উহা দৃষ্টি হইতে অন্তরাল হইয়া যায়। সূর্য্যের যেমন একবার উদয় হয় এবং একবার অস্ত হয়, তার পর কিছু সময় অদর্শনের পর পুনর্বার উদয় হয়, ঐ রূপও তখন উদয়াস্তময় দ্বন্দ্ব অবস্থার মধ্যে থাকে। শাস্ত্রে এ প্রকার রূপকে শান্তোদিত রূপ বলা হইয়াছে। কিন্তু সাধকের হৃদয়ে ভাব জাগিয়া উঠিলে এই অবস্থার মধ্যে পরিবর্ত্তন ঘটে। তখন আবিভূ্ত রূপ চিন্ময় বলিয়া আর তিরোহিত হয় না। বস্তুতঃ তখন ঐ রূপের উদয়ও নাই, অস্তও নাই—শাস্ত্রীয় পরিভাষাতে উহার নাম নিত্যোদিত রূপ।

রাত্রে, দিনে, নিদ্রায়, জাগরণে, শয়নে, ভোজনে, সর্ব্বকালে, আসনে বসিয়া, এমন কি পথে চলিতে চলিতে, সাধক সর্ব্বদা তাহার নিত্য সঙ্গী ইষ্টের দর্শন লাভ করিয়া থাকে। তখন সাধ্যের সঙ্গে সাধকের বিচ্ছেদ চিরদিনের জন্য কাটিয়া যায়। সংসারের সুখ-দুঃখ ও জ্বালা-যন্ত্রণা সাধককে আর কখনও স্পর্শ করে না— আঘাত করা ত দূরের কথা। কারণ সাধকের মন তখন সর্ব্বদা সাধ্য বস্তুতে লগ্ন থাকে, পূর্ব্বের ন্যায় বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায় না। জগতের কোন ঐশ্বর্য্য-সুখ অথবা মান-সম্মান সাধককে আকর্ষণ করিতে পারে না। ঐ অবস্থায় একটি অপূর্ব্ব আনন্দের আস্বাদন সর্ব্বদার জন্য সাধককে নিজের মধ্যে ডুবাইয়া রাখে। বস্তুতঃ সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে ঐ আনন্দের আর তুলনা নাই। শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু ও ক্ষুধা-তৃষ্ণা সাধককে আর অভিভূত

করিতে পারে না। তখন ক্ষোভ বা ভয় অথবা সকল প্রকার বিকার সাধকের হৃদয় হইতে অপসারিত হইয়া যায়—বস্তুতঃ সব বৃত্তিই তাহার থাকে, কিন্তু তাহার অধীনভাবে—দাসরূপে। সাধকের উপর উহাদের কোন প্রভুত্ব থাকে না। সাধক ইচ্ছা করিলে উহাদিগকে জাগাইয়া উহাদের সহিত খেলা করিতে পারে।

এই সময় ভক্ত ইচ্ছাময় এবং স্বতন্ত্র, অথচ নিত্য ভগবৎ-সঙ্গের সঙ্গী এবং তাঁহার ভাবে ভাবিত। তখন তাহার মধ্যে অতুলনীয় শক্তির বিকাশ হয়। যদিও ইহা প্রকাশের বিষয় নহে, তথাপি সাধক নিজেকে তখন ভগবানের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকর্ত্তৃত্বসম্পন্ন বলিয়া অনুভব করে। নিয়তির পারতন্ত্র্য অথবা অন্য কোন খণ্ডশক্তির অধীনতা তাহার আর থাকে না। তখন ভক্ত ভগবানের সঙ্গে সাম্যে প্রতিষ্ঠিত হয়।

(৭)

কিন্তু যদিও ভক্ত ভগবানের সমতা লাভ করে তথাপি ভক্ত বিশুদ্ধ অভিমানের দ্বারা নিজেকে দাস বলিয়া অভিমান করে, প্রভু বলিয়া করে না। তখন ভক্তের আত্মা ও ভগবানের আত্মা একই অভিন্ন আত্মস্বরূপে প্রকাশমান হয়। তথাপি ভক্ত ব্যবহার-ভূমিতে আরোপিত ভেদ বা আহার্য্যভেদ অবলম্বন করিয়া দাস-প্রভু ভাব অক্ষুণ্ণ রাখে। সাধক তখন এক অদ্বিতীয় নিত্যানন্দময় বস্তু, তাই নিজেকে সর্ব্বরসের আশ্রয় বলিয়া বুঝিতে পারে। এই অবস্থায় বিশুদ্ধ অদ্বৈতভূমিতে স্থিতি হয় বলিয়া যোগী ভক্ত ইচ্ছা করিলে নিজের আস্বাদ

নিজে গ্রহণ করিতে পারে। ইচ্ছা না করিলে যেমন আছে তেমনি থাকে। ইচ্ছার দিক্‌টা নিত্য এবং ইচ্ছা না করার দিক্‌টাও নিত্য, উভয়ই সমরূপে তখন স্থিত হয়।

যদি ইচ্ছার উদয় হয় তাহা হইলে ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে আত্মার হ্লাদিনী শক্তি প্রকট হন। ইনি আত্মার স্বরূপশক্তি, যাঁহার দ্বারা আত্মা নিজের আনন্দ নিজে আস্বাদন করেন। কৃষ্ণভক্তগণের পরিভাষাতে ইহারই নাম রাধা, রাম উপাসকগণের দৃষ্টিতে ইহার নাম সীতা। হ্লাদিনী যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রকট না হন ততক্ষণ ইচ্ছার উদয় হয় না। হ্লাদিনী প্রকট হইলে রমণের জন্য সাকার ও নিরাকার উভয় সত্তার যোগ হয়। সাকার ও নিরাকার যুক্ত না হইলে আত্মারাম অবস্থা লাভ হয় না। জ্যোতি অথবা পুরুষ নিরাকার, আধার অথবা প্রকৃতি সাকার। হ্লাদিনী শক্তির ক্রিয়া ব্যতীত পুরুষ ও প্রকৃতি পরস্পর মিলিত হইয়া আত্মারাম স্বরূপে স্থিতি লাভ করিতে পারে না। হ্লাদিনীর স্বভাব অত্যন্ত শীতল। ইহার ক্রিয়া সর্ব্ব প্রকার আনন্দের মূল প্রস্রবণ। এইবার হ্লাদিনী সহকারে পুরুষ-প্রকৃতির যোগের ফলে পূর্ণ আত্ম-স্বরূপে প্রতিষ্ঠা হইল। ইহাই যথার্থ অদ্বৈত অবস্থা, যাহার নামান্তর সচ্চিদানন্দ। পূর্ব্বে প্রাথমিক আত্মদর্শন প্রসঙ্গে যে আত্মার কথা বলা হইয়াছে তাহা প্রকৃতি-বিযুক্ত আত্মা বা রিক্ত আত্মা। এখন যে আত্ম-স্বরূপের কথা বলা হইল তাহা প্রকৃতি-যুক্ত আত্মা বা পূর্ণ আত্মা।

পূর্ণ আত্মা এক। যখন এই মূল এক স্বরূপে স্থিতি হয় তখন অভেদ অথবা অদ্বৈত স্থিতি বলা চলে—ইহা লীলাতীত

স্বরূপ-স্থিতি। ইহা পূর্ণ—পূর্ণ বলিয়াই অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ-নির্গমের ন্যায় স্বভাবতঃ ইহা হইতে ভেদের আবির্ভাব হইতে থাকে। ইহাই তাঁহার নিজ শক্তির খেলা। এই ভেদাংশের আবির্ভাব অভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই এক হিসাবে ইহাকে ভেদাভেদ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহাই নিত্য লীলার ধারা।

আর একটি ধারা আছে—এই ধারাতে নিজ স্বাতন্ত্র্যবলে অভেদ বা অদ্বৈত নিজেকে গোপন করিয়া দ্বিতীয় রূপে প্রকাশিত হন। এই ধারাতে অভেদভাব গুপ্ত অথবা বিস্মৃত থাকে বলিয়া এইটি সংসারের ধারাতে পরিগণিত হয়। পূর্ণ হইতে কলার আবির্ভাব হইয়া অহং-জ্ঞানের উদয় হয়। ইহাই দ্বৈত ধারার বা সংসার-ধারার মূল প্রসূতি। হ্লাদিনী শক্তি ষোড়শী-কলা-রূপা অমৃত-কলা, কিন্তু অহং-জ্ঞান ষোড়শী কলা হইতে হয় না—খণ্ড-কলা হইতে হয়। কারণ কলা যেখানে পূর্ণ সেখানে প্রকাশও পূর্ণ। প্রকাশ পূর্ণ বলিয়া সেখানে অহং-জ্ঞানের উদয় হয় না, অর্থাৎ অহংকার জন্মে না। যাহা আছে তাহা পরিপূর্ণ অহংভাব, অহংকার নহে। অহংকার থাকিলে তাহার প্রতিযোগিরূপে ইদং ভাবের সত্তা থাকে। অহংকার হইতে অজ্ঞান অথবা মোহ আবির্ভূত হইয়া পুরুষকে মোহিত করে ও জ্যোতিকে ঢাকিয়া ফেলে। তখন ঐ মোহগ্রস্ত পুরুষ কর্মাধীন হইয়া নিরন্তর চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে থাকে। তাহার পর সদ্‌গুরু-কৃপাতে তত্ত্বদর্শন হইলে সাধন-পথে চলিতে থাকে ও ক্রমশঃ সাধন-সম্পন্ন করিয়া প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উদয়ের পর সিদ্ধিলাভ করে ও অখণ্ড সুখের অধিকারী হয়।

(৮)

আনন্দের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিলে জানিতে পারা যায় যে সংক্ষিপ্তভাবে আনন্দকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে—প্রথমটি ব্রহ্মানন্দ, দ্বিতীয়টি ভজনানন্দ ও তৃতীয়টি জীবানন্দ। ব্রহ্মানন্দ অখণ্ড আনন্দ স্বরূপ, কিন্তু তাহাতে কোন আস্বাদন নাই; কারণ নিজেকে নিজ হইতে কিঞ্চিৎ বিভক্ত না করিলে আস্বাদন করা যায় না। জীবানন্দে আস্বাদন আছে, কিন্তু উহা পরিমিত ও বিনশ্বর। এই আনন্দের ক্রমিক বৃদ্ধি আছে, কিন্তু পরাকাষ্ঠা নাই। বস্তুতঃ এই আনন্দ স্বরূপ-দৃষ্টিতে ভোগানন্দ বলিয়া দুঃখেরই অন্তর্গত। আরোপ সাধকগণ বলেন, জীবানন্দ সর্ব্বদা হেয়, তাঁহাদের মতে ব্রহ্মানন্দও উপাদেয় নহে। তাঁহারা ভজনানন্দকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করেন। ব্রহ্মে লীন জীবের আনন্দ—আমের আঁটির সঙ্গে তুলনীয়, জীবানন্দ আমের ত্বক্ বা ছালের সহিত তুলনীয়, প্রকৃত রসাস্বাদন যাহা তাহা আঁটিতে নাই, ছালেও নাই, তাহা আছে উভয়ের মধ্যে। উহাই রসবস্তু। বুদ্ধিমান্ সাধক দুই প্রান্তের দুটিকে ত্যাগ করিয়া মধ্যের রসবস্তুটি গ্রহণ করেন। বস্তুতঃ বীজেও রস নাই, ছালেও নাই। ভজনানন্দ প্রেম—তাহাই আস্বাদনের বস্তু।

সাধক পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে পূর্ণ কলা সম্পন্ন হইয়া নিজেকে আস্বাদন করিবার জন্য নিজে অভিন্ন অখণ্ড স্বরূপে স্থিত থাকিয়াও নিজ হইতে নিজেকে ভিন্ন করিয়া লয়। তখন প্রভু চান দুইয়ে এক হইয়া এক-স্বরূপে স্থিত থাকিতে, কারণ বস্তুতঃ সত্তা ত একই; কিন্তু দাস প্রভুর সঙ্গে এক হইতে চায় না, সে জানে যে

যদিও উভয়ের সত্তা একই সত্তা তথাপি সে নিজে ভিন্ন থাকিয়া প্রতিক্ষণে উন্মেষ এবং নব নব সুখ যাঁহার দর্শন হইতে স্ফুরিত হয় তাঁহারই সাক্ষাৎকার চায়। সে স্বরূপতঃ সনাতন জানিয়াও প্রতিক্ষণে নব নব-নিত্য নবীন-আকাঙ্ক্ষা করে। সে ব্রহ্মে লীন হইতে চায় না, প্রভুর সহিত সমান হইতেও চায় না। সে যাহা চায় তাহা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের ভাষায় ইহাই—'সত্যপি ভেদাঽপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্।' তখন দাস-ভাব দাসী-ভাবে পরিণত হয়, সে দেখে এক অদ্বৈত পুরুষ—বাকী সব প্রকৃতি, দাসী। জীব ও অজীব সবই প্রকৃতি। সকল দেহে একই মাত্র পুরুষ বিরাজমান। দেহই প্রকৃতি। অথবা সে দেখে এক অখণ্ড অদ্বৈত মা বা মহাশক্তি, বাকী সবই তাঁহার সন্তান—শিব ও তাঁহার সন্তান, জীবও তাঁহার সন্তান। আসল কথা, সে দেখে যে একই অদ্বৈত আত্মা স্বয়ং বিরাজমান। তিনি এক হইয়াও অনন্তরূপে ও অনন্তভাবে নিজের সহিত নিজে খেলা করিতেছেন। এই একের মধ্যে তাঁহার সর্ব্বভেদের সমন্বয় হইয়া যায়। ইহাই আরোপ সাধনার চরম সিদ্ধি।

বাবা বিশুদ্ধানন্দ স্মৃতি

শ্রীঅমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত, এম-এ, বি-এল।

আমি পণ্ডিত নহি, সাধক নহি, এমন কি বাবার শিষ্যও নহি। কাজেই বাবার সম্বন্ধে কিছু বলিবার আমার অধিকার নাই। যদি পণ্ডিত হইতাম তবে অধ্যাত্মশাস্ত্র মন্থন করিয়া সূত্রাকারে লব্ধ বাবার তত্ত্বকথাগুলিকে কোন বিশিষ্ট চিন্তাধারার সহিত যুক্ত করিয়া সুধীসমাজে উপস্থিত করিতে পারিতাম। যদি অনুভূতি-সম্পন্ন সাধক হইতাম তবে হয়ত বাবার যে সকল বিভূতি প্রত্যক্ষ করিয়াছি উহার কোন্‌টি সাধন বা সিদ্ধির কোন অবস্থায় মুকুলিত হইয়া উঠে তাহা বিস্তার করিয়া বলিতে পারিতাম। যদি শিষ্য হইতাম তবে বাবার সম্বন্ধে কত কিছুই না বলিবার থাকিত! কারণ শিষ্যের জীবন সদ্‌গুরুর লীলানিকেতন। উহাকে পরমপদের যোগ্য করিয়া তুলিবার জন্য এখানে তাঁহার কতভাবেই না ভাঙ্গা-গড়ার কাজ চলিতে থাকে। যেহেতু উপর্য্যুক্ত কোন অধিকারেই আমি অধিকারী নহি এ অবস্থায় আমার পক্ষে বাবার সম্বন্ধে কিছু বলিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তবুও যে ঐ সম্বন্ধে কিছু বলিতে সাহসী হইয়াছি উহা শুধু কৃতজ্ঞ অন্তঃকরণের প্রেরণা হইতে। কারণ আমি শিষ্য না হইয়াও বাবার নিকট শিষ্যাধিক স্নেহ লাভ করিয়াছি, বিপদে অভয় পাইয়াছি, রোগ-যন্ত্রণায় বিভ্রান্ত হইয়া তাঁহার অযাচিত

করুণাপাতে নিরাময় হইয়া উঠিয়াছি। তাহা ছাড়া, সদ্গুরুর লীলাস্মরণেও নাকি মনের মলিনতা কাটিয়া যায়।

বাবার সহিত পরিচয় আমার দীর্ঘ দিনের নয়। তাঁহার মর্ত্ত্য-লীলা সম্বরণের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার দর্শনলাভের সৌভাগ্য আমার হয়। সেই সময় হইতে কখনও একযোগে দীর্ঘ সময়ের জন্য তাঁহার সঙ্গলাভ আমার হইয়া উঠে নাই। শারদীয় পূজাবকাশে ৺কাশীধামে এবং গ্রীষ্মের সময় কলিকাতায় কখনও কখনও বাবার দর্শনলাভ করিয়াছি। কলিকাতা হইতে ৺কাশীধামেই বাবার সঙ্গ বেশী পাইয়াছি এবং লক্ষ্য করিয়াছি যে ঐখানকার পরিবেশের মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য থাকিত যাহার জন্য বাবার লীলা-মাধুরী ঐখানে যেভাবে ফুটিয়া উঠিত তাহা অন্যত্র দেখা যাইত না। ৺কাশীধামের প্রতি বাবারও যে একটু পক্ষপাতিত্ব ছিল তাহা অনেক সময় তাঁহার বাক্যে এবং ব্যবহারে প্রকাশ হইয়া পড়িত। একবার আমি বাবাকে বলিয়াছিলাম, "বাবা, আপনার শরীর ত এখন একটু ভাল দেখিতেছি। কলিকাতায় যাহা দেখিয়াছিলাম উহা হইতে এখন অনেকটা ভাল।" বাবা বলিলেন, "কাশী যে মুক্তির স্থান, এখানে শরীর ভাল হইবে না ?"

কাশী এবং কলিকাতা উভয় স্থানেই বাবার নিকট লোক-সমাগম বেশ হইত, যদিও ইহাদের মধ্যে শিষ্যের সংখ্যাই বেশী থাকিত। এই সময় তিনি আমাদের সহিত যে সকল বাক্যালাপ করিতেন তাহাতে তত্ত্বালোচনার প্রাচুর্য্য দেখা যাইত না। আমাদের মধ্যে কেহ ঐ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেও বাবা উহার সংক্ষিপ্ত-

ভাবে উত্তর দিতেন। কারণ আমাদের অধিকাংশের নিকটেই যে তত্ত্বালোচনা কল্পনাবিলাস মাত্র তাহা বাবার অবিদিত ছিল না। সাধনবিমুখ মন তত্ত্বালোচনার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে অক্ষম। সেইজন্য উলুবনে মুক্তা ছড়াইবার উৎসাহ বাবার মধ্যে কখনও দেখা যাইত না। তিনি অনেক সময় বলিতেন, "যদি তত্ত্বালোচনা শুনিতে চাও তবে গোপীনাথের কাছে যাও, যদি কিছু প্রত্যক্ষ করিতে চাও তবে আমার কাছে এস।" কিন্তু তাই বলিয়া যে তিনি তত্ত্বালোচনা মোটেই করিতেন না একথা বলা যায় না। কারণ বাবার প্রধান শিষ্য "পরম পণ্ডিত এবং পরম জ্ঞানী" মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় যখন আসিতেন তখন বাবাকে তাঁহার সহিত তত্ত্বালোচনা করিতে দেখিয়াছি। কিন্তু ঐ সকল আলোচনার মর্ম্ম গ্রহণ করা সাধারণের পক্ষে দুরূহ ছিল। উহা এমনি সংক্ষিপ্তভাবে হইত যাহা শুনিয়া অনেক সময় মনে হইত যে উহা বোধ হয় কোন সাঙ্কেতিক ভাষার সাহায্যে নিষ্পন্ন হইতেছে। শব্দগুলি আমার কর্ণকুহরে পৌঁছিত সত্য, কিন্তু ঐখান হইতে মস্তিষ্কে প্রবেশের পথ না পাইয়া উহা কর্ণান্তর দিয়া নির্গত হইয়া যাইত। প্রাপ্তির দিক্ হইতে বিচার করিলে আমার কাছে উহাতে রিক্ততা বই আর কিছু মিলিত না। কিন্তু তাই বলিয়া তৃপ্তির দিক্ হইতে উহাকে শূন্যতাও বলা চলিত না। বিরাট্ এবং মহান্ কিছুর সম্মুখীন হইলে মন যেমন স্বতঃই হর্ষ ও বিস্ময়ে আপ্লুত হইয়া পড়ে, গুরু-শিষ্যের ঐ আলোচনাও আমাদের মধ্যে অনুরূপ ভাব সৃষ্টি করিত। একদিনের কথা বলিতেছি—অপরাহ্ন কাল।

বিজ্ঞান-মন্দিরের দোতলার বারান্দায় বাবার সম্মুখে আমরা বসিয়া আছি। গোপীবাবুও আমাদের মধ্যে আছেন। নানা কথা প্রসঙ্গে বাবা বলিলেন, "মানুষ কখনও ভগবান্ হইতে পারে না। গোপীনাথ, তুমি কি বল ?"

গোপীবাবু। সে ত সত্য কথা।

বাবা। 'সোঽহম্' কথাটাও দ্বৈত বোধক—সে ও আমি, দুই ত রহিয়া গেল।

গোপীবাবু। তাহা ত যথার্থ-ই।

ইহার পরই গুরু-শিষ্যের মধ্যে প্রকৃতি বিকৃতি ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা সুরু হইল যাহার একটি বর্ণও আমার বোধগম্য হ'ল না। আমি অবাক্ হইয়া গুরু-শিষ্যের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। মাঝে মাঝে উপস্থিত কাহারও কাহারও মুখের ভাবও লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। কিন্তু সর্ব্বত্রই লক্ষিত হইল প্রজ্ঞাহীন কুঞ্চিত দৃষ্টি রহস্য-উদ্‌ঘাটনের অবিসংবাদিত ব্যর্থতা।

যাহা হউক, কিছুক্ষণ ঐভাবে আলোচনা চলিলে পর বাবা ডাঃ শোভারামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শোভারাম, তুমি কি বল ?" ডাঃ শোভারাম এতক্ষণ বাবার শরীরের দিকেই তাকাইয়া ছিলেন। তিনি উত্তর করিলেন, "বাবা, আমি ত এতক্ষণ আপনার পেটই লক্ষ্য করিয়াছি।" উত্তর শুনিয়া আমরা সকলেই হাসিয়া উঠিলাম। বাবা হাসিয়া বলিলেন, "তোমার কথা শুনিয়া আমার একটা গল্প মনে পড়িতেছে—

—একবার দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে এক আফিমখোর প্রতিমা দর্শন করিতে গিয়া "আস্তীকস্য মুনের্মাতা" বলিয়া স্তব আরম্ভ করিল।

তাহাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া ঐখানকার লোকেরা তাহাকে বলিল, "বেটা, এত দেবদেবী উপস্থিত থাকিতে তুই সাপের স্তব করিতেছিস কেন?" সে উত্তর করিল, "তোমরা সকল বিষয় জান না বলিয়াই এইরূপ প্রশ্ন করিতেছ। যদি জানিতে তবে আর ওরূপ বলিতে না। তবে, শুন, আমি প্রকৃত ঘটনা বলিতেছি—গত রাত্রিতে আফিং খাইতে গিয়া দেখি যে কৌটাতে আফিং নাই বলিলেই চলে। যেটুকু ছিল উহা মুখে ফেলিয়া দিয়া ভাবিলাম যে এইবার কৈলাসে গিয়া কিছু সিদ্ধি যোগাড় করিয়া আনি। এই ভাবিয়া তখনই কৈলাসের পথে রওনা হইলাম। অনেক পরিশ্রমের পর কৈলাসে পৌঁছিয়া যখন কৈলাসপতির বাড়ীতে ঢুকিতে যাইতেছি তখন এক বিরাট্ পুরুষ আসিয়া আমার গলা টিপিয়া ধরিল এবং বলিল, "তুই কে? এখানে কি চাস্?" আমি অতি কষ্টে বলিলাম, "আমি সিদ্ধিখোর। এখানে একটু সিদ্ধির জন্য আসিয়াছি।" ইহা শুনিয়া সে আমার গলা ছাড়িয়া দিল এবং আমাকে বসিতে বলিল। পরে কতকগুলি সিদ্ধি আনিয়া আমাকে খাইতে দিল। সাহস পাইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কে?" সে উত্তর করিল, "আমি নন্দী।" নন্দীর সঙ্গে প্রাণ ভরিয়া সিদ্ধি খাইলাম। কিছুক্ষণ পর নন্দী চলিয়া গেলে আমি আবার বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিতেছি এমন সময় অন্য একজন আসিয়া আমাকে বাধা দিয়া আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। আমি নন্দীকে যাহা বলিয়াছিলাম তাহাকেও তাহাই বলিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে সে ভৃঙ্গী। ভৃঙ্গীর সহিতও

প্রচুর পরিমাণে সিদ্ধি ভক্ষণ করা হইল। পরে তাহাকে অনুনয় করিয়া বলিলাম, "ভাই, এত দূর দেশ হইতে এত কষ্ট স্বীকার করিয়া কৈলাসে আসিলাম, একবার মা বাবাকে কি দেখিতে পাইব না ? তুমি দয়া করিয়া একবার তাঁহাদের সহিত আমার দেখা করাইয়া দাও না ?" ভৃঙ্গী বলিল, "বাড়ীর ভিতরে বড় গণ্ডগোল ! আচ্ছা, তুমি সাবধানে আমার সঙ্গে এস। দূর হইতেই বাবাকে দেখিয়া চলিয়া যাইও। সাবধান, কাছে যাইতে চেষ্টা করিও না। "যে আজ্ঞা" বলিয়া আমি তাহার সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম। একটি কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া বাবা ও মাকে দেখিলাম এবং তাঁহাদের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা হইতেছিল তাহাও শুনিতে পাইলাম। বাবা মাকে বলিতেছিলেন "এবার পূজায় তুমি বাংলাদেশে যাও।" মা বলিলেন, "তাহা হয় কেমন করিয়া ? আমাকে যে ঐ সময় ইন্দ্রালয়ে যাইতে হইবে।" বাবা তখন কার্ত্তিক, গণেশ প্রভৃতিকে একে একে বাংলাদেশে গিয়া পূজা গ্রহণ করিতে বলিলেন ; কিন্তু সকলেই একটা না একটা ওজর দেখাইয়া অস্বীকার করিলেন। শেষে বাবা সাপকে বলিলেন, "তবে, বাপু, তুমিই যাও।" সাপ বলিল, "আমি আপনার ভৃত্য। আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য। এবার পূজায় আমিই বাংলাদেশে যাইব।" এই কথা শুনিয়া আমি কৈলাস হইতে চলিয়া আসিলাম। এখন বুঝিলে ত এবার পূজায় দেবদেবী কেহই আসেন নাই, আসিয়াছে শুধু সাপ। সেইজন্যই ত আমার এই স্তব।"—

এই গল্প বলিয়া বাবা বলিলেন, "আমাদের এত ভাল ভাল

কথা হইল শোভারাম তাহা কিছুই লক্ষ্য করিল না, সে লক্ষ্য করিল শুধু আমার পেট!”

বাবার কথা শুনিয়া আমরা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম।

তত্ত্বালোচনার দিক্ হইতে বাবা আমাদিগকে বিশদভাবে কিছু না বলিলেও আমাদের পক্ষে যাহা একান্ত প্রয়োজনীয় সে সম্বন্ধে তিনি সর্ব্বদাই আমাদিগকে উপদেশ দিতেন। অধ্যাত্মজীবন লাভ করিতে হইলে সরলতা, সত্যনিষ্ঠা এবং পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির যে একান্ত প্রয়োজন তাহা তিনি আমাদিগকে একাধিকবার বলিয়াছেন। এবং নিজ জীবনের ঘটনা হইতে দৃষ্টান্ত আহরণ করিয়া আমাদিগকে ঐ পথে চলিতে উৎসাহিত করিতেন।

বাবার মাতৃভক্তি একটি দর্শনীয় বস্তু ছিল। কাশীর বিজ্ঞান-মন্দিরের হল ঘরে যখনই তিনি প্রবেশ করিতেন তখন ঐখানে দেওয়ালের গাত্রে রক্ষিত মায়ের প্রতিমূর্ত্তিকে প্রণাম না করিয়া কখনও আসন গ্রহণ করিতেন না। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, “জগতে যদি কোন নিঃস্বার্থ ভালবাসা থাকে তবে উহা মায়ের। অন্য সকলের ভালবাসার মধ্যে অল্পাধিক স্বার্থগন্ধ আছে; কিন্তু মায়ের স্নেহ একেবারেই বিশুদ্ধ।” তিনি নিজ জননীর কথা বলিতে বলিতে একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, “ছোটবেলা হইতেই আমি মাকে ভক্তি করিতাম। দেবদেবীকে আমি বড় গ্রাহ্য করিতাম না, কারণ সব ছিল আমার মা। মা যখনই যাহা করিতে বলিতেন আমি উহা নির্ব্বিচারে পালন করিতাম। জীবনে একদিন মাত্র মাকে উপদেশ দিতে গিয়াছিলাম—একবার

একটি লোককে মা কিছু টাকা ধার দিতে যাইতেছিলেন। উহা দেখিয়া আমি বলিয়াছিলাম, "মা, ইহাকে টাকা ধার দিলে টাকাগুলিই নষ্ট হইবে। কারণ ধার শোধ করিবার উহার সামর্থ্য নাই।" মা কিন্তু আমার কথা গ্রাহ্য না করিয়াই লোকটিকে টাকা ধার দিলেন। উহা দেখিয়া এবং মাকে অযাচিতভাবে উপদেশ দিয়াছি বলিয়া আমার বড় অনুতাপ হইল। আমি উহা সহ্য করিতে না পারিয়া মায়ের চরণে পড়িয়া বলিলাম, "মা, আমার বড় অপরাধ হইয়াছে। আমি তোমার কার্য্যে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছি, তোমাকে উপদেশ দিতে গিয়াছি। তুমি আমাকে শাস্তি দাও। তাহা না হইলে আমার দুঃখ যাইবে না, আমার মনও প্রবোধ মানিবে না।" মা আমার কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, চান্দ্রায়ণ কর।" আমিও ঐ প্রায়শ্চিত্ত করিলাম। ইহার পর আর কখনও মাকে উপদেশ দিতে যাই নাই। নির্ব্বিচারে তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়াছি এবং দেখিয়াছি যে উহাই সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলজনক। যে লোকটিকে মা টাকা ধার দিয়াছিলেন কিছুদিন পর সে অনেক জিনিষ-পত্র আনিয়া ধার শোধ করিয়া গেল। মা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, তোর টাকায় কত জিনিষ আসিয়াছে।"

সরলতা এবং সত্যনিষ্ঠার কথা বলিতে গিয়া একদিন বাবা বলিয়াছিলেন, "পূর্ব্বে আমি (মহাকবি) কালিদাস অপেক্ষা কম বোকা ছিলাম না। কালিদাস যে ডালে বসিয়াছিল সেই ডালই কাটিতে গিয়া নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়াছিল। আমি কিন্তু উহা হইতে এক ডিগ্রী উপরে উঠিয়াছিলাম। একবার

আমরা কয়েকজন সন্ন্যাসী বিন্ধ্যাচলে ছিলাম। একদিন দেখিতে পাইলাম যে পাহাড়ের উপরে একটি আমগাছে একটি মাত্র আম পাকিয়া আছে। আমাদের সকলের দৃষ্টিই ঐ আমটির উপর,—উহা হস্তগত করিবার জন্য আমরা দৌড়াইয়া গিয়া গাছে উঠিলাম। সকলের আগে আমটি দখল করিবার জন্য আমি অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া ডাল হইতে লাফাইয়া গিয়া আমটি ধরিলাম। ফল যাহা হইল তাহা ত' সহজেই অনুমেয়। হাতের আম হাতেই রহিল। আমি উঁচু পাহাড় হইতে একেবারে ভূমিসাৎ হইলাম। পড়িবার সময় কিছুক্ষণ জ্ঞান ছিল, পরে আর জ্ঞান ছিল না। যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল তখন দেখিতে পাইলাম যে দাদা গুরুদেব (শ্রীমৎ ভৃগুরাম স্বামী) আমাকে শূন্যমার্গে বিন্ধ্যাচলের পাহাড়ের উপর লইয়া যাইতেছেন। দাদা গুরুদেবকে দেখিয়া একটু ভয় হইল। তিনি আমাকে ঐখানে বসাইয়া মূর্খ বলিয়া গালি দিলেন। মূর্খ যে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? কাজেই চুপ করিয়া রহিলাম। তিনি আমাকে আমটি খাইতে বলিলেন। আমি প্রথমে অস্বীকার করিলাম। তিনি বলিলেন, "ঐ আমের জন্যই ত এত কাণ্ড! উহা খাইয়া ফেল।" আমি তাহাই করিলাম। পাহাড় হইতে পতনের ফলে আমার গা এবং উরুদেশের অনেক স্থান কাটিয়া গিয়াছিল। উহাতে লাগাইবার জন্য তিনি আমাকে ঔষধ দিয়া বলিলেন, "বল্, এরূপ কাজ আর কখনও করিবি না।" আমি বলিলাম, "কেন করিব না? আমি আরও করিব।" তিনি অবাক্ হইয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহাকে

ঐভাবে তাকাইয়া থাকিতে দেখিয়া আমি বলিলাম, "আমি ঐরূপ কাজ কেন করিব না? আমার হইয়াছে কি? তুমি থাকিতে আমার ভয় কিসের?" দাদা গুরুদেব সন্তুষ্ট হইয়া আমার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন।"

দাদা গুরুদেবের স্নেহের কথা বলিতে বলিতে বাবা আবার বলিতে লাগিলেন, "ছোটবেলা হইতেই সত্যের প্রতি আমার অনুরাগ ছিল। মিথ্যা কথা আমি বলিতে পারিতাম না। সেইজন্য দাদা গুরুদেব আমাকে খুব স্নেহ করিতেন। জ্ঞানগঞ্জে একদিন স্নান করিতে যাইতেছি, সেই সময় একটি কুমারীকে স্নান করিতে দেখিয়া আমার চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। আমি আর স্নান না করিয়া তখনই দাদা গুরুদেবের নিকট চলিয়া গেলাম। তিনি আমাকে অসময়ে আসিতে দেখিয়া একটু হাসিলেন। আমি কোনরূপ ভূমিকা না করিয়া গম্ভীরভাবে আমার মনের শোচনীয় অবস্থা তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিয়া বলিলাম, "হয় আমাকে এই পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করুন, না হয় আমাকে আশ্রম হইতে তাড়াইয়া দিন। আমার মত লোক এখানে থাকিবার উপযুক্ত নয়।" দাদা গুরুদেব হাসি-হাসি মুখে বলিলেন, "আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি আজ হইতে তোমার কাম-ভাব আর জাগিবে না। যদি জাগে তবে জগৎ ধ্বংস হইবে।" ইহা বলিয়া তিনি আমাকে একটি প্রক্রিয়া দেখাইয়া দিলেন এবং উহা অভ্যাস করিতে বলিলেন। দাদা গুরুদেবের শক্তির তুলনা নাই। দেবতারাও তাঁহার ভয়ে কম্পিত।"

দিব্যজীবন লাভের পক্ষে খাদ্যাখাদ্যের বিচার যে প্রয়োজনীয়

তাহাও বাবা আমাদিগকে বলিতেন। তিনি সৎসঙ্গের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিতেন। আহার নিদ্রা হ্রাস করিতে উপদেশ দিতেন। বাবা বলিতেন, "কর্ম্ম না করিলে ফল হয় না। সাধন বিষয়ে যে যত কর্ম্ম করিবে সে তত শীঘ্র শীঘ্র ফল পাইবে। তবে সর্ব্ব প্রথম চাই চরিত্র। চরিত্র ভাল না থাকিলে কিছুতেই কিছু হইবার নয়। অল্পাহার অল্পনিদ্রা ভাল। ক্রিয়া করিতে করিতে উভয়ই হইয়া যায়। সর্ব্বদা ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে না পারিলে শান্তি কোথায়? আর ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া থাকিলে শান্তি অবধারিত।"

গল্পচ্ছলে বাবা আমাদের সাধন-বিমুখতা ও উৎসাহ-শূন্যতার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেন। একদিন বাবা এই গল্পটি বলিলেন—"এক বৃদ্ধা বিধবা ছিল। তাহার অগাধ ধনসম্পত্তি। সে উহা লইয়াই দিবারাত্র মত্ত থাকিত এবং ঐ জন্য রাত্রিতেও তাহার ঘুম হইত না। নিদ্রার অভাবে তাহার দেহ দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল এবং মেজাজটিও রুক্ষ হইতে লাগিল। এইজন্য কি আত্মীয়, কি অনাত্মীয় সকলকেই সে জ্বালাতন করিতে লাগিল। যাহাতে ঘুম হয় তাহার জন্য চিকিৎসা ও ঔষধ-পত্র কত কিছু করিল, কিন্তু সবই ব্যর্থ হইল। নিদ্রার অভাবে সে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। ইহা দেখিয়া তাহার এক আত্মীয় একদিন তাহাকে একটি জপের মালা দিয়া বলিল, "তুমি সকালে এবং সন্ধ্যাবেলায় ভগবানের নাম করিয়া এই মালা জপ করিও। ইহাতে তুমি মনে শান্তি পাইবে এবং তোমার শরীরও সুস্থ হইয়া উঠিবে।" ঐ আত্মীয়ের কথামত বৃদ্ধা

একদিন সন্ধ্যাবেলা জপের মালা লইয়া নাম করিতে বসিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে এতদিন শত চেষ্টা করিয়াও ঘুমাইতে পারে নাই, সে ঐ দিন মালা জপ আরম্ভ করা মাত্র নিদ্রায় ঢলিয়া পড়িল। ইহার পর হইতে যখনই সে নিদ্রার অভাব বোধ করিত তখনই চীৎকার করিয়া বলিত, "ওরে, আমার ঘুমের মালাটা নিয়ে আয় ত।" এই গল্প বলিয়া বাবা আমাদিগকে বলিলেন, "তোমাদের অবস্থাও ঐ বৃদ্ধার মত। সংসারের যাবতীয় কাজ করিতে তোমাদের ক্লান্তি নাই, যেই নাম জপের সময় আসিল আর অমনি তোমরা অবসন্ন হইয়া পড়িলে।" এই গল্প শুনিয়া আমরা সকলেই খুব হাসিতে লাগিলাম। বাবাও আমাদের সঙ্গে হাসিতে লাগিলেন।

কোন কোন শিষ্যের দুর্ব্বলতা লইয়াও বাবা মাঝে মাঝে হাসি তামাসা করিতেন। কিন্তু উহাও এমনভাবে করিতেন যে সেজন্য শিষ্যেরা মনঃক্ষুণ্ণ ত হইতই না, বরং তাঁহাদের বিষয় লইয়া বাবা আমোদ করিতেছেন দেখিয়া তাহারাও পরম আনন্দ লাভ করিত। ব্রহ্মপদ নামে বাবার এক শিষ্য আছেন। তিনি আশ্রমের বিগ্রহাদির সেবাপূজা করিয়া থাকেন। একদিন তাঁহার সম্বন্ধে বাবা আমাদিগকে বলিলেন, "ব্রহ্মপদ দধি খাইতে ভয় পায়, কারণ উহা নাকি তাহার সহ্য হয় না। একদিন লোভে পড়িয়া সে কিছু দধি খাইয়াছিল। খাইয়াই তাহার ভয় হইল পাছে তাহার কোন অসুখ হয়। তখন সে এক গ্লাস জল খাইয়া নিজের ঘরে গিয়া লাফাইতে আরম্ভ করিল। তাহাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া পরমেশ্বর (চাকর) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি একি

করিতেছেন ?" ব্রহ্মপদ উত্তর করিল, "আমি পেটের দধি ঘোল করিতেছি।"

"আর একদিন দেখি ব্রহ্মপদ বাগানের ফুলগাছের চারাগুলি একবার টানিয়া তুলিতেছে, আবার তখনই ঐগুলিকে মাটিতে পুতিয়া রাখিতেছে। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কি করিতেছ ?" সে বলিল, "বাবা, গাছগুলি তুলিয়া দেখিতেছি যে ঐগুলি মাটিতে লাগিল কি না।"

"কখন কখন দেখা যায় যে, সে দেওয়ালের সঙ্গে তাহার মাথা ঠুকিতেছে। তাহাকে যদি উহার কারণ জিজ্ঞাসা করা যায় তবে সে বলে, "মাঝে মাঝে আমার শ্বাসবন্ধ হইয়া যায়, তাই মাথা ঠুকিয়া আমি আবার উহাকে চালাইয়া দেই।"

"এই সকল ছিল ব্রহ্মপদের কীর্ত্তি। ইহাদের লইয়া আমাকে ঘর করিতে হয়। উহার বুদ্ধি ঐরূপ হইলেও ও কিন্তু খুব সত্যবাদী। প্রাণান্তেও মিথ্যা কথা বলে না।"

তত্ত্বালোচনা, উপদেশ এবং হাসি তামাসা ব্যতীত বাবার দরবারে কখনও কখনও রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিষয়ের আলোচনাও হইত এবং উহা উপলক্ষ্য করিয়া বাবা মাঝে মাঝে এমন সব অভিমত ব্যক্ত করিতেন যেগুলিকে আমরা ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়াই ধরিয়া লইতাম এবং পরবর্ত্তীকালে দেখিয়াছি যে ঐ বাণীগুলি অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছে।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের কথা বলিতেছি। তখন ইতালী সবেমাত্র আবিসিনিয়া আক্রমণ করিয়াছে। ঐ সংবাদ পত্রিকায় পাঠ করিয়া আমি বাবাকে বলিলাম, "বাবা, দুই বৎসর পূর্ব্বে আপনি

বলিয়াছিলেন যে একটি যুদ্ধ বাধিলে মন্দ হইত না। এখন ত সত্যি সত্যি যুদ্ধ বাধিয়া গেল।”

বাবা। এ কিছু নয়। একটি বড় যুদ্ধ আসিতেছে উহাতে ইংরেজেরাও জড়াইয়া পড়িবে।

আমি। এ ত’ বড় ভয়ের কথা! আমরাও ত’ উহাতে জড়াইয়া পড়িব না?

বাবা। না, উহার একটু বিলম্ব আছে। ইংরেজেরা মিথ্যা কথা বলিয়া আমাদিগকে আবার ঠকাইতে চেষ্টা করিবে, কিন্তু পারিবে না।

পাঁচ বৎসর পর যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল তখন ঐ যুদ্ধে কংগ্রেসের সহানুভূতি ও সাহায্য লাভের জন্য ক্রিপ্‌স্‌ সাহেব যে সকল প্রস্তাব লইয়া ভারতে আসিয়াছিলেন এবং উহার ফলাফল যাহা হইয়াছিল তাহা এখন সকলেরই সুবিদিত। কিন্তু এইরূপ যে হইবে তাহা বাবা ঐ ঘটনার ৬।৭ বৎসর পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছিলেন।

কখনও কখনও সামাজিক দুর্নীতির কথাও উঠিত। সমাজ এবং ধর্ম্মক্ষেত্রে দুর্নীতির প্রাবল্য দেখিয়া আমরা হতাশভাবে বাবার দৃষ্টি ঐদিকে আকর্ষণ করিলে তিনি বেশ দৃঢ়তার সহিত বলিতেন, “চিন্তার কোন কারণ নাই। ধীরে ধীরে আমরা মঙ্গলের দিকেই চলিয়াছি। হিন্দুধর্ম্ম লোপ পাইবার নয়। যাহারা ইহার বিনাশ সাধনের চেষ্টা করিবে তাহাদেরই সর্ব্বনাশ হইবে।” মনে হয় আমাদের রাষ্ট্রনায়কগণ বাবার এই কথাগুলির প্রতি যদি একটু অবহিত হইতেন তবে হয়ত তাঁহাদের মঙ্গলই হইত।

রসালাপ ব্যতীত যাহা দ্বারা জনসাধারণ বাবার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইত তাহা হইল বাবার বিভূতির খেলা। অনেকে শুধু ইহা দেখিতেই বাবার কাছে যাতায়াত করিতেন এবং বাবাও এই সব দেখাইতে কার্পণ্য করিতেন না। লোকের অনুরোধ উপরোধ ব্যতীতও বাবা অনেক সময় নিজের খেয়ালবশতঃ আমাদিগকে এই সকল দেখাইয়াছেন। অনেক সময় হাসি-তামাসার ভাবেও আমাদিগকে দুই একটি বিভূতি দেখাইয়াছেন। একদিন সকাল বেলা কাশীর আশ্রমে গিয়া দেখি যে বাবা আশ্রমের ফুলবাগানটির চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। ইহাই ছিল তাঁহার নিত্যকর্ম্ম। অতি প্রত্যূষে তিনি মোটরগাড়ীতে কিছুক্ষণ বেড়াইয়া আসিয়া আশ্রমের বাগানটি নয়বার প্রদক্ষিণ করিতেন। বাবা বলিতেন, "এই বাগানটির চারিদিকে নয়বার ঘুরিলেই এক মাইল হয়।" যাহা হউক, বাবাকে ঐভাবে বেড়াইতে দেখিয়া আমরাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে লাগিলাম। ঐ বাগানে কতকগুলি মোরগ ফুলের গাছ ছিল এবং উহার ফুলগুলি ফুটিয়া বাগানখানি যেন আলোকিত করিয়া রাখিয়াছিল। উহা দেখিয়া আমাদের মধ্যে একজন বলিলেন, "ফুলগুলি দেখিতে বেশ, কিন্তু ইহার গন্ধ নাই।" এই কথা শুনিয়া বাবা অমনি আমাদের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "কি বলিলে? আশ্রমের ফুলের গন্ধ নাই?" এই বলিয়া তিনি একটি মোরগ ফুল তুলিয়া উহাকে একবার মাত্র চক্রাকারে আবর্ত্তিত করিয়া আমাদের হাতে দিয়া বলিলেন, "দেখ দেখি গন্ধ আছে কি না।" আমরা আঘ্রাণ করিয়া দেখিলাম যে উহা হইতে অপূর্ব্ব গন্ধ নির্গত

হইতেছে। ইহা যে শুধু বাবার বিভূতির জন্যই তাহা আমাদের বুঝিতে ক্ষণমাত্রও বিলম্ব হইল না।

বাবার বিভূতির অনেক খেলাই দেখিয়াছি। অনেকেই উহা দেখিয়াছেন। কাজেই উহা আর উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাই না। তবে এই বিভূতির খেলাগুলি বাবা যেভাবে দেখাইতেন এবং উহা যেরূপ বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল তাহা দেখিয়া মনে হইত যে সর্ব্বশক্তিময়ী প্রকৃতি বাবার যে কোন আদেশ পালন করিবার জন্য যেন অনুগতা দাসীর মত সর্ব্বদা তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিতেন।

আমরা যাহা কিছু বাবাকে সৃষ্টি করিতে দেখিয়াছি উহা সমস্তই যে বাবা যোগবলে করিতেন একথা বাবা স্বীকার করিতেন না। সূর্য্য বিজ্ঞান, বায়ু বিজ্ঞান, শব্দ বিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানের নাম করিয়া বলিতেন যে তিনি অধিকাংশ সৃষ্টিই ঐগুলির সাহায্যে করিয়া থাকেন। কিন্তু এই সকল বিজ্ঞান হইতে যোগ-বিভূতি কত দূর তাহা নির্ণয় করা আমাদের সাধ্যাতীত। একদিন বায়ু বিজ্ঞানের সাহায্যে বাবা কর্পূর তৈয়ার করিয়া আমাদিগকে দিলেন। দেখিলাম বাবা তাঁহার দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীটি দুই একবার সর্পগতিতে ঊর্দ্ধগতিতে সঞ্চালন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই উহার অগ্রভাগে শিশিরবিন্দুর মত স্বচ্ছ একটি বিন্দুর আবির্ভাব হইল। ধীরে ধীরে উহার কলেবর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পরে দেখা গেল যে একখণ্ড কর্পূর বাবার তর্জ্জনীর অগ্রভাগে লাগিয়া আছে। বাবা আমাদিগকে উহা দেখাইয়া বলিলেন, "জগতের এমন কোন শক্তি নাই যাহা এই কর্পূরের টুকরাটিকে আমার

অঙ্গুলী হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে।" এই বলিয়া তিনি বারবার সজোরে অঙ্গুলীটি ঝাড়া দিতে লাগিলেন, কিন্তু কর্পূরের টুকরাটি স্থানচ্যুত হইল না। শেষে বাবা নিজেই উহা তুলিয়া আমাদিগকে দিলেন। আমরা প্রসাদ জ্ঞানে সকলেই উহা একটু একটু করিয়া ভাগ করিয়া নিলাম। বাজারের কর্পূর হইতে যে ইহা কত উৎকৃষ্ট তাহা বলাই বাহুল্য।

এই সকল বিভূতি সম্বন্ধে বাবা আমাদিগকে একদিন বলিয়াছিলেন, "ছোটবেলা আমি বিভূতির কথা বিশ্বাস করিতাম না। ঐ সম্বন্ধে শাস্ত্রে যাহা লেখা আছে ঐগুলিকে গালগল্প বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু জ্ঞানগঞ্জে গিয়া দেখি যে সেখানে সবই অন্যরূপ! উহা যেন এক মায়াপুরী। ঐখানে যে কি হয় এবং কি হয় না তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ঐ সকল শক্তির খেলা দেখিয়া উহা আয়ত্ত করিবার জন্য আমার দৃঢ়সঙ্কল্প হইল। যখন ঐ সকল শক্তি লাভ হইল তখন উহা লোকদিগকে দেখাইবার খুব ঝোঁক ছিল এবং দেখাইয়াছিও অনেক কিছু, যেন উহা দেখিয়া তাহাদের বিশ্বাস হয় যে আমাদের শাস্ত্র অভ্রান্ত। কিন্তু এখন আর কিছু দেখাইতে ইচ্ছা হয় না। মনে হয় ইহাতে লাভ কি?" আমাদের ভিতরে অজ্ঞান ও অবিশ্বাসের দুর্ভেদ্য প্রাচীর লক্ষ্য করিয়াই বাবা শেষ কথাটি বলিলেন কি না তাহা কে জানে?

শিষ্যদের মধ্যে কেহ কোন বিভূতি দেখিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলে বাবা তাহাকে কুমারী পূজার সর্ত্তে আবদ্ধ করিয়া তবে বিভূতি দেখাইতেন। ইহা দেখিয়া আমি বাবাকে জিজ্ঞাসা

করিয়াছিলাম, "বাবা, এই সকল বিভূতি দেখাইলে কুমারী পূজা করিতে হয় কেন ?"

বাবা। এ সব দেখাইলে আমার অপরাধ হয়।

আমি। বাবা, আপনার আবার অপরাধ !

বাবা। অপরাধ বই কি ? যাহারা বিশুদ্ধ বস্তু দেখিতে অধিকারী নয় আমি তাহাদিগকে উহা দেখাইতেছি। ইহাই আমার অপরাধ। হাতীর বোঝা ছাগলের ঘাড়ে চাপান অপরাধ বই আর কি ? তাহা ছাড়া যাহারা এই সকল বিভূতি দেখে তাহাদেরও অনিষ্ট হয়। এই সকল দূর করিবার জন্য আমি সমস্তই ভগবতীর ঘাড়ে চাপাইয়া দেই। তিনিই সমস্ত দোষ কাটাইয়া দেন।

এ পর্য্যন্ত বাবার সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছি উহা সমস্তই বাহ্য। এগুলি বিশেষ হইলেও ইহা দ্বারা বাবার মহত্ত্ব সূচিত হয় না। যে যাদুবলে তিনি সকলের হৃদয় জয় করিয়া সেখানে রাজরাজেশ্বররূপে বিরাজ করিতেন তাহা হইল তাঁহার পারাপার-হীন অহৈতুকী কৃপা। এখানে তিনি ধনী-নির্ধন, উচ্চ-নীচ, পাপী-পুণ্যাত্মা কিছুই বিচার করিতেন না। লোকের দুঃখ দেখিলে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইয়া যাইত এবং তিনি তাঁহার অলৌকিক শক্তি প্রভাবে ঐগুলিকে যথাসম্ভব হ্রাস করিয়া উহাদিগকে সহন-যোগ্য করিয়া দিতেন। অসহায় হইয়া কেহ তাঁহার মুখপানে তাকাইলে তাহাকে বঞ্চিত হইতে হইত না। বাবার শেষ জীবনটা এইভাবে শিষ্যদের ভোগ গ্রহণ করিয়াই কাটিয়াছে এবং শেষে কোন শিষ্যের কল্যাণে নিজকে আহুতি দিয়া তাঁহার মর্ত্ত্যলীলা

পরিসমাপ্ত করিয়াছেন। ভগবানের কৃপা শক্তিকেই নাকি গুরু বলা হয়। বাবা ছিলেন পরমকারুণিক। তাই একদিন বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "বাবা, কৃপার ভাব বেশী না থাকিলে নাকি গুরু হওয়া যায় না ?"

বাবা। গুরু অর্থ হইতেছে যিনি গুরু ভার গ্রহণ করিতে পারেন। শিষ্যকে শোষণ করা ত গুরুর কাজ নয়।

আর একদিন বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "বাবা, শিষ্যের সহিত আপনার সম্বন্ধ কি ?"

বাবা। পিতা-পুত্র।

আমি। এ সম্বন্ধ কি আপনি যতদিন দেহে আছেন ততদিন থাকিবে, না ইহার পরেও থাকিবে ?

বাবা। ইহা জন্ম-জন্মান্তরে থাকিবে। এ সম্বন্ধ শেষ হইবার নয়।

আমি। বাবা, আপনি ত কলিকাতায় আমাকে এ সম্বন্ধে অন্যরূপ বলিয়াছিলেন। আমি যখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে আপনার যে সকল শিষ্য এ জন্মে মুক্ত হইবে না তাহারা কি পর-জন্মেও আপনার কৃপা পাইবে ? উত্তরে আপনি বলিয়াছিলেন, "আমার কি আবার জন্ম হইবে যে পর জন্মে কৃপা পাইবে ?"

বাবা। সে ত সত্যি কথা। শিষ্যকে আবার জন্মে জন্মে কৃপা করিতে হইবে কেন ? চন্দ্র সূর্য্যকে কি রোজ রোজ চালাইয়া দিতে হয় ? একবার মাত্র তাহাদিগকে চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাতেই তাহারা চলিতেছে। সেইরূপ শিষ্যের সঙ্গে যে সম্বন্ধ

হইয়াছে তাহা চিরকাল থাকিবে। এ যে তুলার আগুন, নিভিবার নয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমি বাবার শিষ্য নহি। তবু কত ভাবে যে আমি তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিয়াছি তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। একবার পূজার সময় আমি সস্ত্রীক কাশী গিয়াছি। সেই সময় আমার শ্বাশুড়ী কলিকাতায় খুব পীড়িতা ছিলেন। হঠাৎ একদিন টেলিগ্রাম পাইলাম যে তাঁহার অবস্থা সঙ্গীন। আমি যেন অবিলম্বে স্ত্রীসহ কলিকাতা চলিয়া আসি। যে সময় এই সংবাদ আসিল তখন আমার পক্ষে কাশী ত্যাগ করা খুবই অসুবিধাজনক। একবার ভাবিলাম যে বাবাকে গিয়া বলি যে তিনি যেন কৃপা করিয়া শ্বশ্রূমাতাকে আরও কিছু দিন বাঁচাইয়া রাখেন। কিন্তু ঐ কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে সাহস হইল না। এ জাতীয় প্রার্থনা করা সমীচীন কি না সে সম্বন্ধেও সন্দেহ জাগিল। কিন্তু বিপদে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান থাকে না। রজনী ভর মনে মনে বাবার নিকট প্রার্থনা চলিতে লাগিল। ভাবিলাম বাবা ত অন্তর্যামী, তিনি অবশ্যই ইহা শুনিতেছেন। পরদিন বিকালে আশ্রমে গেলাম। দেখিলাম বাবার সম্মুখে এক ঘর লোক বসিয়া আছেন। আমিও তাঁহাদের মধ্যে এক কোণে একটু স্থান করিয়া নিলাম। নানা প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল। ইহার মধ্যে হঠাৎ বাবা আমার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "দেখ হে, আয়ু শেষ হইলে আর রাখা যায় না। চেষ্টা করিলে বড় জোর তিন চারি মাস রাখা যাইতে পারে।" বাবার কথাগুলি এতই অপ্রাসঙ্গিক ছিল যে ইহার অর্থ কেহই বুঝিতে পারিল না।

কিন্তু উহা লক্ষ্য স্থানে আসিয়া পৌঁছিল। আমি সেইদিনই কলিকাতা টেলিগ্রাম করিয়া জানিতে চাহিলাম যে অবস্থা কিরূপ? উত্তর আসিল, কিছু ভাল। ইহার প্রায় এক সপ্তাহ পরে কলিকাতা গিয়া শ্বাশুড়ীকে পূর্ব্বাপেক্ষা একটু ভালই দেখিলাম। কিন্তু তিনি আর সুস্থ হইয়া উঠিলেন না। যেদিন তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পাইলাম, সেদিন হিসাব করিয়া দেখিলাম যে পূর্ব্বোক্ত ঘটনার প্রায় চার মাস পর তাঁহার দেহত্যাগ হইল। যে পরমায়ুটুকু তিনি ভোগ করিয়া গেলেন তাহা বাবার কৃপার জন্যই কি না তাহা কে বলিবে?

আর এক সময়ের কথা বলিতেছি—ঢাকায় তখন হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা চলিতেছিল। অবশ্য এই দাঙ্গাগুলি ইংরেজ শাসকদের প্ররোচনায় এবং আনুকূল্যে সৃষ্ট ও পুষ্ট হইত এবং এইগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে নির্ম্মূল করা। কিছু দিন দাঙ্গা চলিবার পর উহা দমন করিবার অজুহাতে সরকার ঢাকায় গোরা সৈন্য আমদানী করিলেন। আমরা সকলেই বুঝিলাম যে ইহার উদ্দেশ্য দাঙ্গা দমন নয়, হিন্দুকে নিগ্রহ করা, কারণ ঐ জাতীয় দাঙ্গা নিবারণের জন্য আর সৈন্যের দরকার হয় না। গোরা সৈন্যদের ছাউনি পড়িল আমার বাসা হইতে অনতিদূরে, প্রায় ৫০০ গজের মধ্যে। ইহাতে আমি বিপদ গণিলাম; কারণ আমার বাসা ছিল সহরের এক জন-বিরল অঞ্চলে। এই সময় আমি কলিকাতা ছিলাম। ভাবিলাম ঢাকা ফিরিয়া গিয়া আর ঐ বাসায় উঠিব না। সৈন্যাবাস হইতে যতদূর সম্ভব দূরে কোন ঘন বসতির মধ্যে নূতন বাসা করিব।

এই সময় বাবাও কলিকাতা ছিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম একদিন গিয়া বাবাকে সমস্ত কথা বলিলাম। তিনি স্থির ভাবে আমার কথা শুনিয়া তাহার সুন্দর ডাগর চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "কোন চিন্তার কারণ নাই, যেখানে আছ সেইখানেই থাকিও।" বাবার ঐ কথার সঙ্গে সঙ্গেই আমার দোদুল্যমান চিত্ত শান্ত হইয়া গেল। পরে দেখিয়াছিলাম সৈন্যেরা অন্যত্র কোন কোন বাড়ীতে উপদ্রব করিলেও আমার বাসার চতুঃসীমানার মধ্যে আসিত না।

আর একবার স্ত্রীর অসুখের জন্য বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলাম। ঢাকাতে ইহার যতদূর চিকিৎসা করা সম্ভব তাহা করা হইল। কিন্তু রোগের কোন উপশম দেখা গেল না। ভাবিলাম কলিকাতার কোন বিশেষজ্ঞকে দেখাইয়া চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিব। ঐ উদ্দেশ্য লইয়া পূজার ছুটিতে ঢাকা হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। হরিদ্বার, দেরাদুন, প্রভৃতি স্থান বেড়াইয়া কাশী আসিয়া পৌঁছিলাম। এখানে বাবার সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমি কাশীতে ৪।৫ দিন থাকিয়া কলিকাতা ফিরিবার অভিপ্রায়ে বাবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে বাবা বলিলেন, "এবার ত তুমি অতি অল্প সময় কাশীতে রহিলে ?" স্ত্রীর চিকিৎসার জন্যই যে আমাকে এত শীঘ্র কলিকাতা যাইতে হইতেছে তাহা বাবাকে বলায় তিনি আমার স্ত্রীর কি অসুখ তাহা জানিতে চাহিলেন। আমি উহা নিবেদন করিলে বাবা বলিলেন, "এত দিন আমাকে ঐ কথা বল নাই কেন ? বাবার কাছে সন্তানের আবার লজ্জা কি রে ?" এই বলিয়া তখনই তিনি আমাকে দুইটি ঔষধের বড়ি

দিয়া বলিলেন, "এখনই গিয়া বৌমাকে একটি খাওয়াইয়া দাও। বিকালে উহার ফলাফল আমাকে জানাইও।" তাহাই করিলাম। একবার মাত্র ঔষধ সেবনের ফলে যথেষ্ট উপকার দেখা গেল। বিকালে ঐ কথা বাবাকে বলিলে তিনি বলিলেন যে ইহার ফল স্থায়ী করিতে হইলে একটু দীর্ঘ দিন ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে। এই বলিয়া তিনি আরও কতকগুলি ঔষধ আমাকে দিলেন। ঢাকাতেও দুইবার ডাকযোগে ঔষধ পাঠাইয়া ছিলেন যাহা ব্যবহার করিয়া আমার স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করেন।

বাবার এই সকল অযাচিত করুণার কথা যখনই স্মৃতি-পথে উদিত হয় তখনই কৃতজ্ঞতায় দুই চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠে। এমন দয়াল ঠাকুর আর কোথায় পাইব? আজিকার এই দুর্দ্দিনে বাবার অভাব যেন নূতন করিয়া নিবিড়ভাবে হৃদয়ে জাগিয়া উঠিতেছে। কারণ রাষ্ট্রীয় ঝঞ্ঝাবর্ত্তে জীর্ণপত্রসম স্বদেশ ও স্বজন হইতে আজ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি। বার্দ্ধক্যের করাল ছায়া জীবনকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। আশা আকাঙ্ক্ষা করিবার এখন কিছু নাই। বর্ত্তমান অনিশ্চিত, ভবিষ্যৎ ঘোর তমসাচ্ছন্ন। দুশ্চিন্তা এবং ভয় হইয়াছে এখন নিত্য সহচর। আজ নিজকে যেমন অসহায় ও দুর্ব্বল বোধ করিতেছি এমনটি আর কখনও হয় নাই। এই সময় যদি আমাদের প্রেমের ঠাকুর দেহে থাকিতেন তাহা হইলে ভয় করিবারই বা কি ছিল, ভাবনা করিবারই বা কি ছিল? কারণ ঐ আয়ত-লোচনের কৃপা কটাক্ষের সম্মুখে দুর্দ্দৈবও যে টিকিতে পারে না!

বাবা যে নাই একথা যেমন মর্ম্মান্তিকভাবে সত্য, আবার

তিনি যে নিত্য বর্ত্তমান একথাও তেমনি সত্য। কারণ সদ্‌গুরু মৃত্যুঞ্জয়, অবিনাশী, শাশ্বত। তাঁহার চির প্রকাশ এবং চির অপ্রকাশ। তাহাই যদি না হইত তাহা হইলে তাঁহার প্রেমের লীলা এখনও চলিতেছে কিরূপে? শুনা যায় এখনও কোন কোন ভাগ্যবান্ তাঁহার পাবন-পরশ হৃদয়ে উপলব্ধি করিতেছেন, কেহ কেহ বা প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার দর্শন লাভ করিতেছেন। চতুর্দ্দিকের খণ্ড প্রলয়ের মধ্যে আমরাও যে অক্ষত শরীরে টিঁকিয়া আছি তাহাও ঐ পরমদয়ালের কৃপার জন্য কি না তাহাই বা কে বলিবে? তাই আজ শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ে ঐ পতিতপাবনের চরণযুগলে সাষ্টাঙ্গ হইয়া বলিতেছি—

"হে জগৎ গুরো, তোমার জয় হউক!"

শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব রচিত

গীতাবলী

রায় সাহেব শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, কবিরত্ন, এম-এ

শ্রীশ্রীবাবা বিশুদ্ধানন্দ বাল্যাবধি সঙ্গীতকুশল ও সঙ্গীত-রচনাপটু ছিলেন। জ্ঞানগঞ্জে শিক্ষাগুণে তাঁহার সঙ্গীত-পারদর্শিতা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার প্রাচীনতম শিষ্যগণ অনেকেই তাঁহাকে তানপুরা সংযোগে গান করিতে ও পাখোয়াজ বাজাইতে দেখিয়াছেন। ৺উপেন্দ্র চৌধুরী লিখিয়াছেন, "সেরূপ মধুরকণ্ঠের গান আমি আর শুনি নাই। অদ্যাবধি কোথাও গান শুনিতে গেলে আর গান ভাল লাগে না। ··· ···তিনি প্রায় প্রতিরাত্রেই (গভীর রাত্রে) আপন মনে এমনি গান করিতেন, আমি মুগ্ধ হইয়া শুনিতাম। ··· ···এখনও সেই প্রকার সুমিষ্ট গান শুনাইবার জন্য অনেকবার বলিয়াছি—কিন্তু আর হয় না। বলেন, উপেন্দ্র, সে দিন আর নাই।" তিনি ১০।১১ বৎসর বয়স হইতে গীত রচনা আরম্ভ করেন। তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি তিনি তিন চারি শত গান রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেগুলি তিনি একখানে সংগ্রহ করিয়া রাখেন নাই। সাময়িক খাতাপত্রের পাতায় টুকিয়া রাখিতেন। অনেক গান শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার মুখস্থই ছিল। পুরাতন খাতা ইত্যাদি হইতে তিনি ৪৩টি গান ৺দুর্গাকান্ত রায় প্রভৃতিকে দেন। ঐ গান কয়েকটি

শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ লিখিত ভূমিকাসহ ১৩৩৯ সালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। তৎপর ১৩৪২ সালে শারদীয়া পূজার সময় হইতে আমি আড়াই মাস কাল কাশীতে অবস্থান কালে তিনি আমার প্রতি অসীম স্নেহ প্রদর্শন করিয়া কতক পুরাতন খাতা হইতে কতক স্মৃতি হইতে ৪০টি গান আমাকে দিয়াছিলেন। ক্রমে আরও বহু ঐভাবে পাইব আশা ছিল। কিন্তু আমি কাশী হইতে চলিয়া আসিবার পরই তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে এবং আমিও একযোগে বেশী দিন তাঁহার পদপ্রান্তে বসিতে পারি নাই। যে গান কয়েকটি আমি পাইয়াছি তাহা এইভাবে ক্রমশঃ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে।

শ্রীশ্রীবাবা ১২৬২ সালের ২৯শে ফাল্গুন জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪ বৎসর ৩ মাস বয়সে জ্ঞানগঞ্জ যান। তথায় দুই তিন বৎসর মধ্যেই (ব্রহ্মচারি দশায়ই) তাঁহার "বিশুদ্ধানন্দ" নামকরণ হয়। এই সব কথাই আমার তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শ্রুত এবং আমার ডায়েরীতে লিখিত। তিনি আরও বলিয়াছেন, তাঁহার রচিত গানগুলির মধ্যে যেগুলিতে 'ভোলানাথ' বা 'ভোলা' ভণিতা আছে সেগুলি তাঁহার বিশুদ্ধানন্দ নাম প্রাপ্তির পূর্ব্বে (অর্থাৎ বাল্যকাল হইতে সপ্তদশ অষ্টাদশ বর্ষ বয়স মধ্যে) রচিত। বিশুদ্ধানন্দ নামকরণের পরে রচিত গানগুলিতে প্রায় "বিশে ক্ষেপা" বা "বিশে" এইরূপ ভণিতা আছে। দুই একটি গানে ভণিতা নাই-ও। একটি গান এক শিষ্যের অনুরোধে রচিত হইয়াছিল বলিয়া তাহাতে ঐ শিষ্যের নামের ভণিতা আছে। তাহা যথাস্থানে প্রদর্শন করিব। অনেকগুলি গানের রচনাকালও তিনি

(৭)

ও মন, মুদে দেখ আঁখি জগৎ যে কি,
সকলই যে ফাঁকি এ ভব সংসার।
আমি আমার কেবা ভবে আছে যেবা
ছাড় সব কর হরিপদ সার।
ভাই বন্ধু স্মুত আর পরিবার—
ভেবে দেখ মন কেই বা তোমার,
যবে হবে শবাকার এ দেহ তোমার
ভব পারে তোরে কে করে দিবে পার।
ভোলার মন, ভুলে অনিত্য বৈভবে
মিছে কেন তুমি মর ঘুরে ভবে ?—
ভবারাধ্য ধন ভাব রে ভক্তিভাবে
ভব কারাগারে আসিবি না আর।

(৮)

শিবে, সহেনা সহেনা আর বন্ধন যাতনা,
কোলে তুলে নে মা ওগো ত্রিনয়না,
দে মা মোচন ক'রে
আসি' হৃদি পরে—
নইলে পাপতাপের জোরে আর বাঁচি না।
মা, এসে দ্বীপান্তরে
মায়ার মায়ায় প'ড়ে

ত্রিতাপে তাপিত হ'য়ে মরি ঘুরে,
দে মা পাপ ঘুচায়ে ওগো অভয়ে
পাপী ব'লে আর ছলনা ক'রো না।
ভোলানাথ বলে,
যাস্ না যেন ভু'লে
দুষ্ট ছেলে ব'লে রাখিস সদা কোলে।
ভুলো না ভুলো না ওগো ত্রিনয়না
কোল ছাড়া যেন কখনো ক'রো না।

(এই গানটি ১২৭৭ সালের রচনা)

ক্রমশঃ

মহাজনের বাণী

(সংকলিত)

(১)

অশ্রুই অনন্ত ধ্যানের সহায়। নিবিড় অন্ধকারই গন্তব্য পথের সঙ্গী। গুরুদেবের নামই একমাত্র আশ্রয়। গুরুদেবকে সমস্ত নির্ভর—ইহাই কর্ম। হৃদয়ভেদী ব্যাকুলতাই সাধনা। গুরুদেবের আকর্ষণই স্বাভাবিক যোগ।

—শ্রীশ্রীভৃগুরাম পরমহংস

(২)

চিন্তা কি ? বৃথা চিন্তা করিও না। নির্ভর করিতে শিক্ষা কর। নির্ভর ভিন্ন জীবের গতি নাই।

—শ্রীশ্রীবাবা বিশুদ্ধানন্দ

(৩)

চিত্ত নির্মল কর, ভগবানের কৃপা বা শক্তি অনুভব করিতে পারিবে।

—শ্রীশ্রীবাবা বিশুদ্ধানন্দ

(৪)

নির্ভর আমারে যেবা একাগ্রেতে করে।
সব ভার আমি তার লই শিরোপরে॥
চকিতে চলিতে যদি কাদা লাগে গায়।
আমিই ধুইয়া লয়ে কোলে করি তায়॥

—মাতৃসূক্ত-পরমগীতা

(৫)

কোন বিষয়ে হতাশ না হইয়া সত্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে থাকিতে সত্যই সকল ব্যবস্থা করেন।

—শ্রীশ্রীরামঠাকুর

(৬)

নামে রুচি হউক আর নাই হউক, সুখ হউক আর দুঃখই হউক, অকাতরে দিবানিশি নামের দাস হইয়া থাকিতে হয়। * * * নাম করিতে করিতে ভগবান্ জাগিয়া পড়েন।

—শ্রীশ্রীরামঠাকুর

(৭)

মনের বেগ, বুদ্ধির বেগ এবং বাসনা অর্থাৎ কামনার বেগ সহ্য করিয়া কেবল শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতে হয়। এই লক্ষ্যকেই লক্ষ্যরূপ সমাধি বলে। এই জপ করিতে করিতে হংসের উদয় হয়। ইহাকেই নামের উদয় বলে।

—শ্রীশ্রীরামঠাকুর

(৮)

কেন হবে না ? তোমরা নিরাশ হও কেন ? কোন্ মুহূর্ত্তে কাহার কি হয় কে জানে ? এই ক্ষণ কেন বল না—'এই ধরিলাম.' 'ছাড়িলাম' বলিও না। একটা কিছু ধর—তবেই দেখিবে এই ভাবে বন্ধন ছিঁড়িয়া যাইবে।

—শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

(৯)

সর্বরূপে, সর্বভাবে, তিনিই ত। যখন যা হচ্ছে, তিনিই করান, তিনিই করেন, তিনিই শুনেন। সর্ব বিষয়ে তাঁর উপর কেবল নির্ভর।

—শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

(১০)

তাঁকে ডাকিলে বাজে ভাবনার বিড়ম্বনা দূর হইবে, বুঝিতে পারিবে ত্রিতাপ-হারিণীর দয়া কিরূপ। নির্ভর বিরুদ্ধ ক্রিয়াদির কার্য্যসমূহ যে সাধন পথের বিঘ্ন তাহা স্পষ্টই জানিতে পারিবে। চিন্তা কি?

—শ্রীশ্রীবাবা বিশুদ্ধানন্দ

(১১)

হৃদয়ে আমার ধ্যান স্বরূপ-চিন্তন।
নিশিদিন মধুময় ভাবে নিমজ্জন॥
এইরূপে মনে প্রাণে করিলে যতন।
আমার ইচ্ছায় হয় বশীভূত মন॥

—শ্রীশ্রীসিদ্ধিমাতা—'কায়াভেদী বাণী'

(১২)

শ্বাস-প্রশ্বাসে লক্ষ্য রেখে নাম করার মত উপকার কিছুতেই নয়। ইহার উপকারিতাই অন্য প্রকার। সহজ শ্বাস-প্রশ্বাসে একবার ঠিক মত নামটি গেঁথে গেলেই আত্মদর্শন হয়।

—শ্রীশ্রীপ্রভু বিজয়কৃষ্ণ

(১৩)

ভগবান্ যখন যা করতে আসেন তা না ক'রে যান না। তিনি যাদের ধরেন কখনও তাদের ছাড়েন না। তিনি না ধরলে মানুষের কি সাধ্য যে তাঁকে ধ'রে থাকে? মানুষের কিছুই ক্ষমতা নেই—তাঁর কৃপাই সার।

—শ্রীশ্রীপ্রভু বিজয়কৃষ্ণ

(১৪)

তোমার নিজকে ছাড়িয়া এক পা অগ্রসর হইলেই তুমি ভগবানের সত্তাতে উপনীত হইয়াছ দেখিতে পাইবে।

—শ্রীআবুসৈয়দ ইবন আবিল খয়ের

(১৫)

প্রভু, তোমার প্রেম-মদিরা দ্বারা আমাকে উন্মত্ত কর। তোমার দাসত্বের শৃঙ্খল আমার চরণে পরাইয়া দাও। আমাকে একমাত্র তোমার প্রেম ব্যতীত আর সব কিছু হইতে মুক্ত করিয়া রিক্ত কর। এই ভাবে আমাকে মৃত্যুর মধ্য দিয়া নিত্য জীবনে প্রতিষ্ঠিত কর। যে ক্ষুধা তুমি জাগাইয়াছ একমাত্র পূর্ণতাতেই তাহার পরিসমাপ্তি।

—শেখ আবদুল্লা আনসারি

ক্রমশঃ

জ্ঞানগঞ্জের পত্রাবলী

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট্

প্রায় ২৪ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীশ্রীগুরুদেবের অনুমতি অনুসারে ৺কাশীধাম হইতে জ্ঞানগঞ্জের কয়েকখানা পত্র 'ছয়খানি পত্র' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ পত্রগুলি এবং আরও কয়েকখানা পত্র আমার নিকট বহুদিন হইতে সযত্নে রক্ষিত ছিল। ১৯১৮ সালের ২১শে জানুয়ারী তারিখে আমি শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে আশ্রয় লাভ করি। তখন বেনারস হনূমান্ ঘাটের আশ্রমে বাবা থাকিতেন। আমার দীক্ষার কিছু দিন পরে জ্ঞানগঞ্জ সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে একদিন বাবা বলেন যে পশ্চিম হইতে পত্র আসিয়াছে, তাহাতে আমাদের কথা আছে। 'পশ্চিম' বলিতে বাবা জ্ঞানগঞ্জই লক্ষ্য করিতেন, ইহা আমরা জানিতাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাবা, ঐ পত্রখানা কি আমরা দেখিতে পারি না?" বাবা বলিলেন, "উহাতে তোমাদের সম্বন্ধেও আলোচনা আছে। তাই উহা এখনও তোমাদিগকে দেখাইতে পারি না।" আমি বলিলাম, "আমি আমাদের ব্যক্তিগত সমালোচনা দেখিবার জন্য উৎসুক নহি। আমার ঔৎসুক্য শুধু এই দেখিবার জন্য—তাঁহারা কি প্রকার লেখেন—তাঁহাদের ভাষা কি প্রকার—ভাব-প্রকাশের পদ্ধতি কিরূপ, এই সব বিষয়।" বাবা বলিলেন, "পুরাতন পত্র অনেক আছে—বর্দ্ধমানে আছে, তোমাকে পরে দেখাইব।"

ইহার কিছুদিন পরে বাবা বর্দ্ধমান যান। পর বৎসর কাশীতে আসিবার সময় যদৃচ্ছা-সংগৃহীত কয়েকখানা পত্র লইয়া আসেন ও আমাকে দেন। ইহার পরে আরও কয়েকখানা পত্র দেন। আমি পত্রগুলি পাইয়া খুব যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলাম। এইগুলি সবই আমার দীক্ষার পূর্ব্বকালীন পত্র। দীক্ষার পরবর্ত্তী সময়ের কোন পত্র আমাকে দেন নাই ও দেখান নাই। তবে বহু বৎসর পর, বোধ হয় ১৯২৬ সালে, গোমোতে অথবা ধানবাদে অবস্থান কালে উমানন্দ স্বামীর একখানা পত্র পাইয়াছিলেন—উহা আমাকে দেখিতে দিয়াছিলেন। উহা বিজ্ঞান-মন্দির স্থাপনের পরের কথা। তাঁহার অনুমতিক্রমে ঐ পত্র আমি নকল করিয়া লইয়াছিলাম। পূর্ব্বের পত্রগুলির মূল কাপী আমার নিকট ছিল।

পত্রগুলি কিভাবে আসিত তাহা বলা যায় না। কোন কোন পত্রে জ্ঞানগঞ্জের মোহর আছে—তাহাতে নাগরী অক্ষরে লেখা আছে "পাঞ্জাব আশ্রম—স্বামীজী"। একখানা খামে টীকেটের উপর মোহরে ছাপা ইংরেজী অক্ষরে আছে—'Jnanananda Swami Asram—Punjab'. একখানাতে ছিল "Golden Temple Amritsar." কোন কোন খামে ইংরেজী অক্ষরে জলন্ধরের (Jullundhar City) মোহরও দেখিয়াছি। এইগুলি ঠিক ডাকে আসিতে দেখি নাই। যেমন লেন্স, বিজ্ঞানের বড় বড় যন্ত্র, বড় বড় ঔষধের শিশি শূন্যমার্গে আসিত ও এখান হইতে জ্ঞানগঞ্জের কুমারীদের জন্য বস্ত্রাদি শূন্যমার্গে যাইত, বোধ হয় এই সকল চিঠিও অধিকাংশ

স্থলে সেইভাবে আসিত। বাবা এ সব রহস্য সাধারণ লোকের নিকট স্পষ্ট করিয়া খুলিতেন না। তবে অলৌকিক উপায়ে যে অনেক জিনিষ আসিয়াছে ও তিনিও পাঠাইয়াছেন তাহা আমার প্রত্যক্ষ দৃষ্ট।

আমার পূর্ব্বোক্ত সংগ্রহ হইতেই 'ছয়খানা পত্র' নির্ব্বাচন করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছিল। ঐ পুস্তিকাখানি কলিকাতাতে মুদ্রিত হইয়াছিল। সম্পাদনের ক্রটিতে উহাতে অনেক অশুদ্ধি বর্ত্তমান ছিল। সম্প্রতি ঐ চিঠিগুলি এবং আরও কয়েকখানা অপ্রকাশিত চিঠি 'জ্ঞানগঞ্জের পত্রাবলী' নামে ক্রমশঃ বিশুদ্ধবাণীতে প্রকাশিত করার সঙ্কল্প করা হইয়াছে। চিঠিগুলি যথাবৎ মুদ্রিত হইবে। কোন স্থানে কোন ব্যক্তির নাম থাকিলে উহার উল্লেখ থাকিবে না। যদিও উল্লিখিত বহু ব্যক্তি এখন পরলোকগত, তথাপি ব্যবহারগত শিষ্টতার অনুরোধে কোথাও কাহারও নাম-নির্দ্দেশ থাকিবে না। ইতি—

প্রথম পত্র

নমো নারায়ণায়

কৃষ্ণপক্ষ

১৮২৭।১০।৬

নারায়ণস্মরণবর

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য

অভয়ানন্দ স্বামীর শুভ সংবাদে যথাবিধানে সম্ভাষণপূর্ব্বক বিজ্ঞাপন পরম্—

তোমার প্রেরিত শুভ সংবাদে পরমানন্দ লাভ করিলাম।

শ্রীশ্রীবিশ্বনাথের সমীপে প্রার্থনা করি তোমার অভিলাষ সুসিদ্ধ হউক, এই আমার ইষ্ট। (পরমারাধ্য) গুরুদেব কয়েক দিবস হইল এখানে নাই, তিনি মনোহর তীর্থে গিয়াছেন। আমিও তাঁহার নিকট শীঘ্রই যাইব। এখন দুই তিন দিন হরিদ্বারে থাকিলাম।

মানবীয় ভাব অতীত হইয়া আবার এ কি ? চৈতন্য স্বরূপের উচ্ছ্বাস ভাব মন, স্থূল তত্ত্বের পরিমিত শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া দম্ভ দ্বেষাদির উত্তেজনায় সময়ে সময়ে বিপদ উপস্থিত করে এবং পৃথিবী শোণিত-সিক্ত করিয়া আত্মম্ভরিতা দোষে আক্রান্ত করে। দুর্দ্দমনীয় রিপুগণের প্রবল শাসনে সাধু চিন্তা, ধর্ম্মানুরাগ, ব্রহ্মভাবে নিষ্ঠা, সদসৎ ইচ্ছা কিছুই থাকে না। তথাপি এমন অবস্থাতেও অচেতন জড়শক্তি চেতনশক্তিসম্পন্ন চিত্তকে বদ্ধ রাখিতে সক্ষম নহে। কারণ বিধাতার অমোঘ দণ্ড প্রতিমুহূর্ত্ত কাল পাপপ্রবৃত্তি প্রতি বর্ষিত হইতেছে। রেখামাত্র পবিত্রতার সংস্পর্শে দেবশক্তির প্রভা প্রদীপ্ত হইয়া মেঘনির্মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় চিত্তকে দেবভাবে অনুরঞ্জিত করে। উহা কামাদির নির্যাতন বা তাহাদের পাপ প্রলোভনে প্রতারিত হয় না, দেবতত্ত্বের অন্বেষণে নিয়তকাল ব্যাকুল থাকে, ব্রহ্মকৃপা স্বাভাবিক আসিয়া পড়ে। ক্রমে ক্রমে বিশুদ্ধ স্বর্গীয় ভাব মর্ম্মভেদ করিলে দয়া দাক্ষিণ্য ক্ষমা ধর্ম ঔদাস্য সারল্য এই ছয়টি মহাবৃত্তির প্রভাবে মানবীয় ভাব ও ক্রোধাদির বল ক্ষয় হইয়া দেবভাবের আশ্রয় লইতে শক্তি জন্মে। ক্ষুদ্র কীট হইতে উচ্চাধম পর্য্যন্ত কোন বিশেষত্ব থাকে না। সকলের ভিতরে একমাত্র নিরাকার অখণ্ড
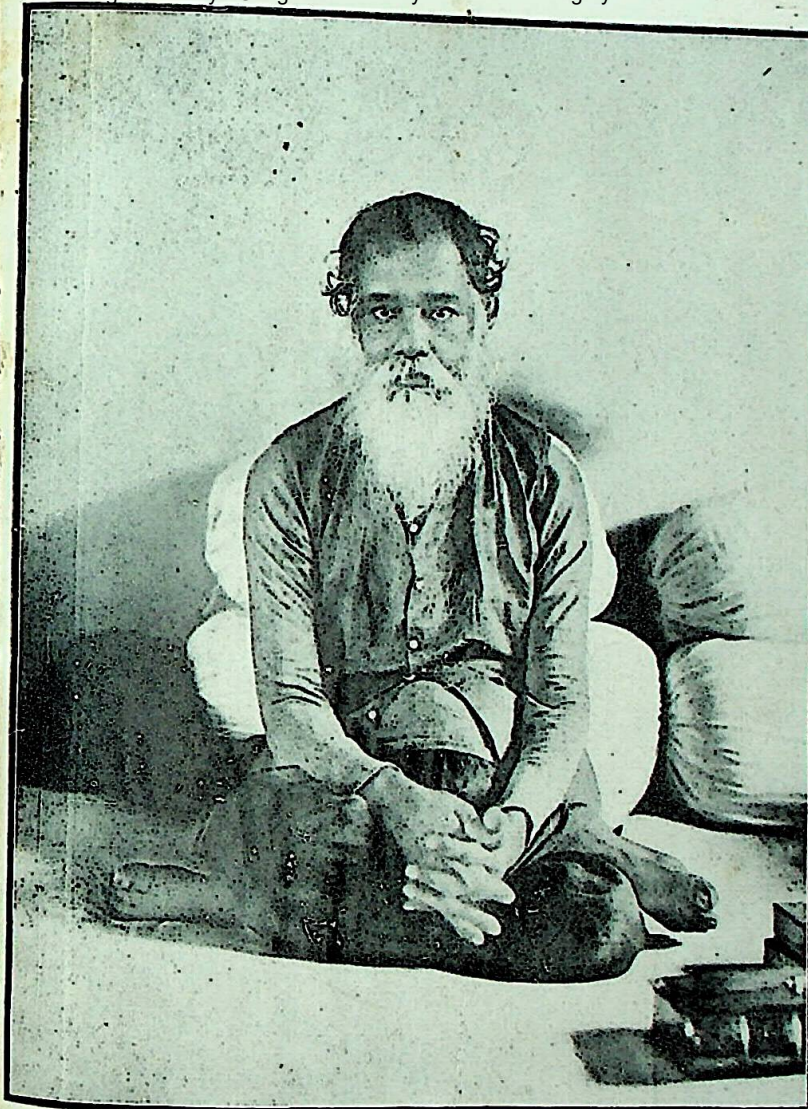
যোগিরাজাধিরাজ

শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস

গুরুভ্রাতা ৺পূর্ণানন্দ গোস্বামী প্রভৃতি সরপী নিবাসী গোস্বামী মহাশয়গণ উক্ত মহিষমর্দ্দিনী পাটের গোস্বামীদের দূর সম্পর্কীয় জ্ঞাতি বলিয়া পরিচিত। আমার জন্মস্থান নুনীগ্রামে ইঁহাদের অনেক ঘর ব্রাহ্মণ শিষ্য আছে। আমাদের বংশের অনেকে আর বিলম্ব না করিয়া সরপীর গোস্বামী বংশের একজনের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। আমি কিন্তু তাঁহাদের মতাবলম্বী হইতে পারিলাম না। আমার মনে হইল, আমাদের পিতৃগুরুবংশ নাই, সুতরাং কুলগুরু ত্যাগের কোন প্রশ্ন নাই; কেবল শ্রীপাটের মোহে পড়িয়া ব্যবসায়ী গুরুর নিকট আত্মসমর্পণ করা কর্ত্তব্য নহে; কোন বন্ধন না রাখিয়া যথাসাধ্য গুরু অন্বেষণ করিব; যদি সদ্‌গুরু লাভ হয়, তাঁহার শ্রীচরণে আত্ম-সমর্পণ করিব; যতদিন সদ্‌গুরু না পাই ব্রাহ্মণোচিত ত্রিসন্ধ্যা, গায়ত্রী জপ, পূজাপাঠাদি করিয়াই জীবন অতিবাহিত করিব। এই সঙ্কল্পই কার্য্যে পরিণত হইল।

সময় না হইলে সদ্‌গুরু লাভ হয় না। শ্রীশ্রীবাবার ও আমার জন্মস্থান বর্দ্ধমান জেলায়, মাত্র ৩০।৩৫ ক্রোশের ব্যবধান; বাবার কর্ম্মস্থল গুস্করা আরও নিকট। গুস্করার পর বাবা বর্দ্ধমানে থাকিতেন। বর্দ্ধমান আমাদের সদর, মামলা মোকদ্দমা প্রভৃতি নানা কার্য্যে বর্দ্ধমান গিয়াছি, হয়ত বা বাবার পাশ দিয়াই চলিয়া গিয়াছি; কিন্তু দর্শনলাভ দূরে থাকুক তাঁহার নাম পর্য্যন্ত কাণে শুনি নাই। আসানসোল আমার বাড়ী বলিলেই হয়। সেখানে থানায়, রেলে, কোর্টে বাবার কত শিষ্য রহিয়াছে, কিন্তু কাহারও মুখে বাবার নাম পর্য্যন্ত শুনি নাই। আমি, 'হা গুরু! কোথায়

গুরু !' বলিয়া কাঁদিয়াছি; গুরুদেবও নিকটেই রহিয়াছেন, কিন্তু সময় পূর্ণ না হওয়ায় তাঁহার দর্শনলাভ হয় নাই। কিন্তু যখন সময় পূর্ণ হইল তখন আর কোন বিধি-ব্যবস্থারই প্রয়োজন হইল না। বাবার নিকট গিয়া দীক্ষা প্রার্থনা করিলাম না,—যাওয়া দূরে থাকুক নিজের হাতে একখানা পত্র লিখিয়াও কৃপা ভিক্ষা করিলাম না। তাহা হইলে কি হইবে? তখন যে তাঁহার চিহ্নিত দাসকে শ্রীচরণে স্থান দিবার সময় আসিয়াছে, তাই দয়াময় ডাকিয়া বলিলেন—"আইস, দীক্ষা গ্রহণ কর।" কথাটা একটু স্পষ্ট করিয়া বলি।

ইং ১৯১৭ সালের কথা। তখন আমার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীমান্ হরিশ্চন্দ্র রায় খাস্তুড়ি ষ্টেশনের (B. N. Ry.) নিকট নদ্‌খুরকী কলিয়ারীর ম্যানেজার। সেই সময় তাহার এক প্রকার ব্যাধি হইল;—তাহার মনে হইত যেন তাহার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া আসিতেছে, এখনই মৃত্যু হইবে। সেই সময় সে ভয়ে নিজের বাটীর সকলকে নিজের কাছে একত্র করিত। কলিয়ারীর ডাক্তার কোন প্রতিকার করিতে না পারিয়া, বিশ্রাম লইবার জন্য কিছুদিন ছুটীর ব্যবস্থা করিলেন। বাটী আসিয়াও সেই প্রকার ভাব চলিতে লাগিল। আমি ব্যাধি নির্ণয়ের জন্য তাহাকে কলিকাতা পাঠাইলাম। সেখানে ভাল ভাল ডাক্তার দিয়া পরীক্ষা করান হইল, কিন্তু কেহই হৃদ্‌যন্ত্রের কোন দোষ পাইলেন না। তাঁহারা একবাক্যে বলিলেন—"ইহার কোন ব্যাধিই নাই। ইহা মনের রোগ।" বাটী ফিরিয়া আসিলে কবিরাজী চিকিৎসা করান হইতে লাগিল। তাঁহারা বলিলেন—"ইহা এক প্রকার

বায়ুরোগ"। তদ্রূপই চিকিৎসা চলিল, কিন্তু বিশেষ ফল কিছুই হইল না। ছুটী শেষ হইলে সে আবার কলিয়ারীতে গিয়া কর্ম্মে যোগদান করিল।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী* নদখুরকী কলিয়ারীর ক্যাসিয়ার। তিনি একদিন হরিশকে বলিলেন, "আমার গুরু শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব ধানবাদে তথাকার ষ্টেশন মাষ্টার শ্রীযুক্ত জগদীশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় আসিয়াছেন। চলুন, একদিন গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসি। আমার বিশ্বাস, তাঁহার কৃপায় আপনার এই ব্যাধি আরোগ্য হইয়া যাইবে।" তদনুসারে তাঁহারা দুইজনে ধানবাদে গিয়া বাবাকে প্রণাম করিয়া আসিলেন। তাঁহার দৃষ্টিমাত্রে হরিশের রোগ আরোগ্য হইয়া গেল। বাবা বলিলেন, "দীক্ষা হইয়া গেলে এ ব্যাধির পুনরাক্রমণের কোন ভয়ই থাকিবে না।" বলা বাহুল্য, তাহার দীক্ষার অনুমতি হইয়া গেল। হরিশ ধানবাদ হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে ডাকিয়া পাঠাইল। আমি গিয়া দেখিলাম, তাহার শরীরের পূর্ব্ব লাবণ্য ফিরিয়া আসিয়াছে, যেন আর কোন ব্যাধিই নাই। সে আমার নিকট ধানবাদ যাওয়ার সমস্ত বিবরণ আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিল।

---

*শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী আমাদের গুরুভ্রাতা, আমাদের আগেই তাঁহার দীক্ষা হইয়াছিল। হরিশ নদথুরকী হইতে চলিয়া আসার পর ইনিও সেখানকার চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া কুমারডুবী পটারী ওয়ার্কসের ষ্টোর কিপারের পদ গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি বাবার একখানা ফটো এনলার্জ্জ করাইয়া, সেই বড়-ফটো অনুরূপ একটি ব্লক প্রস্তুত করান। এই ব্লকের বাবার প্রতিমূর্ত্তি এখনও অনেকের নিকট আছে।

হরিশ আমাকে বলিল, "দাদা, আমি বাবার নিকট দীক্ষার অনুমতি পাইয়াছি। এখন আপনি অনুমতি দিলেই আমি দীক্ষার জন্য প্রস্তুত হই।"

হরিশের মুখে বাবার নাম ও যোগশক্তির কথা শুনিয়া আমার দেহে যেন একটা আনন্দপ্রবাহ ছুটিয়া গেল। কে যেন আমার ভিতর হইতে বলিতে লাগিল, "তুমি এতদিন যাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া আছ, যাঁহাকে পাইবার জন্য বহুবার আকুল প্রার্থনা জানাইয়াছ, ইনিই তোমার সেই গুরু।" আমি হরিশকে বলিলাম, "ভাই, তুমি আমার দীক্ষার কথাও বাবাকে পত্রের দ্বারা জানাও। তিনি অনুমতি করিলে আমি তাঁহার শ্রীচরণ প্রান্তে উপস্থিত হইয়া আমার প্রার্থনা জানাইব।" কিন্তু কিছুই করিতে হইল না। তিনি যে অন্তর্য্যামী, তিনি যে সর্ব্বদা আমার অন্তরের আকুল প্রার্থনা শুনিতেছেন। আমি দৃষ্টিশক্তিহীন, তাই গুরু অন্বেষণ করিয়া ছুটাছুটি করিতেছি; কিন্তু তিনি যে তাঁহার জন্ম-জন্মান্তরের শিষ্যের উপর সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেছেন, দুর্ব্বল সন্তানকে কোলে লইবার জন্য বাহু প্রসারণ করিয়া সময়ের অপেক্ষা করিতেছেন। এখন সময় পূর্ণ হইল, এখন আর কোন বিধি-ব্যবস্থা নাই। বাবার নিকট গিয়া দীক্ষা প্রার্থনা করিতে হইল না, "সেখানকার" (জ্ঞানগঞ্জের) অনুমতির (বাহ্যভাবে) প্রশ্ন উঠিল না। ৩।৪ দিন মধ্যে হরিশের পত্রের উত্তর আসিল, "তোমাদের উভয় ভ্রাতার এক সঙ্গে সস্ত্রীক দীক্ষা হইবে।" সকল চিন্তা ও সকল সন্দেহের নিবৃত্তি হইয়া গেল।

দীক্ষার অনুমতি ত হইয়া গেল। কোথায় দীক্ষা হইবে

এই চিন্তা করিয়া মনে একটা খট্‌কা উঠিতে লাগিল। গুনীগ্রামের উত্তর প্রান্তে "শ্রীশ্রী৺কপিলেশ্বর" নামে এক অনাদিলিঙ্গ শিব আছেন। আমাদের কুল-প্রথামত উক্ত শিবালয়ে সকলেরই চূড়াকরণ ও দীক্ষা হইয়া আসিতেছে। অদ্যাপি এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। আমাদেরও চূড়াকরণ উক্ত শিবক্ষেত্রেই হইয়াছে। কিন্তু বাবা কি আমাদের দীক্ষার জন্য গুনীগ্রামে যাইবেন? তাহার ত কোন আশাই নাই। অথচ অন্য স্থানে দীক্ষা হইলে কুলপ্রথা লঙ্ঘন জন্য একটা মানসিক অশান্তি চিরদিনের জন্য থাকিয়া যাইবে। আমার মনোব্যথা সর্ব্বজ্ঞ বাবার নিকট পঁহুছিল, তিনি তাহারও সুব্যবস্থা করিলেন। হরিশ বাবাকে লিখিয়াছিল, কোথায় এবং কোন্ সময়ে দীক্ষা হইবে জানাইলে সেইরূপ ছুটী লইয়া প্রস্তুত হইতে পারিবে। বাবা তাহাকে পত্রোত্তরে জানাইলেন—"শ্যামাপূজার পর যে কোন শুভদিনে ৺কাশীতে তোমাদের দীক্ষা হইবে।" পত্র পাইয়া দীক্ষার স্থানের সংশয় কাটিয়া গেল। ৺কাশী শিবক্ষেত্র, সেখানে দীক্ষা হইলে শ্রীশ্রী৺কপিলেশ্বর শিবের ক্ষেত্রে দীক্ষা না হওয়ার আর কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। অক্টোবর মাসের শেষে হরিশ নদ্‌খুরকীর চাকরী ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চাকরী গ্রহণ করিল। সেখানে ডিসেম্বর মাসে যোগ দিবার কথা কহিয়া নভেম্বর মাস অবকাশ গ্রহণ করিল। বাটী আসিয়া ৺কাশী যাইবার আয়োজন হইতে লাগিল এবং শীঘ্র কাশী যাইতেছি বলিয়া বাবাকে পত্র দেওয়া হইল।

আবার নূতন বিঘ্ন উপস্থিত। যাত্রার সমস্ত আয়োজন হইয়া

গিয়াছে। আমরা সস্ত্রীক দুই ভ্রাতা, ৪।৫ টি ছেলে মেয়ে এবং আরও তিনজন আত্মীয়-আত্মীয়া মোট ১১।১২ জন লোক যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি, এমন সময় বাবার একখানা পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন—"কাশীতে একপ্রকার সংক্রামক মারাত্মক জ্বর আসিয়াছে, তাহাতে প্রত্যহ ৪০০।৫০০ শত লোক মরিতেছে। এ অবস্থায় তোমাদের কাশী আসা হইবে না। আমি ইহার পর দীক্ষার সময় ও স্থান নির্দ্দেশ করিয়া পত্র দিব।" পত্র পড়িয়া সকলে বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া গেল। আমার আঘাত অত্যন্ত গুরুতর হইল। দীক্ষার জন্য আমার মন তখন খুব উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল, কবে কাশী যাইব কবে দীক্ষা হইবে, এইজন্য দিন গুণিতেছিলাম। দ্বিতীয়তঃ 'শিবক্ষেত্রের' প্রশ্ন। এ যাত্রায় যদি কাশীতে দীক্ষা না হয় তাহা হইলে আর "শিবক্ষেত্রে" দীক্ষার কোন আশাই থাকিবে না। এ আশঙ্কা বড় কম নহে। হরিশের চিন্তা অন্যরূপ। সে বিনা বেতনে একমাস ছুটী গ্রহণ করিয়াছে। এই ছুটী বৃথা হইয়া যাইবে। তারপর নূতন কর্ম্মে যোগদান করিয়া শীঘ্র ছুটী লওয়ারও অসুবিধা হইবে। শেষে যুক্তি স্থির করিলাম, "আমি অদ্যই একলা কাশী গিয়া বাবাকে সমস্ত জানাইয়া যে কোন রূপে হউক তাঁহাকে রাজী করিব। পরে তোমাদিগকে টেলিগ্রাম দ্বারা বাবার অনুমতি জানাইলে তোমরা কাশী যাইবে।" তাহাই হইল। আমি সেইদিনই কাশী রওনা হইলাম।

তখন কাশীর মালদহিয়া আশ্রম নির্ম্মিত হয় নাই। বাবা হনূমান ঘাটের নিকট দলীপগঞ্জ মহল্লায় (বর্ত্তমান আউদগর্বী)

২৮০ নং "বিশুদ্ধানন্দ কুটীর" নামক আশ্রমে থাকিতেন। আমি সকাল ৯টার সময় উক্ত আশ্রমের ত্রিতলে গিয়া বাবার চরণ বন্দনা করিলাম। এই আমার প্রথম গুরুদর্শন। আমি প্রণাম করিয়া জোড়হাতে অভিভূতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। বাবা "কিগো, ভাল ত সব" বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন এবং বসিতে বলিলেন। আমার বিহ্বলভাব কাটিয়া গেলে বাবাকে সব কথা বলিলাম। এখন দীক্ষা না হইলে যে নানাদিকে অসুবিধা হইবে তাহা সরলভাবে নিবেদন করিয়া বাবার নিষেধ আজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য করজোড়ে প্রার্থনা করিলাম। বাবা সমস্ত কথা শুনিয়া বলিলেন—"আমি যখন অনুমতি দিয়াছি তখন দীক্ষা দেওয়ায় আমার কোন আপত্তি নাই। এখানকার এই ব্যারাম আদির জন্য এখন আসিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। তোমরা যখন এতদূর অগ্রসর হইয়াছ তখন আর বিলম্ব করিয়া কাজ নাই; হরিশকে আসার জন্য টেলিগ্রাম করিয়া দাও। তবে এখন এখানে বেশী দিন থাকা হইবে না, দীক্ষার পরেই বাড়ী ফিরিয়া যাইবে।" আমি তাঁহার আদেশমত হরিশকে আসিবার জন্য টেলিগ্রাম করিয়া দিলাম। সে যথাসময়ে কাশী আসিয়া উপস্থিত হইল। সন ১৩২৫ সাল (ইং ১৯১৮ খৃঃ) শুভ ১লা অগ্রহায়ণ রাস পূর্ণিমার দিন আমাদের সস্ত্রীক দীক্ষা হইয়া গেল। আমরা বাবার শ্রীচরণে আশ্রয় লাভ করিয়া চরিতার্থ হইলাম।

বাড়ী ফিরিয়া হরিশ যথাসময়ে কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেল। আর কখনও তাহার সেই রোগ দেখা যায় নাই। আমাকে একবার বর্দ্ধমান যাইতে হইল। দীক্ষার পর বাড়ীতে পূজার ঘরে রাখার

জন্য বাবার তুইখানি ফটো বাবার কাছে চাহিয়াছিলাম। বাবা বলিয়াছিলেন, "আমার এখানে উপস্থিত কোন ফটো নাই, তুমি বর্দ্ধমানে বীরেনের নিকট হইতে ফটো পাইতে পার।" তাঁহার নির্দ্দেশমত বর্দ্ধমানে গিয়া বাবার তুইখানা ফটো লইয়া আসিলাম। এইবারেই বীরেন দাদার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হইল। ইতিপূর্ব্বে কাশীতে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মণীন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল। তিনি আমাদের দীক্ষার সময় দ্রব্যাদি ক্রয় করা প্রভৃতিতে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমান হইতে ফিরার মাসাধিক কাল পরে, পৌষ মাসের শেষে, বণ্ডুল হইতে বীরেন দাদার লিখিত একটি তুঃসংবাদপূর্ণ পত্র পাইলাম। তাহাতে লিখিত ছিল— "বিগত ২২শে পৌষ বাবার মাতৃদেবী পরলোক গমন করিয়াছেন। বাবা তখন কলিকাতায় ছিলেন, তিনি বণ্ডুল আসার পর কয়েকদিনের মধ্যে ইন্দ্রকাকা, বিষ্ণুদাদা ও মটরদিদির পরলোক প্রাপ্তি হয়।" পত্র পাঠ করিয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলাম। পত্র লেখার ভঙ্গীতে বুঝিলাম বীরেন দাদা খুব ভয় পাইয়াছেন। আমি তৎক্ষণাৎ বণ্ডুল যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম, এবং যথাসময়ে বর্দ্ধমান আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে হরগোবিন্দ মুখোপাধ্যায় দাদামহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তিনি বলিলেন, "তোমার এখন বণ্ডুল যাওয়া হইবে না, বাবা বিশেষভাবে আদেশ দিয়াছেন, যেন কোন শিষ্য এখন বণ্ডুল না যায়।" অগত্যা ক্ষুণ্ণমনে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। বাবা শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সমাধা করিয়া তুর্গাদাদা, শিবুদাদা প্রভৃতি সকলকে সঙ্গে লইয়া বর্দ্ধমান আসিলেন।

বণ্ডুলে "ভোলানাথেশ্বর হরহরি-বাণলিঙ্গ" প্রতিষ্ঠা হইবার পর হইতে প্রতি বৎসর "শিবরাত্রি" উপলক্ষে সেথায় বিরাট্ উৎসব হইত। বহু শিষ্য বণ্ডুল গিয়া এই উৎসবে যোগদান করিতেন। শুনিয়াছি এই উপলক্ষে স্থানীয় ৩০০০।৪০০০ হাজার লোককে ভূরিভোজন করান হইত। ২।৩ দিন ধরিয়া "দীয়তাং ভুজ্যতাং" চলিত। পল্লীগ্রামে এতলোকের খাওয়ানের আয়োজনের সুব্যবস্থা বড় সহজ ব্যাপার নহে। পূজনীয় ইন্দ্রকাকা এই ব্যাপারের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন! তিনি উৎসবের একমাস পূর্ব্ব হইতে দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া ভাণ্ডার জাত করিতেন। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমে এই বিরাট্ ব্যাপার শেষ পর্য্যন্ত সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত। এ বৎসর তাঁহার অভাবে বণ্ডুলে ৺শিবরাত্রি উৎসব করা অসম্ভব হইল। তাই বাবা আদেশ প্রচার করিলেন, "এবার বর্দ্ধমানে ৺শিবরাত্রি উৎসব হইবে।" তাহাই হইল, কিন্তু শুধু এবার নহে, ইহার পরও কয়েক বৎসর এখানেই ৺শিবরাত্রি উৎসব হইল। পরে কাশীর বিশুদ্ধানন্দ কানন আশ্রমে শিব-প্রতিষ্ঠা হইলে সেখানেই ৺শিবরাত্রি উৎসব হইতে লাগিল। আর কোন দিনই বণ্ডুল আশ্রমে ৺শিবরাত্রি উৎসব হইল না। সুতরাং আমার ভাগ্যে বণ্ডুল আশ্রমের ৺শিবরাত্রি দর্শন আর ঘটিয়া উঠিল না। যাহা হউক, যথাসময়ে বর্দ্ধমান আশ্রমে গিয়া ৺শিবরাত্রি ব্রত পালন করিলাম। বাবা এই সময়ে সন ১৩২৬ সাল ২রা বৈশাখ ৺পুরীর আশ্রম প্রতিষ্ঠার কথা জানাইয়া দিলেন এবং সম্ভব হইলে ঐ সময় ৺পুরী যাইতে বলিলেন।

আমি ইহার পূর্ব্বে কোন দিন পুরী যাই নাই। সুতরাং বাড়ী

ফিরিয়া পুরী যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম এবং চৈত্র মাসের শেষে পুরী যাত্রা করিলাম। গিয়া দেখিলাম আর্মষ্ট্রং রোডের উপর বাড়ীটি চুনকাম ও মেরামত হইতেছে। কলিকাতা হইতে কেহ আসে নাই। আমি গিয়া পাণ্ডার বাড়ীতে উঠিলাম, এবং শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দর্শন, সমুদ্র স্নান প্রভৃতি তীর্থ কার্য্য করিতে লাগিলাম। এইটি পুরীবাসের শ্রেষ্ঠ সময়; পাণ্ডার নিযুক্ত লোক সঙ্গে লইয়া নানা স্থানে দর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। সন ১৩২৬ সাল শুভ ১লা বৈশাখ রাত্রির ট্রেনে বাবা আসিয়া পঁহুচিলে ২রা বৈশাখ সকালে আশ্রমে গিয়া সকলের সঙ্গে মিলিত হইলাম। ঐ তারিখে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় দাদা বাবাকে ঐ বাড়ীটি আশ্রমের জন্য দান করিলেন। আশ্রমটি "বিশুদ্ধানন্দ ধাম" নামে প্রতিষ্ঠিত হইল। আমি ইহার পর কয়েক দিন থাকিয়া বাড়ী ফিরিলাম। বাবা এইবার পুরী গিয়া মাঘ মাস পর্য্যন্ত সেখানে ছিলেন। আমি পৌষ মাসের মাঝামাঝি দ্বিতীয় বার পুরী গিয়াছিলাম। বাবা তাঁহার ৺মাতাঠাকুরাণীর বাৎসরিক শ্রাদ্ধের জন্য বণ্ডুল হইতে তাঁহার কুল-পুরোহিতকে আনাইয়া ছিলেন। শ্রাদ্ধের দিন বাবা আমাকে শ্রাদ্ধের জন্য অন্ন-পাক করিবার আজ্ঞা দিয়াছিলেন। ঐদিন অন্নপাক হইতে সমুদ্র জলে পিণ্ড বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত যাবতীয় কার্য্যে বাবার সহায়তা করিবার অধিকার পাইয়া নিজকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিয়াছিলাম। ৺ঠাকুরমার আদ্যশ্রাদ্ধের সময় বর্দ্ধমান হইতে ফিরিয়া আমার যে দুঃখ হইয়াছিল, তাহা এবারকার আনন্দস্রোতে কোথায় ভাসিয়া গেল! ইহার পর আরও কয়েকদিন থাকিয়া বাড়ী ফিরিলাম।

আমাদের কুলগুরুগণ বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একবার শিষ্যগৃহে আসিতেন। শিষ্য সকলে গুরুদর্শন ও গুরুসেবা করিয়া চরিতার্থ হইত। আমারও ইচ্ছা হইত বাবাকে বাড়ীতে আনিয়া সাধ্যমত সেবা করি। বিশেষতঃ বাড়ীর ছেলেমেয়েরা এবং আত্মীয়-স্বজনেরা সর্ব্বদা অনুযোগ করিত—"আপনার যোগশক্তি সম্পন্ন গুরুদেবের কথা অনেক লোকের মুখেই শুনিতেছি। কিন্তু তাঁহাকে একবার চোখে দেখিতেও পাইলাম না। তাঁহাকে একবার আনিয়া আমাদিগকে দেখান।" তাহাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে না পারিয়া আমারও দুঃখ হইত। কিন্তু উপায় কি? বাবা ত কোন শিষ্য বাড়ী যান না। বাবার শিষ্য মণ্ডলী মধ্যে অনেক বড় লোক আছেন, কেহই ত বাবাকে বাড়ীতে লইয়া যাইতে পারেন নাই। কলিকাতায় দেখিয়াছি কেহ কেহ বাবাকে ভোগ দিবার জন্য নিজ বাড়ীতে লইয়া যান। বাবা সেখানে ২।৪ ঘণ্টা থাকিয়া ভোগের পর আবার আশ্রমে ফিরিয়া আসেন। আমার ত সেরূপ সুযোগও নাই। তবে আমার এ বাসনা কেন?—কেন জানি না, কিন্তু মাঝে মাঝে ইচ্ছা জাগিত।

বাবার ভোগ বরাবর সিদ্ধ পুরাতন রামশাল চাউলের অন্নের দ্বারা হইত। আমার চাষেও রামশাল ধান জন্মে। নিজ তত্ত্বাবধানে ঐ ধানে চাউল প্রস্তুত করাইবার সময় মনে হইল "এই চাউল যদি বাবার ভোগে লাগাইতে পারিতাম।" গুরুভ্রাতা ৺রোহিণীকুমার চেল দাদার চাউলের কারবার ছিল। বাবার ভোগের চাউল তিনিই পাঠাইয়া দিতেন। তাহার সঙ্গে আমি সামান্য চাউল পাঠাইয়া কি করিব? আমি উৎপন্ন চাউল পুরাতন

হইবার জন্য বাঁধাইয়া রাখিলাম। আমার বাগানে বাবার প্রিয় অনেক আনাজ জন্মিত, কিন্তু তাহা গুরুসেবায় লাগার কোন আশা নাই ভাবিয়া দুঃখ হইত।

আমার এই ইচ্ছা আংশিক পূরণের জন্য একবার বাবার অনুমতি লইয়া পূজনীয় দুর্গাদাদাকে দিন কয়েকের জন্য গুনুড়ী লইয়া গিয়াছিলাম। গুরুপুত্রের সেবা করিয়া আমার গুরুসেবার ইচ্ছা অনেকটা পূরণ হইল বটে, কিন্তু আত্মীয়-স্বজনদের তাহাতে মোটেই তৃপ্তি হইল না। তাহারা যোগৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন একজন মহাপুরুষ দেখিবার আশা করিতেছিল, একটি নবীন যুবক দেখিয়া তাহাদের আশা মিটিবে কেন? বাস্তবিক সে সময়ে দুর্গাদাদা কিছু কিছু যোগক্রিয়া করিলেও বাহির তিনি পুরা বাবুই ছিলেন। আমার একটি দোনলা বন্দুক ছিল, তাহা দেখিয়া তাঁহার শিকারের ইচ্ছা হইল। সেই সময়ে ঝালদার রাজা ৺উদ্ধবচন্দ্র সিংহ দাদার মধ্যমপুত্র (হিকিম সাহেব) আমাদের নিকটবর্ত্তী তিলুড়ী হাই স্কুলে পড়িতেন। দুর্গাদাদা পত্র লিখিয়া তাঁহাকে গুনুড়ী আনাইলেন এবং তাঁহাকে কয়েক দিন থাকিতে বলিলেন। হিকিম সাহেব ভাল শিকারী ছিলেন। তিনি সকাল-বিকাল দুর্গাদাদার সঙ্গে বেড়াইতে যাইতেন এবং দুই একটা পক্ষী শিকার করিয়া আনিতেন। এইভাবে কয়েক দিন বেশ আনন্দে কাটিয়া গেল। ইহার পর একদিন দুর্গাদাদার আদেশক্রমে তাঁহাকে বর্দ্ধমানে রাখিয়া আসিলাম। গুরুপুত্রের সেবা করিয়া গুরুসেবার বাসনা আপাততঃ কিছু শান্ত হইলেও গুরুদেবকে বাড়ীতে আনিয়া সেবা করার প্রবল ইচ্ছা আবার জাগিয়া উঠিতে লাগিল।

শ্রীশ্রীমদ্ বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব বিষয়ক প্রকাশিত

পুস্তকাবলী

১। শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ (৫ খণ্ড)—

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ প্রণীত

প্রথম ভাগ—চরিত-কথা—১ (অনুপলভ্য)

দ্বিতীয় ভাগ—তত্ত্ব-কথা—১—১।০ আনা

তৃতীয় ভাগ—লীলা-কথা

পূর্বার্দ্ধ—১—১।০ আনা

২। যোগিরাজাধিরাজ শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস—

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত প্রণীত—৫৲ টাকা

৩। শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস রচিত গীতরত্নাবলী—

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ সম্পাদিত—।৵০ আনা

৪। বিশুদ্ধবাণী— শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ সম্পাদিত

প্রথম ভাগ—২৲ টাকা

দ্বিতীয় ভাগ—২৲ টাকা

তৃতীয় ভাগ—২৲ টাকা

চতুর্থ ভাগ—২৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—

কার্য্যকারক—

"বিশুদ্ধানন্দ কানন আশ্রম"

মালদহিয়া, বেনারস।